সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

নির্বাচিত রচনাবলী

১

প্রথম ভাগ
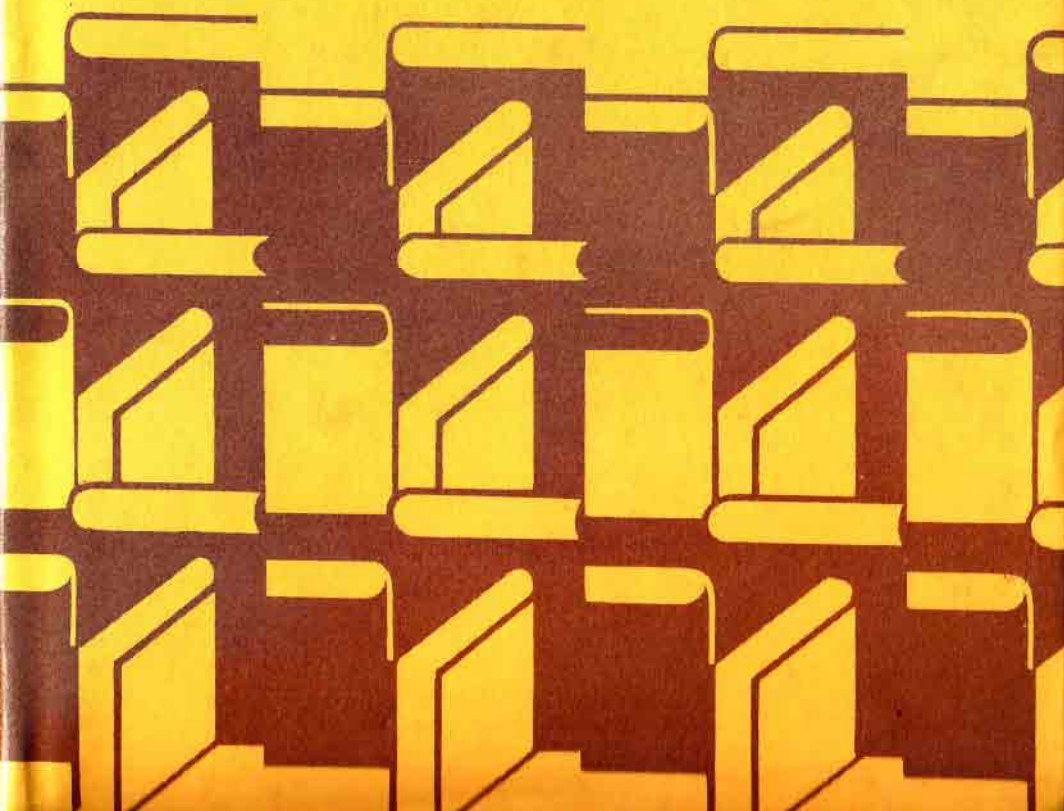
নির্বাচিত রচনাবলী

১ম খণ্ড

(১ম ভাগ)

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়ঃ
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
ফোন ঃ ২৫১৭৩১

আঃ প্রঃ ১৫৭

১ম প্রকাশ
জমাদিউল আউয়াল ১৪১২
অগ্রহায়ণ ১৩৯৮
নভেম্বর ১৯৯১

বিনিময় ঃ ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণেঃ আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

تفہیمات –এর বাংলা অনুবাদ
NIRBACHITO RACHONABALI By Sayiid Abul A'la Maududi
Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 50.00 Only.

আমাদের কথা

মাওলানা মওদূদী আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। আজ প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সবাই তাঁর এ পরিচয় জানে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বহুমুখী। তবে আমি বলবো, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর লেখা। তাঁর চিন্তার ধারার লিখিত রূপ। তাঁর লিখিত কুরআনের তাফসীর তাফহীমুল কুরআন আজ বিশ্বজুড়ে লক্ষ কোটি যুবক যুবতীর দৈনন্দিনকার পাঠ্য বই। বস্তুত, তাঁর সমস্ত লেখাই জ্ঞানের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্র ফল্গুধারা। তাঁর লেখা পড়ে বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ যুবকের ঘুম উঠে গেছে।

তাঁর এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম 'তাফহীমাত'। এর অর্থ, বুঝিয়ে দেয়া বা বুঝে নেয়ার বিষয়। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যুক্তি প্রমাণের নিখাঁদ শৈলীতে লেখা কতিপয় প্রবন্ধ নিবন্ধের সংকলণ তাঁর গ্রন্থ। গ্রন্থটি চমৎকার রচনা শৈলীতে মনোজ্ঞ। ভাবের সম্মোহনে গতিমান। যেন জ্ঞানের চৌমোহনা। জ্ঞান পিপাসুর সুশীতল পানীয়। এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, যে বিষয়টি নিয়েই তিনি কলম ধরেছেন, সে বিষয়েই জ্ঞান পিপাসুদের ক্ষুধা নিবারণ করার মতো করে লিখেছেন। তা পড়ে নেবার পর মন প্রশান্তি লাভ করে।

গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান, আমলে ১ম খন্ডটি বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়ে 'মওদূদী রচনাবলী' নামে প্রকাশ হয়েছিল। অনেকেই এ নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আসলে বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির প্রতিশব্দ খুঁজে বের করা কষ্টকর তাই, আমরা এখন ভেবেচিন্তে গ্রন্থটির নাম রাখলাম মাওলানা মওদূদীর 'নির্বাচিত রচনাবলী'।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী মাওলানা মওদূদীর সবগুলো গ্রন্থই বংগানুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অনুবাদ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছে। এ গ্রন্থটিও তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। ইনশা আল্লাহ সবগুলো খণ্ডই এ নামে প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থটি দ্বারা চিন্তাশীল মহল উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

সূচীপত্র

বিচার-বুদ্ধির রায়

বড়-বড় শহর-বন্দরে আমরা দেখতে পাই, অসংখ্য কল-কারখানা বিজলী শক্তি দ্বারা চালিত হচ্ছে। রেল, ট্রামগাড়ী ইত্যাদি তীব্রবেগে ধাবিত হচ্ছে। সন্ধ্যাকালে যুগপৎ হাজার হাজার বিজলী বাতি দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মকালে ঘরে-ঘরে বিজলী পাখা চলতে থাকে। কিন্তু এই সকল ঘটনা দৃষ্টে আমাদের মধ্যে যেমন কোন আশ্চর্য ও বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না, তেমনি ঐ জিনিসগুলোর দীপ্তিময়তা ও গতিশীলতার মৌল কারণ সম্বন্ধেও আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য দেখা দেয় না। এর কারণ কি?

এর একমাত্র কারণ এই যে, বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে ঐ বাতিগুলো সম্পৃক্ত তা আমরা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। যে-বিদ্যুতাগারের সঙ্গে ঐ তারগুলো সংযুক্ত তার অবস্থাও আমরা জানি। সে বিদ্যুতাগারে যারা কাজ করে, তাদের অবস্থান এবং অস্তিত্বও আমাদের জানা। যে ইঞ্জিনিয়ার ঐ কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করছে, তার সম্পর্কেও আমরা অবহিত। আমরা এও জানি যে, সে ইঞ্জিনিয়ার বিজলী উৎপাদন সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞ। তার কাছে অনেক যন্ত্রপাতি রয়েছে। সে সব যন্ত্রপাতি চালু করেই সে বিজলী শক্তি উৎপাদন করছে। বিজলী বাতির দীপ্তি, বিদ্যুৎ-পাখার ঘূর্ণন, রেল ও ট্রাম গাড়ীর গতিবেগ এবং কল-কারখানার গতিশীলতার মধ্যে এই বিজলী শক্তির প্রবাহই আমরা দেখতে পাই। কাজেই বিজলী শক্তির ক্রিয়াশীলতা ও বাহ্যিক নিদর্শনাদি দেখে তার কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি না হবার একমাত্র কারণ এই যে, এই কার্যকারণের গোটা অনুক্রমটিই আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির আয়ত্তাধীন এবং স্পষ্টত তা আমাদের দৃষ্টিগোচর।

প্রবন্ধটি ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর সংখ্যা 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।—অনুবাদক

এবার মনে করুন, এই বিজলী বাতিগুলো যদি এমনি জ্বলে উঠতো, এ ভাবেই পাখাগুলো ঘুরতে থাকতো, একইভাবে রেল ও ট্রামগাড়ীগুলো ধাবিত হতো, কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতিগুলো চলতে থাকতো, অথচ বিজলী পরিবহণকারী তারটি আমাদের দৃষ্টিশক্তির আড়ালে থেকে যেতো, বিদ্যুতাগারটিও আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে থাকতো, বিদ্যুতাগারের কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমাদের কোন জ্ঞান না থাকতো এবং এই কারখানারই কোন ইঞ্জিনিয়ার নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি ও কর্ম-ক্ষমতা দ্বারা একে পরিচালিত করছে, এই তথ্যটুকুও আমাদের অজানা থাকতো তখনো কি বিজলীর এইসব বাহ্যিক নিদর্শন দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতাম? তখনো কি এইসব বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের মৌল কার্যকারণ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত না? স্পষ্টত, সবাই এর নেতিবাচক জবাবই দিবেন। কিন্তু কেন? এই কারণে যে, বাহ্যিক লক্ষণ ও ক্রিয়াকলাপের মৌল কার্যকারণ যখন গুপ্ত, অজ্ঞাত ও অদৃশ্য থাকে, তখন লোকদের মন-মস্তিষ্কে বিস্ময় মিশ্রিত অস্থিরতার সৃষ্টি হওয়া, এই রহস্য উদঘাটনের জন্যে মন-মস্তিষ্কের নিয়োজিত হওয়া এবং এই রহস্য সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান ও মতপ্রকাশে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া নিতান্ত একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

এবার এই ধারণাটির ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে আরো সামনে অগ্রসর হোন। মনে করুন, ইতিপূর্বে যা কিছু ধরে নেয়া হয়েছে, তা এই বাস্তব দুনিয়ায়ই বর্তমান। এখানে লক্ষ-লক্ষ বিজলী বাতি জ্বলছে, লক্ষ-লক্ষ বিজলী পাখা ঘুরছে, অগুণতি গাড়ী-ঘোড়া ছুটছে, কল-কারখানায় কাজ-কর্ম চলছে; কিন্তু এগুলোর পেছনে কোন্ শক্তি কাজ করছে এবং সে শক্তিই বা কোত্থেকে আসছে, এটা জানবার কোন উপায়ই আমাদের কাছে নেই। লোকেরা এইসব বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও নিদর্শনাদি দেখে হতভম্ব ও বিস্ময়াভিভূত। প্রত্যেকেই এগুলোর কার্যকারণ অনুসন্ধানে বুদ্ধির ঘোড়া ছুটিয়েছে। কেউ বলছে: এগুলো আপনা-আপনিই দীপ্তিমান ও গতিশীল। এগুলোর নিজস্ব সত্তার বাইরে এমন কোন জিনিস নেই, যা এদেরকে দীপ্তি বা গতি দান করতে সক্ষম। কেউ বলছে: এই জিনিসগুলো যেসব উপাদান থেকে তৈরী, সেগুলোর মিশ্রণ ও সংযোজনই এগুলোর মধ্যে দীপ্তি ও গতির সঞ্চার করেছে। আবার কেউ বলছে: এই বস্তুজগতের বাইরে কতিপয় দেবতা রয়েছে, যাদের কেউ বিজলী বাতিকে দীপ্তিমান করছে, কেউ ট্রাম ও রেল

গাড়ী চালাচ্ছে, কেউ বিজলী পাখায় ঘূর্ণাবেগ সৃষ্টি করছে, আর কেউ কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতিকে গতি দান করছে। এক শ্রেণীর লোক আবার এ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বলতে শুরু করেছে, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এই রহস্যের মর্মমূল অবধি পৌঁছতে সমর্থ নয়। আমরা কেবল ততোটুকুই জানি, যেটুকু আমরা স্বচক্ষে দেখি এবং অনুভব করি। এর চাইতে বেশি কিছু আমাদের বোধগম্য নয়। আর যা আমাদের বোধগম্য নয়, তা যেমন আমরা সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না তেমনি পারি না মিথ্যা বলে অস্বীকৃতি জানাতে।

এই লোকগুলো একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করছে; কিন্তু নিজস্ব মতের সমর্থন এবং অন্যের মত খণ্ডন করার জন্যে এদের কারো কাছেই আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনা ছাড়া জ্ঞানের কোন নির্ভুল উৎস নেই।

এভাবে মতানৈক্য ও বাদানুবাদ চলাকালে এক ব্যক্তি এসে বললোঃ ভাইসব! আমার কাছে জ্ঞানের এমন একটি নির্ভুল উৎস আছে, যা তোমাদের কাছে নেই। সেই উৎস থেকে আমি জানতে পেরেছি যে, এইসব বিজলী বাতি, পাখা, গাড়ী, কারখানা ও যন্ত্রপাতি এমন কতিপয় অদৃশ্য তারের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা তোমরা অনুভব করতে পারো না। এই তারগুলোতে এক বিরাট বিদ্যুতাগার থেকে শক্তি সঞ্চালিত হয় এবং তা-ই দীপ্তি ও গতিরূপে প্রকাশিত হয়। এই বিদ্যুতাগারে বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেগুলো অসংখ্য লোক চালিত করছে। এই লোকগুলো একজন বড় ইঞ্জিনিয়ারের অধীন। সেই ইঞ্জিনিয়ারের জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাই এই গোটা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার নির্দেশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীনেই এই সকল কাজকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে।

এই লোকটি পূর্ণ শক্তি দিয়ে নিজের এই দাবি পেশ করে। লোকেরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। সমস্ত দল ও মতের লোক একজোটে তার বিরোধিতা করে। তাকে পাগল আখ্যা দেয়, মারধোর করে, দুঃখ-কষ্ট দেয়, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এইসব দৈহিক ও মানসিক পীড়ন সত্ত্বেও সে তার দাবির ওপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কোনরূপ ভয়-ভীতি বা প্রলোভনে নিজের বক্তব্য সে অণুপরিমাণও রদবদল করে না। কোন বিপদ-মুসিবতেও তার দাবিতে কোন দুর্বলতা প্রকাশ পায়না; বরং তার প্রতিটি কথা

থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, নিজের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে তার পূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে।

এরপর আর একটি লোক এসে হাযির হয়। সেও ঠিক একই কথা একই দাবির সাথে পেশ করে। তারপর তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ব্যক্তি এসেও পূর্বসুরীদের মতোই কথা বলে। অতঃপর এদের আগমনের একটি ক্রমবর্ধমান ধারা শুরু হয়ে যায়। এমন কি, এদের সংখ্যা শত-সহস্রের সীমাও অতিক্রম করে যায়। এদের সবাই সেই একই বক্তব্যকে একই দাবির সাথে পেশ করে। স্থান, কাল ও অবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের বক্তব্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। তারা সবাই বলেঃ আমাদের কাছে জ্ঞানের এমন একটি উৎস রয়েছে, যা সাধারণ লোকদের কাছে নেই। তাদের সবাইকে পাগল বলে বিদ্রূপ করা হয়, তাদেরকে সকল প্রকার জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্য বানানো হয়। আপন বক্তব্য থেকে তাদেরকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে সকল সম্ভাব্য পন্থায় তাদেরকে নিরূপায় করে তোলা হয়। কিন্তু তারা সবাই নিজেদের বক্তব্যের ওপর অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দুনিয়ার কোন শক্তি তাদের নিজস্থান থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও বিচ্যুত করতে পারে না। এহেন সঙ্কল্প ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের আরো কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও গুণরাজি দেখা যায়। তাদের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী, তস্কর, বিশ্বাসহন্তা, দুষ্কৃতিকারী, জালেম ও হারামখোর নয়। তাদের শত্রুপক্ষ এবং বিরুদ্ধবাদীরাও একথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে যে, তাদের নৈতিক চরিত্র নির্মল ও পবিত্র, স্বভাব-প্রকৃতি নিষ্পাপ ও পুণ্যময়। সদাচরণ ও সুৎ-স্বভাবে তারা অন্যান্য লোকদের চাইতে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। পরন্তু তাদের মধ্যে পাগলামীর কোন লক্ষণও দেখা যায় না; বরং তার বিপরীত নৈতিক পরিশুদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষ এবং বৈষয়িক কাজকর্মের বিশুদ্ধিকরণের জন্যে এমন সব শিক্ষা তারা পেশ করে, এমন সব আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা রচনা করে যার কোন নজীর পেশ করা তো দূরের কথা তার সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করার জন্যে বড়-বড় পণ্ডিত, মনীষী ও বিদগ্ধজনকে গোটা জীবন উৎসর্গ করে দিতে হয়।

একদিকে সেই বিভিন্ন মতাবলম্বী অবিশ্বাসীর দল আর অন্যদিকে রয়েছে এই এক মতাবলম্বী দাবিদারগণ। উভয় পক্ষের এই বিতর্কিত ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্যে সুস্থ বিচার-বুদ্ধির আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক হিসেবে বুদ্ধির কর্তব্য হচ্ছে প্রথমত নিজের মর্যাদাকে খুব ভালোমতো বুঝে

নেয়া, তারপর পক্ষদ্বয়ের অবস্থাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং উভয় অবস্থা তুলনা করে কার কথা গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

বিচারকের (বুদ্ধির) নিজের অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রকৃত ব্যাপারকে জানবার কোন উপায়ই তার কাছে নেই। প্রকৃত সত্য সম্পর্কেও তার কোন জ্ঞান নেই। তার সামনে শুধু পক্ষদ্বয়ের বর্ণনা-বিবৃতি, যুক্তি-প্রমাণ এবং তাদের ব্যক্তিগত অবস্থা ও বাহ্যিক নিদর্শনাদিই বর্তমান। এই সবের প্রতি তীক্ষ্ণ সন্ধানীদৃষ্টি নিক্ষেপ করে অধিকতর সত্যাশ্রয়ী হবার সম্ভাবনা কার, এ সম্পর্কে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সম্ভাবনার প্রাবল্য বিচার ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই সে ঘোষণা করতে পারে না। কেননা, নথিপত্রে যা কিছু তথ্য-প্রমাণ রয়েছে, তার ভিত্তিতে প্রকৃত ব্যাপারটা কি, তার পক্ষে তা বলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বড়জোর সে পক্ষদ্বয়ের একজনকে অগ্রাধিকার দান করতে পারে। কিন্তু চূড়ান্ত ও নিশ্চিতভাবে কাউকে সে সত্যাশ্রয়ী অথবা মিথ্যাবাদী আখ্যা দিতে পারে না।

এখন অবিশ্বাসীদের অবস্থা হচ্ছে এইঃ

১। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে তাদের মতবাদ বিভিন্ন রূপ। কোন একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। এমন কি, একই দলের লোকদের মধ্যে কখনো-কখনো মতানৈক্য দেখা গিয়েছে।

২। তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, তাদের কাছে জ্ঞানের কোন বিশেষ উৎস নেই। তাদের মধ্যে কোন কোন দল বড়জোর এইটুকু দাবি করে যে, তাদের আন্দাজ-অনুমান অন্যান্যদের আন্দাজ-অনুমানের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের আন্দাজ-অনুমান যে শুধু আন্দাজ-অনুমানই, এটা সবাই স্বীকার করে।

৩। নিজেদের ধারণা-অনুমানের ওপর তাদের বিশ্বাস—ঈমান ও প্রত্যয় অবিচল দৃঢ়তা অবধি পৌঁছায়নি। তাদের মধ্যে মত-পরিবর্তনের প্রচুর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। বহুবার দেখা গিয়েছে যে, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি কাল পর্যন্তও যে মতবাদ পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে প্রচার করতো, আজ নিজেই সেই পুরান মতবাদ খণ্ডন করে এক নতুন মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেছে। এইভাবে বয়স, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তরক্কির সাথে সাথে প্রায়শই তাদের মতবাদ পরিবর্তিত হতে থাকে।

৪। পূর্বোক্ত দাবিদারদের অবিশ্বাস করার পক্ষে তাদের কাছে কেবল এইটুকুই যুক্তি রয়েছে যে, দাবিদাররা নিজেদের স্বপক্ষে কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ পেশ করেনি, তারা সেই প্রচ্ছন্ন তারটিও লোকদের দেখায়নি, যার সাথে বিজলী বাতি, পাখা ইত্যাদি যুক্ত রয়েছে বলে তারা প্রচার করে। তারা বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণের সাহায্যেও বিজলীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখায়নি। বিদ্যুতাগারটিও লোকদের পরিদর্শন করায়নি। আর কল-কব্‌জা ও যন্ত্রপাতিও তাদের দেখাতে পারেনি। তার কোন কর্মচারীর সঙ্গেও তাদের সাক্ষাত করায়নি, তার ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও কখনো পরিচয় হয়নি। এমতাবস্থায় এই সকল বিষয়কে তারা কি করে সত্য বলে মেনে নিতে পারে?

আর উক্ত কথাগুলোর যারা দাবিদার, তাদের অবস্থা হচ্ছে এইঃ

১। তারা সবাই একমতাবলম্বী, একই বাণীর প্রচারক। তাদের দাবি বা বক্তব্য বিষয়ের যতগুলো মৌলিক ধারা রয়েছে, তার সব বিষয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য বিরাজমান।

২। তাদের সবার সর্বসম্মত দাবি এই যে, তাদের কাছে জ্ঞানের এমন একটি উৎস রয়েছে, যা সাধারণ লোকদের কাছে নেই।

৩। তাদের মধ্যে কেউই একথা বলেনি যে, তারা আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে এসব কথা বলছে; বরং সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এ কথাই বলেছে যে, ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তার কর্মচারীগণ তাদের কাছে যাতায়াত করে। তার কারখানাও তাদেরকে পরিদর্শন করানো হয়েছে। তারা যা কিছু বলে, প্রকৃত জ্ঞান ও প্রত্যয়ের ভিত্তি-তেই বলে, আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনার ভিত্তিতে নয়।

৪। তাদের মধ্যে কেউ নিজের বিবৃত বিষয়ে অণু পরিমাণও রদবদল করেছে, এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিই দাবির সূচনা হতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একই কথা বলেছে।

৫। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি চূড়ান্ত পর্যায়ের নিষ্কলুষ। মিথ্যাচার, ধোকা-বাজী, শঠতা, প্রবঞ্চনা ও দাগাবাজীর সামান্য চিহ্ন পর্যন্ত তাদের চরিত্রে নেই। আর জীবনের তাবৎ ব্যাপারে যারা সত্যবাদী ও নির্দোষ, তারা শুধু এই ব্যাপারটিতেই একজোটে মিথ্যা কথা বলবে, এর কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না।

৬। এমনি দাবি করার মূলে তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার লক্ষ্য ছিলো, এমন কোন প্রমাণও পেশ করা চলে না; বরং তার বিপরীত এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাদের অধিকাংশ লোকই এই দাবির কারণে চরম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে, কঠিন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। এই জন্যে তারা দৈহিক পীড়ন সহ্য করেছে, কারা যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তাদেরকে মারধর করা হয়েছে, দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়েছে। অনেককে আবার হত্যাও করা হয়েছে। এমন কি কোন-কোন লোককে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হয়েছে। তাদের কয়েকজন ছাড়া কারো পক্ষেই স্বচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপনের সুযোগ হয়নি। সুতরাং তাদের প্রতি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারেরই অভিযোগ আরোপ করা যায় না; সুতরাং এমনিতর অবস্থায়ও নিজস্ব দাবির ওপর অবিচল থাকায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের সত্য-তার প্রতি তাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের বিশ্বাস ছিলো। এমন বিশ্বাস যে, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেও তাদের কেউ আপন দাবি থেকে বিরত হয়নি।

৭। তারা পাগল কিংবা বুদ্ধিজ্ঞানহীন ছিলো, তাদের সম্পর্কে এমন কোন প্রমাণও নেই; বরং জীবনের তাবৎ ব্যাপারেই তাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ে বুদ্ধিমান ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক হিসেবে দেখা গিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধ-বাদীরা পর্যন্ত প্রায়শ তাদের বুদ্ধিমত্তার কাছে নতি স্বীকার করেছে। এমতা-বস্থায় কেবল এই বিশেষ ব্যাপারটিতে তাদের সবাইকে পাগল বলে কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে? আর এই ব্যাপারটিই বা কেমন, তাও ভেবে দেখা দরকার। এ এমনই একটি ব্যাপার যে, এটি তাদের জন্যে জীবন মরণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিলো। এর জন্যে তাদেরকে সারা দুনিয়ার মুকাবিলা করতে হয়েছিলো। এর জন্যে তারা বছরের পর বছর ধরে দুনিয়ার সঙ্গে লড়াই করেছিলো। এটিই ছিলো তাদের সমগ্র প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষার মূলনীতি। এদের এই প্রজ্ঞাপূর্ণ হবার কথা বিরুদ্ধবাদীরা পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছে।

৮। তারা নিজেরাও কখনো দাবি করেনি যে, আমরা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা তার কর্মচারীদের সঙ্গে লোকদের সাক্ষাত করিয়ে দিতে পারি, কিংবা তার গোপন কারখানাটি তাদের দেখাতে পারি; অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা নিজেদের দাবিকে প্রমাণ করতে পারি। তারা এই সকল বিষয়কেই 'অদৃশ্য' বলে অভিহিত করে। তারা শুধু বলে, তোমরা আমা-দের প্রতি বিশ্বাস করো এবং আমরা যা কিছু বলি, তা মেনে নাও।

পক্ষদ্বয়ের অবস্থা এবং তাদের বর্ণনা-বিবেচনা করার পর এবার বুদ্ধির আদালত তার রায় ঘোষণা করছেঃ

সে বল্ছেঃ কতিপয় বাহ্যিক লক্ষণ ও নিদর্শন দেখে উভয় পক্ষই ঐগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও কার্যকারণ অনুসন্ধান করেছে এবং এই ব্যাপারে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ মতবাদ তুলে ধরেছে। স্থূলদৃষ্টিতে উভয়ের মতবাদই এক দিক দিয়ে এক ধরনের বলে অনুমিত হয়ঃ প্রথমত তার কোন মতবা-দেই বুদ্ধির দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই; অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়মের দৃষ্টিতে কোন মতবাদ সম্পর্কেই এ কথা বলা যায় না যে, তার নির্ভুল হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। দ্বিতীয়ত তার মধ্যে কোনটির সত্যতাই বাস্তব অভিজ্ঞতা কিংবা পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করা চলে না। প্রথম পক্ষের কোন ব্যক্তি যেমন নিজস্ব মতবাদের সপক্ষে না এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করতে পেরেছে, যা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে। তেমনি না দ্বিতীয় পক্ষ এমনি প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম, কিংবা তা করার মতো দাবি করে। কিন্তু অধিকতর চিন্তা ও গবেষণার পর এমন কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য-গোচর হয়, যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদটিই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়।

প্রথমত, অন্য কোন মতবাদের সমর্থনে এতো বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী লোক সমবেতভাবে এতো জোরালো, বিশ্বাস ও প্রত্যয় সহকারে কথা বলেনি।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ সৎ-স্বভাববিশিষ্ট এবং এতো বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেতভাবে দাবি করেছে যে, তাদের কাছে জ্ঞানার্জনের একটি অসাধারণ উৎস রয়েছে এবং তারা সেই উৎসের সাহায্যে বাহ্যিক লক্ষণাদির আভ্যন্তরীণ কার্যকারণগুলো জেনে নিয়েছে। শুধুমাত্র এই বিষয়টিই আমাদেরকে উক্ত দাবির সত্যতা স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষতঃ এই কারণে যে, তাদের উপস্থাপিত তত্ত্ব ও তথ্যাদি সম্পর্কে তাদের বর্ণনা-বিবৃতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে সকল তত্ত্ব ও তথ্যের কথা তারা প্রচার করেছে, বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে তাতে অসম্ভব বলেও কিছু নেই। আর কোন-কোন লোকের মধ্যে কিছু অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া—যা সাধারণ লোকদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়না—বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ম অনুযায়ী কোন অসম্ভব ব্যাপার হতে পারে না।

তৃতীয়ত, বাহ্যিক নিদর্শনাদির অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলেও এটাই প্রবলতর মনে হয় যে, দ্বিতীয় পক্ষের মতবাদই সত্য। এই জন্যে যে, বিজলী বাতি, পাখা, যান-বাহন, কলকারখানা ইত্যাদি আপনা থেকে দীপ্তিমান ও গতিশীল নয়। কেননা এইরূপ হলে তাদের দীপ্তিমান ও গতিশীল হওয়াটা তাদের নিজস্ব এখ্তিয়ারধীন হতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। তাদের দীপ্তি ও গতিটা তাদের বস্তুগত সংমিশ্রণের ফল নয়। কারণ তারা যখন গতিশীল দীপ্তিমান থাকেনা, তখনো এই বস্তুগত সংমিশ্রণই বর্তমান থাকে। পক্ষান্তরে এগুলোর পৃথক পৃথক শক্তির অধীন থাকাটাও যথার্থ বলে মনে হয় না। কেননা মাঝে-মাঝে দেখা যায় যে, যখন বিজলী বাতিগুলোতে দীপ্তি থাকেনা, তখন পাখার ঘূর্ণনও বন্ধ থাকে, ট্রামগাড়ীও থেমে যায় এবং কল-কারখানাও অচল হয়ে পড়ে। কাজেই বাহ্যিক নিদর্শনাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রথম পক্ষ থেকে যে-সব মতামত পেশ করা হয়েছে, তা সবই বিচার-বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত। সবচাইতে নির্ভুল কথা বরং এটাকেই মনে হয় যে, এই সকল বাহ্য নিদর্শনের ভিতরে একটি মাত্র শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। তার মূল সূত্রটি এমন একজন প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও শক্তিমান সত্তার হস্তে নিবদ্ধ, যে এক সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী এই শক্তিকে বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ব্যবহার করছে।

অবশ্য সংশয়বাদীরা বলে থাকে যে, এই বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হয় না। আর যা আমাদের বোধগম্য নয়, তাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণ করতে কিংবা মিথ্যা বলেও বর্জন করতে পারিনা। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি এই মনোভাবকেও যথার্থ বলে মনে করতে পারেনা। কারণ কোন একটি ঘটনা বাস্তব হওয়ার জন্যে তার শ্রোতাদের বোধগম্য হওয়ার কোনই প্রয়োজন করেনা, তার বাস্তবতা স্বীকার করার জন্যে নির্ভরযোগ্য এবং উপর্যুপরি সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমাদের কাছে কতিপয় নির্ভরযোগ্য লোক এসে যদি বলে যে, আমরা পশ্চিম দেশে লোকদেরকে লৌহনির্মিত গাড়ীতে চড়ে শূন্যের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছি এবং বিলাতে বসে স্বকর্ণে আমেরিকার গান শুনে এসেছি, তবে আমরা শুধু এটুকুই বিচার করবো যে, এই লোকগুলো মিথ্যাবাদী এবং কৌতুককারী নয় তো? এই ধরনের কথা বলার মধ্যে তাদের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ তো নেই? কিংবা তাদের মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি তো নেই? এটা যদি প্রমাণিত হয় যে, তারা মিথ্যাবাদী, কৌতুককারী বা

উন্মাদও নয়, কিংবা এইরূপ কথা বলার সঙ্গে তাদের কোন স্বার্থও জড়িত নয়; আমরা যদি এ-ও দেখি যে, অনেক সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান লোক, কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই পূর্ণ দায়িত্বানুভূতির সঙ্গে এইসব কথা প্রচার করছে, তবে আমরা তা নিঃসংশয়চিত্তে মেনে নেবো। লৌহনির্মিত গাড়ীর শূন্যের ওপর দিয়ে ওড়া এবং কোন বস্তুগত সংযোগ ছাড়াই এক স্থানের গান কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে শোনার ব্যাপারটি আমাদের বোধগম্য না হলেও তার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করবোই।

উল্লিখিত বিষয়ে বিচার-বুদ্ধির রায় এটাই। কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়জনিত অবস্থা-যাকে 'ঈমান' বলে অভিহিত করা হয়—এর থেকে কখনো পয়দা হয় না। এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে গভীরতর উপলব্ধির, নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগের। এর জন্যে মনের ভিতর এমনি একটি আওয়াজ উত্থিত হওয়া প্রয়োজন, যা অবিশ্বাস, সংশয়বাদ ও দ্বৈধবোধের তামাম অবস্থার বিলুপ্তি সাধন করবে এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেবেঃ লোকদের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-কল্পনা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে সত্য-বাদী লোকেরা আন্দাজ-অনুমান ও ধারণা-কল্পনা করে নয় বরং নির্ভুল জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যা বলেছেন, তাই হচ্ছে সত্য এবং বাস্তব।

০ ০ ০

সংকীর্ণ দৃষ্টি

আমার জনৈক শুভানুধ্যায়ী লিখেছেনঃ

'একটি দু'বছরের সুন্দর শিশু জ্বর ও পাঁজর ব্যথায় ভুগছিলো। তার যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও কাতরতা কোন কঠিন-হৃদয় মানুষও দেখতে পারতো না। যন্ত্রণার উপশমের জন্য কখনো সে আপন বাপ-মার দিকে তাকাতো, কখনো ডাক্তারের সামনে তিক্ত ও অপ্রীতিকর ওষুধ সেবনের জন্যে মুখ খুলতো। এমনি অসহ্য যাতনার মধ্যে একদিন একরাত কাটানোর পর সে বাপ-মা থেকে চিরকালের তরে বিদায় হয়ে গেলো। এই শিশুটির কষ্ট-ক্লেশ ও প্রাণান্তকর অবস্থা দেখে মনের মধ্যে স্বতঃই প্রশ্ন জাগেঃ খোদা তো দয়ালু, করুণাময়; তিনি প্রেম-প্রীতি ও বাৎসল্যেরও আধার। তিনি কেন ছোট্ট ও নিষ্পাপ শিশুর ওপর বিপদার্পণ ও যন্ত্রণা চাপিয়ে দেন? তিনি তো নিজেই বলেছেন ما انا بظلام للعبيد (আমরা বান্দার ওপর কখনো জুলুম করিনা)।"

এ হচ্ছে একটি চিঠির উদ্ধৃতাংশ। এখানে লেখকের মনে যে প্রশ্ন জেগেছে, মৃত্যু, ব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণকালে প্রায় এমনি প্রশ্নই লেখকদের মনে নানাভাবে জেগে ওঠে। মহামারীতে হাজার হাজার লোকের অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ, ভূমিকম্পে শত-সহস্র বাড়ী-ঘরের বিলুপ্তি সাধন, জল-প্লাবনে লোকদের অপরিমেয় বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টভোগ, নানারূপ কষ্টদায়ক রোগে লোকদের তীব্র যাতনাসহ ছটফটানো—মোটকথা কষ্ট

প্রবন্ধটি ১৯৩৫ সনের জুন সংখ্যা 'তর্জমানুল কোরআন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।—অনুবাদক

ক্লেশ ও বিপদাপদের প্রতিটি দৃশ্যই লোকদের মনে স্বভবতই এই ধরনের প্রশ্ন জাগিয়ে তোলেঃ যে খোদা দয়ালু ও প্রেমময়, যিনি আপন খোদায়ী অনুগ্রহ ও করুণার জন্যে গর্বিত, যিনি নিজেই বলেছেন যে, আমি কখনো জুলুম করি না, তিনি কেন তাঁর বান্দাদের ওপর এমনি দুঃখ-কষ্ট আরোপ করেন? নিজেরই সৃষ্ট মানুষকে—যাকে তিনি নিজেই শোক-দুঃখের অনুভূতি দিয়েছেন—কেন তিনি এভাবে বিপদাপদ ও শোক সন্তাপের মুখে নিক্ষেপ করেন? অনেকে তো এ ব্যাপারে এতোখানি অগ্রসর হয় যে, খোদায়ী আজাবের এই সকল নিদর্শনকে খোদার প্রেম-প্রীতি ও রহমতের প্রতিকূল মনে করে। তাদের সন্দেহ হয় যে, (মায়াজাল্লাহ) খোদা এক অন্ধ শক্তি (Blind Force); কারো সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। তিনি কোন সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পরিকল্পনা ছাড়া অনর্থক ভাঙাগড়ার কাজে লিপ্ত রয়েছেন।

কিন্তু যারা বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা এবং আসমান ও জমিনের নিয়ম শৃংখলা সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করেছেন, তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বিশ্ব-প্রকৃতি কতকগুলো পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সত্তার সমন্বয়ে গঠিত কোন জিনিস নয়, বরং এ একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্তা; এর তামাম অংশই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের হাতের একটি পশমের সঙ্গে তার মাথার একটি চুলের যেমন সম্পর্ক, বুধ ও মঙ্গলগ্রহের অণু-পরমাণুর সঙ্গে পৃথিবীর একটি অণুর ঠিক তেমনি সম্পর্ক বিদ্যমান। বস্তুতঃ গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি একটি দেহ সত্তার মতো; দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার সম্পর্কটা যেমন নিবিড়, বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতিটি অংশ ঠিক তেমনি-ভাবে পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত। পরন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে যেমন একটা সম্পর্ক ও পারম্পর্য রয়েছে, তেমনি এখানে সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যেও একটা বিশেষ সম্পর্ক ও পারম্পর্য বিদ্যমান। দুনিয়ার কোন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ ঘটনাই কোন স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তা গোটা বিশ্ব-লোকব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরারই একটি অংশ মাত্র এবং যে সামগ্রিক বিচার বুদ্ধি ও যৌক্তিকতাকে সামনে রেখে খোদা তাঁর এই অসীম সাম্রাজ্যকে পরিচালিত করছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এটা সংঘটিত হয়ে থাকে। এখন ভাববার বিষয় হলোঃ যে ব্যক্তির দৃষ্টি গোটা বিশ্বলোকের ওপর তো নয়ই বরং তার একটি ক্ষুদ্র অংশের ওপর প্রসারিত, নিখিল বিশ্বের সঙ্গে যার তুলনা সূর্যের তুলনায় একটি ধূলিকণারও সমান নয়, যার

সামনে বিশ্বের গোটা ঘটনা পরম্পরা তো নয়ই, বরং সে পরম্পরার অসংখ্য অংশের মধ্য থেকে মাত্র দু'একটি অংশ রয়েছে; পরন্তু যে ব্যক্তি বিশ্ব-লোকের এই ক্ষুদ্র অংশ এবং ঘটনা পরম্পরার এই কতিপয় অংশেরও কেবল বাহ্য দিকটিই নিরীক্ষণ করছে, আভ্যন্তরীণ রহস্য অবধি পৌঁছবার কোন সূত্র তার কাছে নেই—এমন ব্যক্তি কি কোন ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা দেখে তার যৌক্তিকতা এবং যথার্থতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে? আর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের দুঃসাহস করলে তা কি বিশুদ্ধ হতে পারে?

বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনা এবং খোদার আধিপত্য তো এতোদূর ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তার কল্পনা করতেই আমাদের বুদ্ধি হিমসিম খেয়ে যায়। তার চাইতে বরং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির কোন মানব-চালিত রাজত্বের কথাই ধরুন। যে ব্যক্তি মন্ত্রিত্বের আসন কিংবা রাজ-সিংহাসনে বসে একটা বিশাল রাষ্ট্র পরিচালিত করছে, সে যদিও আমাদের মতো একজন মানুষ মাত্র, স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার এবং আমাদের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই, পরন্তু তার কোন একটি কাজকর্ম এমন নয় যা বোঝবার এবং সম্পাদন করার মতো শক্তি ও সামর্থ আমাদের মধ্যে নেই; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সরকারী গদীর ওপর বসে সমগ্র রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা দেখতে পাচ্ছে আর আমরা তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি—নিছক এই পার্থক্যটুকু আমাদের এবং তার মধ্যে এতো বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, আমরা কার্যত তার কাজ-কর্ম কিছুই বুঝতে পারি না। ফলে কোন ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমাদের গোচরীভূত হলে তার পরিণতি ও যৌক্তিকতা কি, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। পরন্তু মানুষে-মানুষে মর্যাদাগত পার্থক্যের ফলে যখন এতোবড় ব্যবধানের সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ ও খোদার মধ্যে কতোখানি ব্যবধান হবে তা ভেবে দেখবার বিষয়! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে যে বিপুল ব্যবধান, তা মর্যাদাগত নয়, বরং মূলগত। খোদা তামাম বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব করছেন, আর আমরা তাঁরই সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্রতম অংশে আছি। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি সমগ্র বিশ্বের ওপর পরিব্যাপ্ত, পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি আমাদের দেহের গোপন রহস্য অবধিও পৌঁছে না। তাঁর শক্তি-সামর্থ্য অপরিসীম; পক্ষান্তরে আমাদের কাছে তার কোন শক্তিই নেই। এই বিপুল ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা যদি তাঁর কার্যক্রমের সমালোচনা করি এবং তাঁর

বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তবে তা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে মূর্খ পর্ণকুটিরবাসীর সমালোচনার চাইতেও কি কোটি কোটি গুণ বেশি নির্বুদ্ধিতামূলক সমালোচনা হবে না?

এর চাইতেও স্পষ্টতর একটি দৃষ্টান্ত নিন। মনে করুন, আপনি একজন বাগানের মালী। যে বাগান আপনি খুব মেহনত করে রচনা করেছেন, এবং যার সাজ-সজ্জায় আপনার গোটা দক্ষতা ও নৈপুণ্য ব্যয় করেছেন, তার প্রতিটি গাছ, চারা ও অঙ্কুরকে নিশ্চিতরূপে আপনি ভালোবেসে থাকবেন। এই সবের হেফাজত ও সংরক্ষণে আপনি চেষ্টার কোন ত্রুটিই করবেন না। এগুলোকে নিষ্প্রয়োজনে কাটা, ছাঁটা বা উপড়ে ফেলাও আপনি কখনো পছন্দ করবেন না। আর অন্য কেউ এসে যদি এমন কাজ করে, তবে তার প্রতি আপনি খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। পরন্তু আপনি বৈজ্ঞানিক সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন যে, গাছ-গাছড়ার মধ্যেও সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বিষাদ অনুভূত হয়। আপনি এও জানেন যে, কাঁচি ও কুড়াল দিয়ে গাছপালা ও লতা-গুল্ম কাটা হলে তাতে তারা কষ্ট অনুভব করে। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটলে এবং সন্তান (ফুল) থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদেরও দুঃখবোধ হয়। কিন্তু এই ভালোবাসা ও অবগতি সত্ত্বেও আপনি প্রয়োজনীয়তা এবং বাগানের সার্বিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গাছ-গাছড়ার ওপর কাঁচি ও কুড়াল উভয়টিই ব্যবহার করেন? পত্র-পল্লব ও ডাল পালা কেটেছেঁটে দেন। চারাগাছ তুলে নিয়ে অন্যত্র লাগিয়ে দেন, বাড়তি পাতা কেটে সাজিয়ে দেন, কাঁচা ও পাকা ফল প্রয়োজন মতো পেড়ে নেন। প্রস্ফুটিত ও অপ্রস্ফুটিত ফুল ছিঁড়ে নেন। অপ্রয়োজনীয় চারা গাছ উপড়ে ফেলেন। শুষ্ক গাছ-পালা কেটে ফেলেন।

যদি গাছ, চারা ও লতাপাতার দৃষ্টিতে বিচার করা হয়, তবে এই সব কিছুই নেহাত জুলুম বলে বিবেচিত হবে। তাদের যদি বাকশক্তি থাকতো তো বলতোঃ এই মালীটি কিরূপ নির্দয় এবং জালেম! আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটাছেঁড়া করছে। সন্তানদেরকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। ছোট ছোট চারাগুলোকে—যারা এখনো জীবনের একটি বসন্ত অতিক্রম করেনি—উপড়ে ফেলে দিচ্ছে। কচি কচি কুঁড়ি গুলোকে ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক কারো প্রতি লক্ষ্য নেই, শুধু কাটা-ছিঁড়া করাই তার কাজ। আর কখনো তো জালেম একটা যন্ত্র নিয়ে এমনিভাবে চালিয়ে দেয় যে, আমাদের সগোত্রীয় হাজার হাজার লোক যুগপৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এমন

ব্যক্তি কি দয়াময় ও স্নেহশীল হতে পারে? তার অন্তরে কি করুণা, ভালবাসা অনুকম্পার নির্মল ভাবধারা থাক্তে পারে? আমরা তো তার কাটাছেঁড়া, উপড়ানো ইত্যাদির মধ্যে কোন যৌক্তিকতা ও যথার্থতাই খুঁজে পাই না। আমাদের কাছে তো একে এক অন্ধ, অচেতন, নির্মম ও নির্দয় সত্তা বলে মনে হয়—সে কোন জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কখনো আমাদের পানি সরবরাহ করে, আবার কখনো আমাদের ওপর কাঁচি চালিয়ে দেয়। কখনো আমাদের সার পরিবেশন করে, কখনো কুড়াল দিয়ে আমাদের কেটে ফেলে। কখনো অন্যের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে, আবার কখনো নিজ হাতেই আমাদের উপড়ে ফেলে দেয়। কখনো রোগ-ব্যাধিতে আমাদের সাহায্য করে, আবার কখনো নিজেই একটি যন্ত্র নিয়ে আমাদের পাইকারীভাবে হত্যা করে।

যদি গাছ-গাছড়া আপনার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে এমনি সমালোচনা করে, তবে আপনি কি বল্‌বেন? এই তো বল্‌বেন যে, ওদের দৃষ্টি সীমিত ওরা শুধু নিজেদের অস্তিত্ব এবং নিকট সম্পর্কশীলদেরই দেখতে পায়ঃ কিন্তু আমার দৃষ্টি প্রশস্ত ও দূর বিস্তৃত। বাগানের সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতাই আমি দেখতে পাই। ওরা শুধু নিজ ফল-ফুল, পত্র-পল্লব ও শাখা-প্রশাখা নিয়েই পরিতুষ্ট, খুব বেশী হলে আশপাশের চারাগাছ ও বৃক্ষ গুল্মাদির সঙ্গে প্রীতি ও সহানুভূতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে; কিন্তু আমার সামনে রয়েছে সমগ্র বাগিচার কল্যাণ, আমি সামগ্রিকভাবে সবার মঙ্গলের জন্যেই কাজ করে যাচ্ছি। নাদান গাছ ও নির্বোধ চারা ভাবছে যে, সমগ্র বাগিচা শুধু তার স্থিতি এবং তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের জন্যেই রচনা করা হয়েছে। এখানে তার স্বার্থটাই কেবল লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি কেবল তাদেরকে বাগানের জন্যেই লাগিয়েছি, তাদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে আমাদের যা' কিছু সম্পর্ক, তা শুধু এই বাগানের খাতিরেই বাগানের কল্যাণে যতটা প্রয়োজন ও সমীচীন, ততটাই আমি বৃক্ষ, চারা ও গুল্মলতাদির সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করি; কিন্তু যখনই বাগানের প্রয়োজন প্রকট হয়ে উঠে, তখন আমি তাতে কাট্‌ছাঁট, সাজান-গোছান ও উপড়ান-উৎপাটন সবকিছু করে থাকি। কারণ আমার কাছে বাগানের সামগ্রিক স্বার্থ এক-একটি চারা, বৃক্ষ ও লতাগুল্মের ব্যক্তিস্বার্থের চাইতে বেশি মূল্যবান। ওরা ধারণা করে যে, আমি শত্রুতাবশতঃ ওদেরকে পীড়া দিচ্ছি,

হত্যা করছি; কিন্তু এটা শুধু ওদের অজ্ঞতা ও দৃষ্টিসঙ্কীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাগানের কাজ-কারবার এবং তার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবার কোন যোগ্যতাই ওদের মধ্যে নেই। ওদের কাছে আছে শুধু নিজ সুখ-দুঃখের অনুভূতি এবং জীবনের আশা আকাঙ্খার চেতনা। ওদের আশা-আকাঙ্খা ও আবেগ-অনুভূতিতে যখন কোন আঘাত লাগে, তখন ওরা একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং আমার প্রতি জালেম ও নিপীড়ক হবার সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাদের অনুমানসিদ্ধ নয় মোটেই। তাদের ধারণার ফলেই আমি প্রকৃতপক্ষে জালেম হতে পারি না এবং তাদের স্বার্থে আমি নিজ বাগিচার ব্যবস্থাপনাও বদলাতে পারি না।

এই ছোট্ট দৃষ্টান্তটিকে আপনি যদি বিস্তৃত করে দেখেন তো আপনার বহুতরো অভিযোগেরই জবাব পেয়ে যাবেন।

বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমরা যখন চিন্তা করি তখন স্বতই মনে হয়ে যে, এই প্রকাণ্ড কারখানার নির্মাতা ও পরিচালক নিঃসন্দেহে এমন এক সত্তা হবেন, যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং ওয়াকিফহাল। যিনি আমাদের মধ্যে আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছেন তিনি সে আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে বে-খবর থাক্‌বেন, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। তিনি আমাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন; সে অনুভূতি সম্পর্কে তিনি অনবহিত থাক্‌বেন এও সম্ভব নয়। তিনি মানুষকে শিশু-সন্তান দিয়েছেন এবং সে শিশুর লালন-পালনের জন্যে মা-বাপের অন্তরে স্নেহ, প্রীতি ও মমত্ব সৃষ্টি করেছেন। রোগ-ব্যাধি ও মৃত্যুকালে শিশু কি কষ্টানুভব করে এবং তাতে মা বাপের হৃদয়ে কি আঘাত লাগে, তা তিনি অবশ্যই জানেন। কিন্তু এইসব কিছু জানা এবং আমাদের চাইতে বেশী জানা সত্বেও তিনি যখন শিশু ও বাপকে এহেন কষ্ট দিতে সম্মত হয়েছেন, আমাদের আবেগ-অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্বেও তিনি যখন তা পিষে মারাকেই পসন্দনীয় মনে করেছেন, আমাদের আকাঙ্খাগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা সত্বেও তিনি যখন তা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, এ ধরনের কাজ করা নিশ্চিতরূপেই তার পক্ষে অপরিহার্য ছিলো এবং এর চাইতে উত্তম কোন পন্থার কথা সেই জ্ঞানবান ও ওয়াকিফহাল সত্তার জানা ছিলো না; নচেত সেই উত্তম পন্থাটিই তিনি অবলম্বন করতেন। কারণ তিনি বিচক্ষণ; আর বিচক্ষণ ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ

ধারণা পোষণ করা চলে না যে, কোন উত্তম পন্থা অবলম্বন সম্ভব হলে তিনি তা বর্জন করে নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করবেন। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতা আমাদের পক্ষে বোধগম্য হয় না এবং তা হতেও পারে না। এই জন্যে যে, আমাদের দৃষ্টি গোটা বিশ্বলোকের ওপর প্রসারিত নয়। বিশ্ব-লোকের প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা কি এবং তার জন্য কখন কি ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক, তাও আমরা জানতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি আল্লাহ্তায়ালার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের ওপর সঠিক আস্থা রাখি, তবে প্রতিটি বিপদকালেই আমরা বুঝতে পারবো যে, আল্লাহ্তায়ালার বুদ্ধিমত্তার পক্ষে এটারই প্রয়োজন ছিলো। তাঁর জ্ঞানমতে এটাই সবদিক থেকে সমীচীন ছিলো। আর আমাদের পক্ষে একে স্বীকৃতি দান ও সন্তোষলাভ করা ছাড়া আর কোন গতি নেই।

পরন্তু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আরো একটি বিষয় আমরা জানতে পারি। তা'হলো এই যে, যে মহান সত্তা বিশ্বলোকের এই বিশাল ব্যবস্থাপনা চালিত করছেন, তাঁর সামনে রয়েছে সার্মগ্রিক কল্যাণ। তাঁর কার্যক্রমের মধ্যে যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে আপেক্ষিক ক্ষতি। অর্থাৎ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে শুধু অনুমান করে সেগুলোকে ক্ষতি বা অনিষ্ট বলা যেতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সবই হচ্ছে সামগ্রিক কল্যাণের ইঙ্গিতবহ। আর সে সবের অনুষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক কল্যাণ লাভের একটি অপরিহার্য উপায়। এই ক্ষতিগুলো যদি অপরিহার্য না হতো এবং এগুলো ছাড়াই সামগ্রিক কল্যাণলাভ সম্ভব হতো, তাহলে বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান খোদা সেগুলো অবলম্বন করতেন না, বরং অপর কোন পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করতেন। আমাদের নিজস্ব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা যখন গভীরভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন আমাদের বিচারবুদ্ধি স্বতঃই বলে উঠে যে, এই বিশ্বপ্রকৃতির জন্যে এর চাইতে উত্তম ব্যবস্থা সম্ভব নয়। এর জন্যে এমন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যেতে পারে না, যা আংশিক ও আপেক্ষিক অনিষ্টকারিতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; বরং এই অনিষ্টগুলো যদি আদৌ সংঘটিত না হয়, তবে প্রকৃতপক্ষে এগুলোর অনুপস্থিতি এক বিরাট অনিষ্ট বলে প্রমাণিত হবে। কারণ তা একটি মাত্র আংশিক কল্যাণের জন্যে বহুতরো

কল্যাণের পথ প্রতিরোধ করবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে মৃত্যুর কথাই ধরা যাক, এ সম্পর্কেই মানুষ সবচাইতে বেশী অভিযোগ করে থাকে। এক ব্যক্তির মৃত্যু কতো মানুষের জন্যে জীবনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। যদি এক ব্যক্তিকে জীবনের স্থায়িত্ব দান করা হয়, তবে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, বহু সংখ্যক লোকের জীবনের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার স্থায়ী জীবনটা যদি কল্যাণপ্রদ হয়, তবে তা শুধু তার ব্যক্তিসত্ত্বার জন্যেই, কিন্তু সামগ্রিক কল্যাণের পক্ষে তা হবে অনিষ্টকর। পক্ষান্তরে ঐ বিশেষ লোকটির মৃত্যু শুধু তার জন্যে একটি আংশিক ক্ষতি মাত্র। কিন্তু এই ক্ষতিটাই বহুতরো আংশিক কল্যাণেরও মাধ্যম। আর সামগ্রিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ঐ লোকটির মৃত্যুতে কোন ক্ষতি সাধিত হয় না; কারণ তার মৃত্যুর ফলে বিশ্বলোকের কোথাও কোন বিপর্যয় দেয়া দেয় না।

এই দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, লোকদের ওপর যে বিপদাপদ অবতীর্ণ হয় তা একদিক থেকে ক্ষতিকর; কিন্তু অন্যদিক থেকে তা কল্যাণপ্রদ এবং সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য। কখনো আমরা নিজেরাই এগুলোর কল্যাণকারিতা এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি। আর কখনো কখনো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত হয় যে, যে জিনিসটাকে আমরা ক্ষতিকর ভেবেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে তা ছিলো কল্যাণপ্রদ। কিন্তু কখনো যদি কোন অনিষ্টের কারণ আমাদের বোধগম্য না হয়, তবু আমাদের মোটামুটিভাবে এই সত্যের প্রতি ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহতায়ালা যা' কিছু করেন ভালোর জন্যেই করেন। তাঁর কার্যের যৌক্তিকতা আমাদের বোধগম্য হোক কি না হোক, তাঁর নির্দেশ ও ফয়সালার সামনে মাথানত করার মধ্যেই রয়েছে আমাদের সার্বিক মঙ্গল।

হেদায়াত ও গোমরাহীর রহস্য

১৯৩৩ সনের গোড়ার দিকে ইসলাম সম্পর্কে জর্জ বার্নার্ড শ'র কিছু মতামত বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার কিছুদিন পর তাঁর দূর-প্রাচ্য সফরকালে সিঙ্গাপুরের আরবী পত্রিকা 'আলহুদার' সংবাদদাতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে তিনি আর একবার ইসলামের সৌন্দর্যাবলীর কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি বলেন যেঃ 'ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতা তথা শাসনতান্ত্রিক ও মানসিক স্বাধীনতার ধর্ম। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খৃষ্টধর্ম তার মুকাবিলা করতে পারে না। কোন ধর্মের সমাজ ব্যবস্থাই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ন্যায় এতোটা পরিপূর্ণ নয়। মুসলিম জগতের অধঃপতন হচ্ছে ইসলাম থেকে বিচ্যুতিরই ফল। মুসলমান আবার যখন শুধু ইসলামের ভিত্তিতেই চেষ্টা-সাধনা করবে, মুসলিম জগত তখনি সুপ্তির কোল থেকে জেগে উঠবে।' *

এই মন্তব্যগুলো শোনার পর সংবাদদাতা প্রশ্ন করেন যে, আপনি যখন

প্রবন্ধটি ১৯৩৩ সনের মে সংখ্যা 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে এ ধরনের অন্ততঃ ৫০ জন প্রখ্যাত মনীষীর নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে টমাস কার্লাইল, এডওয়ার্ড গিবন, উইলিয়াম মুর, এইচ. জি. ওয়েলস, এইচ. এ. এল ফিশার, আর্ণল্ড টয়েনবী, ডব্লিউ মন্টগোমারী, জন মিল্টন, ফিলিপ কে হিট্টি, এইচ এ আরগিব, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, টমাস আর্নল্ড, স্ট্যানলি লেইনপুল, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, এম এন রায়, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, পি সি রায়, সি. পি. রামস্বামী, আয়ার, টি, এল, বাস্তনী, লালা হরদয়াল, ভেঙ্কট রত্নম, গুরু নানক, গোকুল চাঁদ নারাঙ্গ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা স্ব স্ব রচনা ও বক্তৃতায় ইসলাম ও মহানবী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করলেও 'সত্যের সাক্ষী' হবার সৌভাগ্য এঁদের কারোই হয়নি।—সম্পাদক

ইসলাম সম্পর্কে এতো উঁচু ধারণা পোষণ করেন, তখন নিজেই কেন ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন না? এ এমন একটি প্রশ্ন যা উপরোক্ত বিবৃতির পর স্বভাবতই উদয় হয়ে থাকে। কেননা, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে কোন জিনিসের দোষ স্বীকার ও তা বর্জন করা এবং কোন জিনিসের গুণ স্বীকার ও তা গ্রহণ করার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। কিন্তু জর্জ বার্ণার্ডশ' জবাবে যা' কিছু বলেছেন, তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। আর গ্রহণ না করার পক্ষে তাঁর কোন দলীল-প্রমাণও নেই, বরং অভাব রয়েছে শুধু প্রশস্ত হৃদয়ের।

কেবল একা বার্ণার্ড শ'ই নন, এ ধরনের অনেক চিন্তাশীল ও দার্শনিক পূর্বেও ছিলেন এবং আজো রয়েছেন, যারা ইসলামের গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় দিক থেকে তার কল্যাণকারিতা স্বীকার করেছেন এবং তার সভ্যতা, সমাজবিধান, বৈজ্ঞানিক সত্যতা ও কার্যকরী শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যখনি ঈমান পোষণ এবং ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করার প্রশ্ন এসেছে, তখন কোন এক অদৃশ্য বস্তু এসে তাঁদের চলার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাঁরা ইসলামের প্রান্তদেশ অবধি পৌঁছেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছেন।

পক্ষান্তরে এমন অনেক লোকও দেখা গিয়েছে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধতা এবং তার ক্ষতিসাধনে জীবনের এক বিরাট অংশ ব্যয় করেছেন; কিন্তু এই বিরুদ্ধতার ব্যাপারেই ইসলামের অধ্যয়ন করতে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত সত্য ও সৌন্দর্য তাঁদের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে এবং সত্য প্রকাশের পর আর কোন জিনিস তাঁদের ঈমান গ্রহণের পথে বাধ সাধতে পারেনি।

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হেদায়েত ও গোমরাহী তথা সুপথপ্রাপ্তি ও পথবিচ্যুতির রহস্যটা এক অদ্ভুত রহস্য। একটি মাত্র কথা হাজারো লোকের সামনে উচ্চারিত হয়; কিন্তু কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কেউ ভ্রূক্ষেপ করলেও তা তার কানের পর্দার উপর দিয়েই ভেসে চলে যায়। কেউ তা মনোযোগ দিয়ে শোনে, বোঝে; কিন্তু তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেউ তার প্রশংসা কীর্তন করে, কিন্তু তা কখনও স্বীকার করে না। আবার কারো হৃদয়ে তা আসন করে নেয় এবং তার সত্যতার প্রতি সে ঈমান পোষণ করে।

আমরা দিনরাত এ ধরনের ঘটনা নিরীক্ষণ করে থাকি যে, এক ব্যক্তি বাজারের মধ্যে হোচট খেয়ে পড়ে যায়, শত শত লোক তা প্রত্যক্ষ করে। অনেকে একে একটা মামুলি ঘটনা মনে করে পাশ কেটে চলে যায়। অনেকের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়, কিন্তু তারাও শুধু দুঃখপ্রকাশ করেই এগিয়ে যায়। অনেকে এর তামাসা দেখার জন্যে ভীড় করে। আবার অনেক আল্লাহর বান্দাহ এগিয়ে এসে তাকে তুলে নেয়, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাকে সাহায্য করার প্রয়াস পায়। কখনো একজন আসামীকে হাত পায়ে শিকলবদ্ধ অবস্থায় বহু লোক যেতে দেখে। কেউ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, কেউ তার প্রতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করে। কেউ বলেঃ 'যেমন কর্ম, তেমন ফল।' কেউ তার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার হৃদয়ে দুষ্কৃতি থেকে বাঁচবার আকাংখা জাগ্রত হয়।

এ তো হচ্ছে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রূপ মনোবৃত্তি ও মানসিক অবস্থা। এর বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা তেমন কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নয়; বরং এর চাইতে বেশি বিস্ময়কর হলো এই যে, একই ব্যক্তির মনোভাব এবং তার ওপর একই বস্তুর প্রভাব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। একটি কথাই এক ব্যক্তি হাজার বার শোনে এবং অবিশ্বাস করে; কিন্তু এমন একটি সময় আসে, যখন হঠাৎ তার মনের রুদ্ধ আগল খুলে যায়। যে কথা তার কানের পর্দায় গিয়ে আটকে যেতো, তা সোজা তার হৃদয় অবধি পৌঁছে যায়। তখন সে নিজেই ভেবে বিস্মিত হয় যে, এ কথাতো আমি পূর্বেও বহুবার শুনেছি; অথচ কি আশ্চর্য! আজকে এ নিজে-নিজেই আমার অন্তর্দেশে আসন পেতে চলেছে।.....একই ব্যক্তির বহুবার বিপদগ্রস্ত লোক দেখার সুযোগ ঘটে; অথচ তাদের দিকে কখনো সে ভ্রুক্ষেপও করে না। কিন্তু এক সময় কারো বিপদ দেখে হঠাৎ তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। তার মন থেকে নির্মমতার পর্দা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আর সে সবচাইতে বেশি দয়ালু, সহানুভূতিশীল ও হৃদয়বান লোক হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি জীবনে অসংখ্য শিক্ষনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে থাকে। সে সব দৃশ্যকে কখনো সে নিছক তামাসা ভেবেই দেখে। কখনো সে আফসোস ও পরিতাপের সঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করে। আবার কখনো এক মামুলি দৃষ্টিতেই তার ওপর এমনি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যে, তার অন্তরে এক চিরস্থায়ী ছাপ এঁকে যায়।

হেদায়েত ও গোমরাহী তথা সুপথপ্রাপ্তি ও পথভ্রষ্টতার ব্যাপারটিও ঠিক এইরূপ। কোরআন সেই একই ছিলো। তার শিক্ষাও একই ছিলো। তার আবৃত্তিকারীও ছিলো একই। আবু জেহেল ও আবু লাহাব জীবনভর তা শুনে গেলো। কিন্তু তা' কখনো তাদের কান থেকে সামনে এগোতে পারলো না। খাদীজাতুল কুবরা (রা), আবুবকর (রা) এবং আলী বিন আবী তালিব (রা) তা' শুনলেন এবং অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না রেখে প্রথম মুহূর্তেই তার প্রতি ঈমান আনলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব বহুবার তা শুনলেন এবং শুধু অস্বীকার করলেন তাই নয়, বরং যতোবার শুনলেন, ততোবারই তার দুশমনী ও বিরুদ্ধবাদিতায় কোমর বেঁধে লাগলেন। কিন্তু একদিন সেই কানই এ জিনিসটি শুনতে পেলো আর অমনি কান ও হৃদয়ের মধ্যকার সুদৃঢ় প্রাচীর সহসা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো এবং এ জিনিসটি তার অন্তরে এমনই প্রভাব বিস্তার করলো যে, তাঁর জীবনের চেহারাই একেবারে বদলে গেলো।

মনস্তাত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই লক্ষ্যগত বৈষম্য এবং প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার এই বিভিন্নতার নানাবিধ কারণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এবং তা নিজ নিজ জায়গায় বিশুদ্ধও বটে; কিন্তু এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, যে জিনিসটি চোখ-কান ও মন-মগজের মধ্যে কোথাও এক স্থায়ী অন্তরাল হয়ে দাঁড়ায়, কোথাও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্তরাল হয়ে থাকে এবং এক মনস্তাত্তিক মুহূর্তে তা বিদীর্ণ হয়ে যায়, কোথাও আদৌ কোন আবরণ সৃষ্টি করে না, কোথাও কোন বিশেষ কথার জন্যে আবরণ হয়ে দাঁড়ায় আর কোন কথার জন্যে দাঁড়ায় না, সে জিনিসটি মোটেই মানুষের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের অধীন নয়, বরং তা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ-বিষয়টিই কোরআন মজীদে এভাবে বিবৃত হয়েছেঃ

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ - (الانعام - ١٥)

'আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করতে চান, তার হৃদয়কে (তিনি) ইসলামের জন্যে প্রশস্ত করে দেন। আর যাকে গোমরাহ রাখতে চান, তার হৃদয়কে এমনি সংকীর্ণ এবং স্থূল করে দেন, যেন সে আসমানে উঠে চলে যাচ্ছে। এই পন্থায়ই বে-ঈমান লোকদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে অপবিত্রতা চাপিয়ে দেয়া হয়।'

আর এক জায়গায় এটি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء - (النحل - ١٣)

'যদি খোদা ইচ্ছা করতেন তো তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতেন ; কিন্তু তিনি যাকে চান, গোমরাহ করে দেন আর যাকে চান, হেদায়েত দান করেন।' পরন্তু এই হেদায়েতের লক্ষণাদি বিবৃত হয়েছে এভাবে ঃ

قل ان الله يضل من يشاء ويهدى اليه من اناب - (الرعد - ٤)

'তাদেরকে বলো ; আল্লাহ যাকে চান, গোমরাহ করে দেন, আর তিনি নিজের দিকে আসার পথ কেবল তাকেই প্রদর্শন করেন, যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'

واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفى اذانهم وقرا - (بنى اسرائيل - ٥)

'তোমরা যখন কোরআন পড়ছিলে, তখন আমরা তোমাদের এবং আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসীদের মধ্যে এক গভীর পর্দা ফেলে দিলাম এবং তাদের হৃদয়ের ওপর আচ্ছাদন চাপিয়ে দিলাম, যাতে করে তারা কোরআন বুঝতে না পারে। আর তাদের কানের মধ্যে দিলাম বধিরত্ব।'

একটি সত্য কথা শুনে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে মনের ভেতরে অবচেতনভাবেই যে স্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে ঈমানের দিকে টেনে নিয়ে আসে, উপরের আয়াতগুলোতে তাকে 'খোদায়ী হেদায়েত' এবং তার সৃষ্টিকে 'প্রশস্ত হৃদয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর সেই হেদায়েতের বিপরীত মানুষের মনে সত্যের প্রতি অবিশ্বাস ও সত্য বিমুখতার জন্যে যে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে 'আরোপিত গোমরাহী' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর 'প্রশস্ত হৃদয়ের' বিপরীত যে-প্রতিকূল অবস্থা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাকে 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে। পরন্তু এই 'হেদায়েত ও গোমরাহী' এবং 'প্রশস্ত হৃদয়' ও 'সঙ্কীর্ণ হৃদয়' সৃষ্টির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, মানুষ যদি একবার যথার্থভাবে খোদার প্রতি মনোসংযোগ করে, তবে খোদার কাছে যাবার সোজা পথটি আপনা-আপনিই তার লক্ষ্যগোচর হয়। আর যে ব্যক্তি আদৌ এ-অনুভূতিই রাখে না যে, তাকে কখনো খোদার দরবারে হাযির হতে হবে এবং তার মন-মানস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া কলাপের হিসাব দিতে হবে, তাকে কেউ লক্ষবার সত্যের কালেমা শুনালে এবং ওয়াজ-নছিহত ও সদুপদেশ দান করলেও তার অন্তরে কোন কথা প্রবেশ করবে না এবং কোনক্রমে সে সৎপথেও আসতে পারে না।

এখানে তাহলে দু'টি কথা পাওয়া গেলো। এ দু'টিকে পৃথক-পৃথকভাবে বুঝে নিলে কোরআন মজীদের যেসব জায়গায় এ-বিষয়টি বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো খুব সহজেই বোধগম্য হবে।

কোরআন একদিকে হেদায়েত ও প্রশস্ত হৃদয় এবং গোমরাহী ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ব্যাপারটিকে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি আরোপ করেছে, অন্যদিকে এই হেদায়েত ও প্রশস্ত হৃদয় দান করার জন্যে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, মানুষকে খোদার দিকে মনোসংযোগ করতে হবে। আর গোমরাহী ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় চাপানোর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, গোমরাহ ব্যক্তি খোদার প্রতি মনোনিবেশ করে না এবং তার সাঁমনে দায়ী ও জিজ্ঞাসনীয় হবার অনুভূতিও পোষণ করে না।

এই দু'টি জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ককে এভাবে বোঝা যেতে পারে: মানুষের প্রকৃতিতে খোদা এমন একটি শক্তি দান করেছেন, যা তাকে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও ভুল-নির্ভুলের পার্থক্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে এবং

সে সঙ্গে তাকে সত্যের পথে এগোতে এবং মিথ্যাকে পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শক্তিটি হচ্ছে স্বাভাবিক হেদায়েত—একেই খোদা তাঁর দিকে আরোপ করেন এবং খোদার বাণী فطرة الله التى فطر الناس عليها তেও এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর বিপরীত আরো একটি শক্তি মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে, যা' তাকে খারাবি ও মন্দত্বের দিকে টানতে থাকে; ভ্রান্তি, অন্যায় ও অসদাচরণের পথে উদ্বুদ্ধ করে এবং মিথ্যা ও অসত্যকে তার সামনে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়রূপে তুলে ধরে। এই দু'টি ছাড়া এমন বহুতরো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি রয়েছে, যার কতক হেদায়েতের শক্তিকে সাহায্য করে আর কতক সহায়তা করে গোমরাহীর শক্তিকে। জ্ঞানার্জন ও তার বিভিন্ন স্তর, শিক্ষাদীক্ষা ও তার বিভিন্ন অবস্থা, সমাজ ও তার বিভিন্নরূপ পরিবেশ ইত্যাদি জিনিসগুলো বাহির থেকে তার প্রতি প্রভাব-শীল হয়ে থাকে এবং দাঁড়ির উভয় পাল্লার কোন একটিতে ভর করতে থাকে। মানুষের নিজস্ব পার্থক্য নির্ণয়কারী ক্ষমতা, তার বোধশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা, তার বিচারশক্তি ও বিচক্ষণতা, জ্ঞানার্জনের উপায় থেকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত কাজ গ্রহণ, তার বিচার শক্তিকে অনর্থক ব্যবহার না করা ইত্যাকার জিনিসগুলো হচ্ছে তার ইচ্ছাশক্তির অধীন; এসবের দ্বারাই সে হেদায়েত ও গোমরাহীর পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে থাকে।

এখন দেখা যায় যে, খোদার দেয়া হেদায়েত এবং তাঁর আরোপিত গোমরাহী উভয়ে অননুভূত পন্থায় কাজ করতে থাকে। হেদায়েতের শক্তি তাকে সৎপথের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে আর গোমরাহীর শক্তি তাকে মিথ্যার চাকচিক্য দ্বারা মুগ্ধ করার প্রয়াস পায়। কিন্তু কখনো এরূপ হয়ে থাকে যে, মানুষ ভ্রান্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং নিজের ইচ্ছাধীন শক্তি-নিচয়কে ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে গোমরাহীর ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। তখন হেদায়েতের আহবানে সে কর্ণপাত পর্যন্ত করে না। আবার কখনো এমন হয় যে, সে ভ্রান্ত পথে চলতে থাকে; এই সময়ে কতকটা বাহ্যিক প্রভাব আর কতকটা তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা মিলিত হয়ে তাকে গোম-রাহীর প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলে। তখন হেদায়েতের এই আলোই—যা পূর্বে তার কাছে নিস্প্রভ ছিলো—সহসা প্রখর হয়ে তার জ্ঞানচক্ষুকে উন্মি-লিত করে দেয়। কখনো এমন হয় যে, কিছুদিন পর্যন্ত মানুষ হেদায়েত ও

গোমরাহীর মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। কখনো এদিকে আর কখনো ওদিকে সে ঝুঁকে পড়ে। একান্তভাবে কোন এক পক্ষ গ্রহণ করার মতো প্রবল বিচারশক্তি তার থাকে না। অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি এমনি দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অনেকে শেষ পর্যন্ত গোমরাহীর পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আবার অনেকে এক দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর খোদায়ী হেদায়েতের ইঙ্গিত পেয়ে যায়। কিন্তু সবচাইতে বেশী সৌভাগ্যবান হচ্ছে সেইসব সুস্থপ্রকৃতি, নির্ভুলচিত্ত এবং প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা, যারা খোদার দেয়া বিবেকবুদ্ধি, তাঁর দেয়া দৃষ্টিশক্তি, তাঁর প্রদত্ত শ্রবণশক্তি এবং তার গচ্ছিত শক্তিনিচয় থেকে সঠিক কাজ গ্রহণ করে। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে নির্ভুল ফলাফল নির্ণয় করে। খোদায়ী নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করে তা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে। বাতিলের চাকচিক্য এ-ধরনের লোকদেরই মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। অসত্যের মোহ তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করতে পারে না। গোমরাহীর বাঁকা পথগুলো দেখেই তারা বুঝতে পারে, এটা মানুষের চলার উপযোগী নয়। পরন্তু যখনই তারা সত্যের দিকে মনোনিবেশ করে এবং তার অন্বেষণে সামনে অগ্রসর হয়, তখন সত্যই তাদের অভ্যর্থনায় এগিয়ে আসে। হেদায়েতের দীপ্তি তাদের সামনে ঝিকমিক করতে থাকে। সর্বোপরি সত্যকে সত্য বলে বোঝা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জানার পর দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করতে এবং গোমরাহীর পথে চালিত করতে সক্ষম হয় না।

এ-প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য এবং সেটি মুসলমানদের অন্তর্নিবিষ্ট করে নেয়া একান্ত আবশ্যক। সাধারণত অমুসলিম পণ্ডিত ও মনীষীরা যখন ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভাল মন্তব্য করেন, তখন মুসলমানরা সে-মন্তব্যগুলোকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে প্রচার করতে থাকে—যেন ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের ভালো ধারণা ইসলামের জন্যই একটা সার্টিফিকেট! কিন্তু এ সত্যটি কারো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা কারো স্বীকৃতি বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নয়। সূর্যের ঔজ্জ্বল্য যেমন কারো প্রচারের উপর নির্ভরশীল নয়, আগুনের উত্তাপ এবং পানির প্রবহমানতা যেমন কারো স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী নয়, তেমনি ইসলামের সত্যতা এবং বাস্তবতা কারো সমর্থন বা স্তুতিবাক্যের তোয়াক্কা রাখেনা।* বিশেষত এমন

* অবশ্য যেসব অমুসলিম ইসলামের সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে জানতে উৎসুক, তাদের কাছে এধরনের সার্টিফিকেট কিংবা স্তুতিবাদের কোন মূল্য নেই, এটা সত্য। কিন্তু

লোকদের স্তুতিবাদের তো কোন মূল্যই নেই. যাদের কথার সঙ্গে অন্তরের সহযোগিতা নেই এবং যারা অবিশ্বাস ও প্রত্যাখ্যান দ্বারা নিজেদের স্তুতিবাদেরই প্রতিবাদ করছে। যদি প্রকৃতপক্ষেই তারা ইসলামের সৌন্দর্য ও গুণাবলীর সমর্থক হতো তার প্রতি ঈমানও আনতো। কিন্তু তারা যখন মৌখিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও ঈমান আনতে অস্বীকার করছে, তখন বুদ্ধিমান লোকের দৃষ্টিতে তাদের মর্যাদা হচ্ছে এমন ব্যক্তির ন্যায়, যে ডাক্তারের সত্যতা স্বীকার করে, তার প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্রকেও বিশুদ্ধ মনে করে; কিন্তু আপন রোগের চিকিৎসা করায় কোন হাতুড়ে কবিরাজ দ্বারা।

কাজেই মুসলমানদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কোন জবরদস্ত অমুসলমানের স্বীকৃতিও ইস্‌লামের জন্যে গর্বের বিষয় নয়। তার জন্যে একটি গর্বই যথেষ্ট আর তা হলো رضيت لكم الاسلام دينا। এবং ان الدين عند الله الاسلام-এর গর্ব।

মুসলিম পরিবারেরই যেসব সন্তান ইসলামের নাম শুনেই নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাদের জন্যে অমুসলিম পণ্ডিত ও মনীষীদের এসব অকপট উক্তিতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক রয়েছে। —সম্পাদক

ইসলাম একটি বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম

মানুষ তার নিজস্ব গবেষণা ও অনুসন্ধানবলে যত প্রকার ধর্ম বা পন্থা উদ্ভাবন করেছে, সেগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকার ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার উর্ধলোকে বিচরণ থেকে এবং তা আবেদন করে মানুষের বিস্ময়প্রীতিকে। আর দ্বিতীয় প্রকার পন্থার উদ্ভব হয়েছে ইচ্ছা-বাসনা ও প্রবৃত্তির লালসা থেকে এবং তা আবেদন করে মানুষের ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে। এই দুই প্রকার ধর্ম বা পন্থা সৃষ্টিতে যদিও বুদ্ধিবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো হয়েছে; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যেমন তাদের প্রেরণাদাতা নয় তেমনি তারা বুদ্ধিবৃত্তিকে আবেদনও করে না, আর বুদ্ধিবৃত্তিক ফললাভ করাও তাদের চরম লক্ষ্য নয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা তাদের কাছে একটি হাতিয়ার স্বরূপ; তাকে নেহাতই তুচ্ছ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তারা ব্যবহার করে। একটি বস্তুজগত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে অদৃশ্য জগতের প্রতি মনসংযোগ করে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তাবৎ শক্তিকে এমন সব উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যবহার করে, যদ্দারা মানুষ আত্মার গোপন শক্তিনিচয়কে বস্তুগত বন্ধন থেকে মুক্ত করে অদৃশ্য জগতের জ্ঞানাহরণ, আত্মিক আনন্দ লাভ এবং অলৌকিক ক্ষমতা লাভে সমর্থ হতে পারে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি অদৃশ্য জগত থেকে একেবারে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তাবৎ শক্তিকে এমন পন্থা উদ্ভাবনের জন্যে ব্যবহার করে, যাতে করে মানুষ জন্মগত সরঞ্জাম ও উপকরণ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ লাভবান হয়ে আপন দেহের জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ আরাম এবং স্বীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ আনন্দ লাভ করতে পারে। মোটকথা,

---

প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী সংখ্যা 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
—অনুবাদক

জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি এই পন্থা দু'টির সেবক, সন্দেহ নেই; কিন্তু এদের মূল ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার ওপর নির্ভরশীল।

এ'দুয়ের প্রতিকূলে রয়েছে আর একটি ধর্ম, যা খোদা তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। এই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে খালেছ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান থেকে; এর আবেদন হচ্ছে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসা—যাতে করে সে বিশ্বপ্রকৃতিতে নিজের প্রকৃত মর্যাদাটি জেনে নিতে পারে; সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রকৃত রূপটি উপলব্ধি করতে পারে এবং যথার্থ জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে নিজের তামাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শক্তি এবং বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উপকরণাদিকে মানব জীবনের প্রকৃত ও যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্যে ব্যবহার করতে পারে। অর্থাৎ এই দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহতায়ালা তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি বানিয়ে তার যে খেদমত ন্যস্ত করেছেন, তার সঠিক দায়িত্ব পালন করা এবং দায়িত্ব পালনের অনিবার্য ফল হিসেবে পরকালে মালিকের সন্তুষ্টি পেয়ে ধন্য হওয়া।

এ-ধর্ম মানুষের কোন শক্তিকেই নিষ্ক্রিয় করে দেয় না, বরং প্রতিটি শক্তিরই নির্ভুল ব্যবহার-পদ্ধতি বাত্‌লে দেয়। সে মানুষের কোন আকাংখাকেই দমন করে না, বরং প্রতিটি পরিপূরণের জন্যে এক বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত সীমা নির্ধারণ করে দেয়। সে কল্পনার উর্ধলোকে বিচরণে বাধা দান করেনা, বরং তার বিচরণের জন্যে একটি উত্তম পরিবেশ এবং একটি নির্ভুল দিক নির্ণয় করে দেয়। সে মানুষের কার্যকর শক্তিনিচয়কে বস্তুগত সরঞ্জাম ও উপকরণ সংগ্রহ এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বিরত রাখে না, বরং এই সংগ্রহ ও উপকারকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেয় মাত্র। সে প্রতিটি মানুষকে এমন কাজে নিয়োজিত করে, যার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে—তার ঝোঁক আধ্যাত্মবাদের দিকে হোক, কি বস্তুবাদের দিকে, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর মানুষকেই সে এমন জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মণ্ডিত করতে চায়, যাতে করে সে বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করে এবং সিরাতুল মুস্তাকীম ধরে এগিয়ে চল্‌তে পারে; মানুষ হিসেবে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করতে এবং তা সম্পাদন করতে পারে; তার প্রতি খোদা, সৃষ্টিলোক এবং নিজের যেসব অধিকার রয়েছে, তা সঠিকভাবে জান্‌তে এবং তা আদায় করতে পারে।

সে অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকলে তার মধ্যে যেন এতো আত্মলীন হয়ে না যায় যাতে অদৃশ্য জগতের জ্ঞানার্জন এবং আত্মিক আনন্দলাভই তার সমগ্র চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। আবার বস্তুবাদের প্রতি মনোযোগী হলে তার মধ্যেও যেন তার এতোখানি আত্মবিলুপ্তি না ঘটে, যাতে ইন্দ্রিয়জ আনন্দ, দৈহিক আরাম এবং বস্তুগত সাফল্যই তার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়।

এ-হচ্ছে নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধর্ম। এ কারণেই জ্ঞান ও বুদ্ধি ছাড়া এর যথার্থ অনুবর্তনও সম্ভবপর নয়। এখানে প্রতি পদক্ষেপেই চিন্তা-ভাবনা ও অনুধ্যানের প্রয়োজন। যে ব্যক্তি এ-ধর্মের প্রাণবস্তুর সঙ্গে অপরিচিত, এর কলাকৌশল সম্পর্কে অনবহিত, যে এর মূলনীতিগুলো উপলব্ধি করে না, এর শিক্ষাধারা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, সে এর নির্দেশিত সহজ-সরল পথে কিছুতেই দৃঢ়তার সাথে চলতে পারে না। তার ঈমান যতোক্ষণ মৌখিক স্বীকৃতিকে অতিক্রম করে তার চিন্তা ও চেতনার উপর পরিব্যাপ্ত না হবে, ততোক্ষণ তা কার্যত মূল্যহীন। তার কার্যকলাপ যতোক্ষণ নির্ভুল জ্ঞান ও উপলব্ধি দ্বারা মণ্ডিত না হবে, ততোক্ষণ তা কার্যত প্রভাবহীন। আইনের ভাবধারা যতোক্ষণ তার বহিরঙ্গকে অতিক্রম করে তার মন-মস্তিষ্কের ওপর পরিব্যাপ্ত না হবে, ততোক্ষণ তার আনুগত্য অর্থহীন। যদি ‘তক্‌লীদের’ ধারায় না-বুঝে-শুনে সে এই ধর্মের সত্যতার প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং অনুবর্তনও করতে থাকে, তবে তার ঈমান ও আনুগত্য হবে এমন একটি বালুর স্তুপের মতো যা বাতাসের প্রতিটি ঝাপ্‌টায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এহেন মূর্খের ঈমান ও অন্ধের আনুগত্যে কোনরূপ দৃঢ়তার সৃষ্টি হতে পারে না। যে কোন পথভ্রষ্টকারী তাকে প্রকৃত কেন্দ্রস্থল থেকে বিচ্যুত করতে পারে। যে কোন সুদৃশ্য পথই তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। যে কোন ধারণা, কুসংস্কার ও মতবাদই তার প্রত্যয়ের ভিত্তিকে টলিয়ে দিতে পারে। কামনার যে-কোন ঢেউ, ভ্রষ্টতার যে কোন তরঙ্গই তাকে দূর-দূরান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে যদি প্রাচীনপন্থী হয় তো বিশ্বাস ও কর্মের এমন প্রতিটি ভ্রষ্টতাকেই আঁকড়ে রাখতে চাইবে, যা সে বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। যদি সে আধুনিকপন্থী হয় তো প্রবৃত্তির কামনাকে খোদার আসনে বসিয়ে এমন প্রত্যেকটি নতুন পথেই ছুটে চলবে, প্রবৃত্তির

শয়তান যাকে তার সামনে আকর্ষণীয়রূপে তুলে ধরবে। যদি সে দুর্বল প্রকৃতির হয় তো এমন প্রতিটি পথিকেরই পিছন-ধাওয়া করবে যে জীবন পথে কোনরূপ সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ছে বলে তার মনে হবে। আর যদি সে নিজেই চেষ্টা-সাধনা করে কোন পথ রচনা করার মতো যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল দূরদৃষ্টি না থাকা এবং খোদায়ী বিধানের মূলনীতি সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণে জীবনের চলার পথে প্রতিটি সন্ধিমুখে পৌঁছেই সে প্রকৃত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে কাজ করবে এবং শেষপর্যন্ত কোথাও না কোথাও গিয়ে সোজা পথ থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়বেই। মোটকথা, খোদায়ী ধর্মের সঠিক অনুবর্তন এবং এই অনুবর্তনে দৃঢ়তা ও অটলতা প্রদর্শন মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার দ্বারা মোটেই সম্ভব নয়। এর জন্যে জ্ঞানচর্চা, চিন্তা-ভাবনা ও বিচারবুদ্ধি অত্যাবশ্যক এবং এই জিনিসগুলোর পূর্ণতার উপরই এর চরমাৎকর্ষ নির্ভরশীল।

এই ধর্মের ইতিহাসের প্রতি দৃকপাত করলেই আমাদের একথার সত্যতা প্রকট হয়ে উঠবে। দুনিয়ায় খোদার যতো নবী এসেছেন, তারা কেবল একটি আইনব্যবস্থা এবং একখানি কিতাব নিয়েই আসেননি, বরং তার সঙ্গে তাঁরা 'হিকমত ও বিচক্ষণতাও নিয়ে এসেছেন, যাতে করে লোকেরা তাঁদের প্রচারিত শিক্ষা অনুধাবন করতে এবং তাঁদের মাধ্যমে প্রেরিত আইন ব্যবস্থার অনুবর্তন করতে পারে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছেঃ

فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة - (النساء - ٨)

ويعلمه الكتاب والحكمة - (ال عمران - ٤) واتينه

الحكمة - (ص - ٢) قد جئتكم بالحكمة - (الزخرف - ٦)

এই 'হিকমত' জিনিসটা কি? এ হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে উপলব্ধি, জ্ঞানের দীপ্তি, অন্তর্দৃষ্টির আলো, চিন্তা-ভাবনার সামর্থ্য এবং অনুধ্যানের যোগ্যতা। দুনিয়ায় যখনি কোন নবী এসেছেন, তিনি তাঁর অনুবর্তীদেরকে কিতাবের সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটিও দান করেছেন এবং লোকেরা এর সাহায্যেই সোজা পথে

টিকে রয়েছে। তারপর সময়ের আবর্তনে এলো এক অজ্ঞতা ও অন্ধ তক্‌লীদের যুগ; এ যুগে 'হিকমত' অন্তর্হিত হলো এবং শুধু কিতাবই বাকী রয়ে গেলো। কিছুকাল লোকেরা শুধু কিতাবকে সম্বল করে তাদের পূর্ব-পুরুষদের নির্দেশিত পথে চলতে লাগলো। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের ভেতরে ভ্রষ্টতাকে বরণ করার মতো যোগ্যতাও সৃষ্টি হলো। কারণ যে জিনিসের দ্বারা তারা কিতাবকে অনুধাবন করতে এবং গোমরাহী ও হেদায়েতের মধ্যে পার্থক্য কর্‌তে পার্‌তো তাদের মধ্যে সে জিনিসটির অস্তিত্ব ছিলো না। ধীরে ধীরে তাদের পদক্ষেপ সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে লাগলো। কেউ আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। কেউ আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার পিছনে ছুট্‌লো। কেউ পথভ্রষ্ট জাতিগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লো। কেউ মিথ্যা পথপ্রদর্শকদেরকে আসল খোদা বানিয়ে নিলো। অবশেষে 'হিক্‌মতে'র সঙ্গে কিতাবও বিদায় নিলো এবং খোদার প্রেরিত দ্বীনকে বিকৃত করে অন্ধ-কুসংস্কার, আজগুবী কাহিনী এবং চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ তৈরী করা হলো।

এভাবে বারবার খোদায়ী ধর্মের বিলুপ্তি সাধন, আসমানী কিতাবের অন্তর্ধান কিংবা বিকৃত সাধন এবং নবীর উম্মতদের মধ্যে হেদায়েতের পর গোমরাহীর প্রসার লাভের একমাত্র কারণ এই যে, খোদায়ী দ্বীনের প্রাণবস্তু তাঁর কিতাবের আক্ষরিক পঠন-পাঠন এবং বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানগুলোর প্রতি-পালনই নয়, বরং তার সমগ্র নির্ভর হচ্ছে কিতাব সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান ও উপলব্ধির পর। যতোদিন লোকদের মধ্যে 'হিকমত' ছিলো, তারা 'আয়াতে ইলাহী' বা খোদায়ী নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতো এবং নবীদের নির্দেশিত সহজ-সরল পথে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে চলতো, ততোদিন কোন জিনিসই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। আর যখনি এ-জিনিসটি তাদের ভেতর থেকে তিরোহিত হলো, অমনি তাদের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্তের লক্ষণ সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। তাদের ভিতর থেকে যেমন নানা রোগ ব্যাধির উদ্ভব হলো, তেমনি বাহির থেকেও মহামারীর জীবানু তাদেরকে আক্রমণ কর্‌লো। এমন কি দ্বীন, কিতাব, আইন সবকিছু হারিয়ে তারা ভ্রষ্টতার অসংখ্য পথে ছড়িয়ে পড়লো।

অবশ্য পূর্ববর্তী নবীদের পর শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এমন এক কিতাব ও হেদায়েতসহ পাঠানো হয়েছে, যা পূর্বেকার কিতাবগুলোর

মতো বিকৃত বা রূপান্তরিত হবার কোনই আশঙ্কা নেই। কারণ আল্লাহ্-তায়ালা একে অবিকৃতরূপে বাঁচিয়ে রাখার এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, মানুষ একে বদলানোর কিংবা নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করলেও তাতে সফল-কাম হতে পারে না। কিন্তু আজো এই কিতাব ও হেদায়েত থেকে উপকৃত হবার, দ্বীন-ইসলামের সহজ-সরল পথে টিকে থাকার এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করার ব্যাপারটি সম্পূর্ণত এমন জিনিসের ওপর নির্ভরশীল, যা শুরু থেকেই খোদায়ী দ্বীনের ভিত্তি বলে পরিগণিত; আর তা হলো নির্ভুল জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি। খোদার কিতাব ও নবীদের সুন্নাত সকল যুগে ও সর্বাবস্থায়ই উত্তম পথপ্রদর্শক, সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা শুধু তাদেরই জন্যে যারা জ্ঞান ও বুদ্ধির অধিকারী, যারা আল্লাহ ও তাঁর নবীদের হেদায়েতকে উপলব্ধি করতে পারেন, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন, তার থেকে আলো গ্রহণ করেন এবং জীবনের সকল পথে সেই আলো নিয়ে এগিয়ে চলেন। কিন্তু যারা অনুধ্যান ও অনুচিন্তন ও অনুচিন্তনের ন্যায় অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে এবং শুধু বাপ-দাদা মুসলমান হিসেবে রেখে গিয়েছেন বলেই মুসলমান রয়েছে, তাদের জন্যে দ্বীন-ইসলামে প্রকৃত পক্ষে কোন দৃঢ়তা ও অটলতার স্থান নেই। তারা সর্বদাই ভ্রষ্টতা বা গোম-রাহীর আশংকায় লিপ্ত থাকে। ভ্রষ্টতা তাদের ভেতর থেকে উন্মেষিত হতে পারে, আবার বাহির থেকেও হামলা করতে পারে। তাদের নিজস্ব মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে যেমন তাদের সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা রয়েছে, তেমনি তাদের যে ভ্রষ্টতা বিস্তৃত হয়ে আছে, তার কোন একটির পিছনে না বুঝে-শুনে ঝুঁকে পড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তাদেরকে দ্বীন ইসলামের সোজা পথে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখতে পারে, এমন জিনিসটিই তাদের কাছে নেই।

কোরআন মজীদে মানুষের ভ্রষ্টতার আসল কারণ হিসেবে কেবল একটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে আর তা হচ্ছে আয়াতে 'ইলাহী' বা খোদায়ী নিদর্শনকে উপলব্ধি না করা। তাই কোরআন বার বার এ-ব্যাপারে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছে এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (الانفال - ٣)

'আল্লাহর দৃষ্টিতে সেই কালা-বোবাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম জানোয়ার, যে বিচার বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।'

لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغفلون -

(اعراف-٢٢)

'তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না, তাদের দৃষ্টিশক্তি আছে কিন্তু তারা দেখে না; তাদের শ্রবণশক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা শোনে না। তারা হচ্ছে জানোয়ারের মতো, বরং তার চাইতেও অধিক ভ্রষ্ট। এরাই হচ্ছে গাফেল লোক।'

صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون - (التوبه - ١٦)

'আল্লাহ তাদের অন্তরকে বিমুখ করে দিয়েছেন; কারণ তাদের মধ্যে কোন বোধশক্তির বালাই নেই।'

لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذالك بانهم قوم لا يفقهون (محمد-٢)

'তাদের অন্তরে খোদার চাইতে তোমাদের (অর্থাৎ মানুষের) ভয়ই অধিক; এর কারণ হলো তারা বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ নয়।'

افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها - (محمد - ٣)

'তারা কি কোরআন সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করে না, না তাদের হৃদয়ের দরজায় তালা লাগানো রয়েছে?'

افلم يدبروا القول -(مؤمنون - ٣)

'তারা কি একথা সম্পর্কে (যা তাদেরকে বলা হচ্ছে) চিন্তা করেনি? এই নিশ্চিন্ততা ও নির্বুদ্ধিতার ফল দু'টি ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। আর এ দু'টিই হচ্ছে গোমরাহীর নিকৃষ্টতম রূপ।

একটি রূপ হলো এই যে, মানুষ নেহাত না-বুঝে-শুনে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে অন্যের ওপর ছেড়ে দেয়। সে তাকে মুক্তির পথে নিয়ে যাক, কি ধ্বংসের পথে, তার মোটেই পরোয়া করে না।

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا
ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون

(مائده - ١٠٤)

'যখনি তাদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব এবং রসূলের দিকে এসো, অমনি তারা বলে উঠেছেঃ আমাদের জন্যে তো সেই পথই যথেষ্ট, যে পথে আমাদের বাপ-দাদাকে চলতে দেখেছি। এরা কি অন্ধভাবে বাপ দাদাকে অনুসরণ করতে থাকবে, যদি তারা কিছু না-ও জানে এবং সৎপথেও না থাকে?'

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله - (التوبه - ٥)

'তারা খোদাকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও পীরদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। যাকে তারা হারাম বলে, আল্লাহ তাকে হালাল করলেও তা-ই তাদের কাছে হারাম। আর যাকে তারা হালাল বলে, আল্লাহ তাকে হারাম করলেও তা-ই তাদের কাছে হালাল।'

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يليتنا أطعنا الله وأطعنا
الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا -

(احزاب - ٨)

'যখন তাদের চেহারা আগুনে বিকৃত করে দেয়া হবে তখন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের কথা মানতাম। আরো বলবেঃ হে খোদা! আমরা আমাদের সর্দার এবং বড়োদের আনুগত্য করেছি এবং তারাই আমাদের গোমরাহ করে দিয়েছে।'

দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে এই যে, মানুষ খোদার দেয়া পথনির্দেশকে পরিহার করে নিজের মতের ওপর নির্ভর করে। এ পথে প্রথমত কোন দৃঢ়বিশ্বাস থাকে না (যা সৎপথে চলবার নিশ্চিত পাথেয়), বরং এর বেশির ভাগ জিনিসই হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান। দ্বিতীয়ত, এতে বড়ো ভয় হচ্ছে এই যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রবৃত্তির কামনা প্রভাবশীল হয়ে পড়ে এবং তাকে ভারসাম্যের সোজা পথ থেকে বিচ্যুৎ করে বাড়াবাড়ির দিকে নিয়ে যায়। মানুষ যখন এই পথে চলতে শুরু করে, তখন তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এইঃ যেমন কেউ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারে পথ চলছে; ঘটনাচক্রে কখনো নির্ভুল জ্ঞান ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধির বিদ্যুৎ চমকে গেলো তো রাস্তাও দেখতে পেলো আর কিছুটা এগোতেও পারলো كلما اضاء لهم নতুবা হয়রান হয়ে মাঝ পথে দাঁড়িয়ে গেলো و اذا اظلم عليهم مشوا فيه قاموا

অথবা পথ চলতে চলতে কোন কাঁটাবনে গিয়ে আটকে গেলো কিংবা কোন গর্তে গিয়ে পড়লো।

وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا -

(يونس - ٣٦)

'তাদের বেশির ভাগ লোক নিছক অনুমান ছাড়া আর কিছুরই অনুসরণ করে না। আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা সত্য (নিশ্চিত জ্ঞান) থেকে কিছুমাত্র বে-নিয়াজ করে না।'

ارايت من اتخذ الهه هواه ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او
يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا - (الفرقان -)

'তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছো, যে প্রবৃত্তির কামনাকে নিজের খোদা বানিয়ে নিয়েছে?....তুমি কি মনে করো, এ ধরনের লোকদের বেশির ভাগই শোনে এবং বুঝে? মোটেই নয়, ওরা তো শুধু জানোয়ারের মতো, বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট।'

ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله - (قصص - ٥)

'তার চাইতে বেশি পথভ্রষ্ট আর কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশকে বর্জন করে স্বীয় প্রবৃত্তির বাসনার অনুবর্তন করে?'

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا -
(كهف - ٥)

'এমন ব্যক্তির কথা তুমি আদৌ শুনো না, যার অন্তর আমার স্মরণ থেকে গাফেল রয়েছে এবং যে স্বীয় প্রবৃত্তির বাসনার আনুগত্য করেছে এবং যার কাজে ভারসাম্যের সীমা লংঘিত হয়েছে।'

ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون - (جاثيه - ٢)

'এমন লোকদের প্রবৃত্তির অনুকরণ করো না, যারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী নয়।'

এই হচ্ছে 'খোদায়ী আয়াত' সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করা এবং অনুধ্যান-অনুশীলনের সাহায্যে কাজ না করার পরিণাম-ফল। যারা শুধু 'আয়াত পঠন-পাঠন করেই ক্ষান্ত হয়, কিন্তু তাকে বোঝবার চেষ্টা করে না; কিতাবকে সঙ্গে রাখে, কিন্তু তার শিক্ষা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ এবং তার বিধিব্যবস্থাকে জানবার চেষ্টা করে না; নবীর সত্যতার প্রতি ঈমান পোষণ করে, কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত পথ-নির্দেশ সম্পর্কে নিরেট অন্ধ; ইসলামের যথার্থ্য সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তার মূলনীতি ও প্রাণবস্তু সম্পর্কে অনবহিত; তাদের জন্যে প্রতি পদক্ষেপেই ভ্রষ্টতার উক্ত দুটি রূপের মধ্যে কোন একটিতে জড়িয়ে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মুসলমানদেরকে বারবার তাকীদ করেছেন যে, দ্বীন সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে হবে, তার শিক্ষা ও বিধিব্যবস্থাকে বুঝতে হবে এবং তাদের মধ্যে অন্ততঃ এমন একটি দল হামেশা থাকতে হবে, যারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভের জন্যে নিজদেরকে উৎসর্গ করে দেবে, যাতে করে তারা অন্যান্য ভাইদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করতে পারে।

কোরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا
الْاَلْبَابِ - (ص - ٣)

‘এই কিতাবকে আমি তোমার প্রতি নাজিল করেছি বরকতপূর্ণ করে, যাতে করে লোকেরা এর ‘আয়াত’ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যারা বিচার-বুদ্ধির অধিকারী, তারা এ থেকে সবক গ্রহণ করে।’

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ - (نعام - ١٦)

‘আমি সমজদার লোকদের জন্যে ‘আয়াত’কে বর্ণনা করেছি সবিস্তারে।’

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ - (ال عمران - ١٧)

‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের জন্যে তাদেরই মধ্য থেকে একজন নবী পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে ‘আয়াত’ পাঠ করে শুনান, তাদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মতের শিক্ষাদান করেন।’

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا - (بقره - ٣٧)

‘যাকে হিক্‌মত দেয়া হয়েছে, তাকে অনেক কিছু কল্যাণ দেয়া হয়েছে।’

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ
وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ - (توبه - ١٥)

'তাদের প্রত্যেক দল থেকে এমন কিছু লোক কেন বেরুলো না, যারা দ্বীন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে আপন কওমকে সতর্ক করে দিতো?'

এই প্রসঙ্গে নবী করীম (ছ)ও প্রচুর পথনির্দেশ দান করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে সাইয়েদেনা আলী (রা)-এর একটি বর্ণনা এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ

قال رسول الله عليه وسلم الا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه
ولا علم ليس فيه تفهم ولا قراءة ليس فيها تدبر -

'রসূলুল্লাহ (ছ) বলেছেন ঃ জেনে রাখো, যে ইবাদাতে অনুচিন্তা নেই, তাতে কোন কল্যাণ নেই; যে জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি নেই, তাতে মঙ্গল নেই, আর যে কোরআন পাঠে অনুধ্যান নেই, তাতে কোন কল্যাণ নেই।' অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين -

'আল্লাহ্ যার মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিও দান করেন।'

আর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا دينهم -

'লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি হচ্ছে উত্তম, যে আচরণের দিক থেকে উত্তম; অবশ্য যদি সে বিচার ক্ষমতার অধিকারী হয়।'

বর্তমানে মুসলমানদের সবচাইতে বড়ো, বরং আসল বিপদ এই যে, তাদের মধ্যে দ্বীন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি এবং কোরআন ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে কোন অনুধ্যান নেই। এই অভাব ও শূন্যতাই তাদের গোটা ধর্মবিশ্বাসকে অন্তঃ-সারশূন্য, তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে প্রাণহীন, তাদের চেষ্টা-সাধনাকে বিক্ষিপ্ত ও অব্যবস্থিত এবং তাদের জীবন ধারাকে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে।

তাদের মধ্যে ইসলামের ভক্ত তো অনেকেই রয়েছে; কিন্তু ইসলামের সমজদার রয়েছে খুবই কম। আজকে কোরআন এবং মুহাম্মদ (ছ)-এর নামে প্রাণপাতকারীর কোন অভাব নেই। কিন্তু কোরআন ও মুহাম্মদ (ছ)-এর পেশকৃত দ্বীনের প্রাণবস্তু এবং তার মূলনীতির সমজদার লোকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এটা হচ্ছে তাদের নির্বুদ্ধিতারই ফল। কারণ যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে ভাবে এবং প্রচার করে, তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ধরনের কুসংস্কার ও মুশরেকী বিশ্বাস থেকে শুরু করে নাস্তিকতা, বস্তুতান্ত্রিকতা ও কুফরীতুল্য ভাবধারা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজেদেরকে যে ইসলামের অনুবর্তী বলে দাবি করে তার সাথে উক্ত ভাবধারার সম্পূর্ণ অসঙ্গতি রয়েছে, এ অনুভূতিটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। তাদের নৈতিক ও বাস্তব জীবনের অবস্থা এর চাইতেও নিকৃষ্ট। ইসলামের অনুবর্তী বলে দাবিদার এই জাতির মধ্যে মূর্তিপূজারী রসম-রেওয়াজ থেকে শুরু করে আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার নিকৃষ্টতম কুফলস্বরূপ সকল প্রকার রীতি-নীতিই প্রচলিত রয়েছে। তারা যে আইন-কানুনের প্রতি বিশ্বাস পোষণের দাবি করে, তার মূলনীতি ও বিধিবিধান থেকে তারা কোন কোন স্থানে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, নগণ্য ব্যক্তিক্রম ছাড়া এ অনুভূতি পর্যন্ত কোন দলের নেই। যে কোন দিক থেকে যে-কোন ভ্রান্ত চিন্তা ও প্রক্রিয়া আসুক না কেন, তাদের মধ্যে অমনি চালু হয়ে যায় এবং তারা মনে করে যে, ইসলামে এরও অবকাশ রয়েছে। কোন বিভ্রান্তকারী একটু সুন্দরভাবে পথ চলতে পারলে অমনি সে এদের পথপ্রদর্শক বনে যায়। এরা মনে করে যে, মুহাম্মদ (ছ)-এর সঙ্গে আমারা তারও অনুবর্তন করতে পারি। মোটকথা, যে কোন অনৈসলামী বস্তুকে তারা নিঃসঙ্কোচে ইসলামের সঙ্গে একই মস্তিষ্কে এবং একই জীবনে একত্রিত করে ফেলে। কারণ ইসলাম ও অনৈসলামের পার্থক্যটা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান ও বোধশক্তির উপর নির্ভরশীল আর এখানে রয়েছে তারই অভাব। যে ব্যক্তি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যকার পার্থক্যটা ভালো করে জানে, সে প্রাচ্যের পথ ধরেও প্রতীচ্যের পথে চলছে বলে মনে করবে, এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় সে কখনো দিতে পারে না। এ ধরনের কাজ কেবল অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেই করতে পারে। আর প্রাচ্য থেকে শুরু করে প্রতীচ্য অবধি বিরাট মুসলিম সমাজে একটি নগণ্য দল ছাড়া এই অজ্ঞতার পরিচয়ই আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। তাদের অশিক্ষিত জনগণ, সনদপ্রাপ্ত আলেম

সমাজ, জুব্বাধারী পীর সাহেবান এবং কলেজ ও ইউনিভারসিটিতে শিক্ষা প্রাপ্ত লোকেদের মধ্যে ধ্যানধারণা ও রীতিনীতিতে প্রচুর ব্যবধান ও বিভিন্নতা রয়েছে বটে, কিন্তু ইসলামের তাৎপর্য ও তার প্রাণবস্তু সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ব্যাপারে তারা সবাই সমান।

নবী করীম (ছ)-এর একটি প্রাজ্ঞ উক্তি হচ্ছেঃ

صِنْفَانِ اذا صلحت الأمة و اذا فسدا فسدت الأمة السلطان و العلماء

'মানব সমাজে দু'টি দল রয়েছে; তারা যদি ঠিক থাকে তো জাতিও ঠিক থাকে, আর তারা বিগড়ে গেলে জাতিও বিগড়ে যায়। সে দল দু'টি হচ্ছেঃ শাসকবর্গ এবং আলেম সমাজ।'

মুসলিম ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ই হচ্ছে নবী করীম (ছ)-এর এই উক্তির সত্যতার প্রমাণ। আর আজকে আমরা এর সত্যতাকে সবচাইতে বেশি উজ্জ্বল রূপে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের শাসকবর্গ এবং আলেম সমাজে যদি সত্যকার তাকওয়া এবং দ্বীন সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাক্‌তো, তাহলে কদাচ অবস্থার এতখানি অবনতি ঘটতো না। আর আজো যদি মুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে এমনি দিশারী ও পথপ্রদর্শকের আবির্ভাব ঘটে, তবে পরিস্থিতির এহেন অবনতি সত্ত্বেও সংশোধন সম্পর্কে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই।

ইবাদাত সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

মানুষের ধর্মীয় চেতনা ইবাদাত বা উপাসনা সম্পর্কিত চেতনা হচ্ছে সবচাইতে প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ চেতনা; বরং অধিকতর সত্য কথা এই যে, ইবাদাত বা উপাসনাই হচ্ছে ধর্মের মৌলিক চেতনা। এই কারণে আজ পর্যন্ত মানব জাতির ইতিহাসে যতোগুলো ধর্মের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে—তা নিম্নস্তরের অসভ্য জাতিগুলোর অন্ধ কুসংস্কার হোক, কি উচ্চস্তরের সুসভ্য জাতিগুলোর ধর্মবিশ্বাস হোক—তার কোন একটিও ইবাদাত বা উপাসনা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত নয়। নৃতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে প্রাচীনতম সভ্যতার অনুবর্তী জাতিগুলোর যে অবস্থা জানা গিয়েছে, তাও এ সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। বুদ্ধিবৃত্তি ও চেতনাশক্তির দিক থেকে ঐ জাতিগুলো যদিও একেবারে প্রাথমিক স্তরে ছিলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মতো কাউকে অবশ্যই মাবুদ বা উপাস্য বানিয়ে নিত এবং কোন-না-কোন উপাসনা পদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণ করত।১ প্রাচীন জাতিগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে আজো বহু মানব গোষ্ঠী বর্তমান রয়েছে, যারা মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে আদিমতম জাতিগুলোর পর্যায়ভুক্ত; বরং বলা যায় তাদের জীবন থেকে মানব জাতির

প্রবন্ধটি ১৯৩৫ সনের জুলাই সংখ্যা 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকা থেকে গৃহীত। —সম্পাদক

(১) বরং অধুনাতম নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে তো এই অদ্ভুত সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে, আদিমতম মানবীয় সভ্যতার অনুবর্তী জাতিগুলোর মধ্যেও খাঁটি তওহীদী প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায় এবং তা মুশরেকী প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত। (দ্রষ্টব্য: নৃকুল-বিদ্যা; লেখক—ডক্টর বায়রণ ওমর রাজফ; প্রকাশক-আঞ্জুমানে তরক্কীয়ে উর্দু, দিল্লী।) এটা কোরআন মজীদের এই বর্ণনারই পুরোপুরি সত্যতা প্রমাণ করে যে, মানুষের আদিমতম ধর্ম হচ্ছে তওহীদ আর শের্ক হচ্ছে পরবর্তীকালের আবিষ্কার। এই গবেষণা উনিশ শতকের ধর্মীয় দর্শনের গোটা মতবাদ বদলে দিয়েছে।

একেবারে প্রাথমিক যুগের ছাপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাদের মধ্যেও মাবুদ ও ইবাদাত তথা উপাস্য ও উপাসনা চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কোন জাতির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।[১] কাজেই এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, প্রাচীনতম অসভ্যতা ও পাশবিকতা থেকে শুরু করে আধুনিকতম সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্যন্ত যতো গুলো পর্যায় মানুষ অতিক্রম করেছে, তার প্রত্যেক পর্যায়েই ইবাদত ও উপাসনা-চেতনা তার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে—যদিও তার রূপ—প্রকৃতিতে নানাবিধ পরিবর্তন ও বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়ে আসছে।

ইবাদাত একটি স্বাভাবিক প্রেরণা

আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, এরূপ কেন হয়? সমগ্র মানব জাতির মনে এরূপ চেতনা পরিব্যপ্ত হওয়া এবং অবস্থাগত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল যুগে একই রূপ পরিব্যাপ্তির কারণটা কী? এটা কি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে? যদি তাই হতো সমগ্র মানব জাতির মনে এভাবে পরিব্যাপ্ত হওয়া অসম্ভব ছিলো। কারণ স্বেচ্ছায় অবলম্বিত কোন জিনিসের মধ্যে কখনো পূর্ণ সাদৃশ্য স্থাপিত হতে পারে না। মানুষের অবলম্বিত জিনিসগুলোর মধ্যে এমন একটি জিনিসও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার ভেতর সকল যুগের সকল স্তরের সমগ্র মানব জাতি সমান ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। আর এটাও কল্পনা করা যায়না যে, একযুগের তাবৎ মানুষ একটি বিশ্বসম্মেলনের ব্যবস্থা করে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে যে, তারা অবশ্যই কারো উপাসনা করবে—হোক না তাদের উপাস্য বিভিন্ন এবং উপাসনা পদ্ধতি বেশুমার। তাছাড়া জিনিসটা যখন অবলম্বিত হতে পারে না, তখন স্বভাবতই এটা মানতে হবে যে, ইবাদাত বা উপাসনার প্রেরণা মানুষের ভিতরকার একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা। মানুষের যেমন স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধা লাগে এবং তার নিবৃত্তির জন্যে সে আহার্য তালাশ করে তার যেমন ঠাণ্ডা এবং উত্তাপ স্বাভাবিকভাবে অনুভূত হয় এবং এগুলো থেকে বাঁচবার জন্যে সে পোশাক ও ছায়া খুঁজে বেড়ায়, তার মধ্যে যেমন চিত্তবৃত্তি প্রকাশের

(১) এই সকল তথ্যের জন্যে উপরিউক্ত গ্রন্থটির (পৃঃ নং ৪২ নং দ্রষ্টব্য) অধ্যয়ন খুব ফলপ্রদ হবে।

(২) কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, দুনিয়ায় এমন অনেক লোক দেখা যায় এবং এমন জাতিও বর্তমান রয়েছে, যাদের কোন ধর্ম নেই এবং কর্মে ও বিশ্বাসে যারা কারো উপাসনাই করে না। এর জবাব এই যে, নপুংসকদের একটা বিরাট দলের অস্তিত্ব থেকে যেমন এটা প্রমাণিত হয় না যে, যৌন প্রেরণা মানুষের কোন স্বাভাবিক প্রেরণা নয়; অনূঢ় ও সন্ন্যাসীদের একটা বিরাট দলের অস্তিত্ব যেমন একথা প্রমাণ করে না যে,

বাসনা স্বভাবত জেগে ওঠে এবং তা পূর্ণ করার জন্যে সে শব্দ ও ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি উপাসনার প্রেরণাও তার মধ্যে স্বাভাবিক-ভাবেই জাগ্রত হয় এবং তা' চরিতার্থ করার জন্যে সে-কোন উপাস্যকে খুঁজে নিয়ে তার বন্দেগীতে লিপ্ত হয়।

কিন্তু আমরা ক্ষুধা, ঠাণ্ডা ও উত্তাপের অনুভূতি এবং চিত্তবৃত্তির প্রকাশের আকাংখার বেলায় দেখতে পাই যে, প্রকৃতির প্রভাবটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেবল স্পৃহা পর্যন্তই সীমিত থাকে, যা মানুষের খাদ্য, ছায়া, পোশাক এবং চিত্তবৃত্তি প্রকাশের মাধ্যমে তালাশে বাধ্য করে এবং এই সকল কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে আর এ-পর্যন্তই সমস্ত মানুষের মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এর পরেই প্রকৃ-তির প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষের ইখতিয়ার ও ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে উঠে। আর এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়, বেশুমার মত-বৈষম্য যা খাদ্য, গৃহ, পোশাক, ভাষা, ইঙ্গিত ও প্রতীকের বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতির দিক থেকে এক-এক যুগের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। ইবাদাত বা উপাসনা সম্পর্কিত প্রেরণার ব্যাপারটিও প্রায় এইরূপ বলা চলে। সে মানু-ষকে বন্দেগী ও উপাসনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেই ছেড়ে দেয়। এরপর এই প্রেরণাকে চরিতার্থ করার জন্যে সে কাকে উপাস্য মানবে এবং তার উপা-সনায় কী পন্থা অবলম্বন করবে, এটা মানুষেরই নিজস্ব পসন্দের ব্যাপার। এই অবলম্বনের সীমা অবধি পেঁৗছেই উপাস্য এবং উপাসনার পদ্ধতিতে বৈষম্য ও বিভিন্নতা শুরু হয়, যা মানুষের অবলম্বিত প্রতিটি জিনিসেই লক্ষ্য করা যায়। যদিও এ ব্যাপারেও প্রকৃতির পথনির্দেশ একেবারে মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে না—খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি কাম্য বস্তুর নির্বাচনে যেমন ত্যাগ করে না ; কিন্তু এই পথ নির্দেশ এতোটা অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, তার সন্ধান লাভের জন্যে নেহাত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ চেতনার প্রয়োজন, যা খুব কম লোকেরই থাকে।

এবার অনুসন্ধান করে দেখা যাক, এই স্বাভাবিক প্রেরণার মূল সূত্রটি কোথায় পাওয়া যায়? এই আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলটি কোথায়, যা মানুষকে

দাম্পত্য কামনা মানুষের স্বাভাবিক কামনা নয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ কারণে উপাসনার স্বাভাবিক প্রেরণার দিক থেকে নিস্তেজ ও অনুভূতিহীন কোন জাতি বা জনসমষ্টির অস্তিত্বও এ দাবিকে প্রমাণ করে না যে, মানুষের মধ্যে উপাসনার প্রেরণা কোন স্বাভাবিক প্রেরণা নয়।

উপাসনার জন্যে টান্‌তে থাকে? কোন্‌ কোন্‌ শক্তি তাকে মাবুদের সন্ধান এবং তার ইবাদাতের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? এবং এই অনুসন্ধান ব্যাপদেশে প্রকৃতির কাছ থেকে কী পথনির্দেশ আমরা লাভ করতে পারি? এর জন্যে সর্বপ্রথম আমাদের উপাসনার তাৎপর্য সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে। এছাড়া উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা করা দুরূহ ব্যাপার।

ইবাদাতের তাৎপর্য

ইবাদাতের ধারণা প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপকতর ধারণা, যা অপেক্ষাকৃত দু'টি ক্ষুদ্র ধারণার সমন্বয়ে পূর্ণতা লাভ করেঃ প্রথম বন্দেগী বা আনুগত্য দ্বিতীয় পূজা ও অর্চনা। বন্দেগীর অর্থ হলো, কোন উচ্চতর শক্তির কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবৃত্তি করা। আর অর্চনার মানে হলো, কোন উচ্চতর সত্তাকে পূত-পবিত্র ও মহিমান্বিত ভেবে তার সামনে সবিনয়ে মস্তক নত করে দেয়া এবং কার্যত তার পূজা করা। এর প্রথম ধারণাটি ইবাদাতের প্রাথমিক ও মৌলিক ধারণা আর দ্বিতীয়টি চূড়ান্ত ও পূর্ণত্বসূচক। প্রথমটি ভূমিস্বরূপ আর দ্বিতীয়টি ইমারত তুল্য। এ কারণেই আমাদের অনুসন্ধানের সূচনা প্রথম ধারণাটি থেকেই করা উচিত।

বন্দেগী বা আনুগত্য

বন্দেগী তথা আনুগত্য ও আজ্ঞানুবৃত্তি হামেশা এমন শক্তির মুকাবিলায় করা হয়ে থাকে, আজ্ঞানুবর্তীর ওপর যার প্রভুত্ব ও প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব ও আধিপত্যও রয়েছে এবং আজ্ঞানুবর্তীর মধ্যে যার বিরুদ্ধাচরণ করার মতো সাহস নেই। এর একটা সীমিত রূপ আমরা সাধারণত দেখতে পাই মনিব ও চাকরের সম্পর্কের মধ্যে। কিন্তু এর চাইতেও ব্যাপক ও স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায় সরকারের প্রতি প্রজার আনুগত্য থেকে। সরকার কোন জড় পদার্থ নয়, এ কোন অনুভূত ও ইন্দ্রিয়গোচর জিনিসও নয়, বরং সরকার হচ্ছে একটি বিধিব্যবস্থা ও আইন-শৃংখলার বন্ধন, যার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য লক্ষ্য-কোটি মানুষের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। প্রজাসাধারণ ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, তারই আইন অনুসরণ করে চলে। লোকেরা আপন গৃহকোণে, কৃষক তার ফসলক্ষেতে, পথিকেরা দূরান্তের বিজন বনে—যেখানে দৃশ্যত সরকারের শক্তি প্রয়োগ করার মতো কেউ নেই—তারই আইনের অনুবর্তন করে থাকে। তার কর্তৃত্ব-সীমায় বাস করে যে ব্যক্তি তার আইনের

বিরুদ্ধাচরণ করে, তাকে যথারীতি শাস্তি প্রদান করা হয়। আর গুরুতর রকমের অপরাধ করে বসলে তো তার সমস্ত নাগরিক অধিকারই বিলোপ করা হয়। এই দৃষ্টিতে যে পরিমাণ লোক কোন সরকারের কর্তৃত্বসীমায় বাস করে এবং তার আইনের অনুবর্তন করে চলে তাদের সম্পর্কে আমরা বলে থাকি যে, তারা অমুক সরকারের আনুগত্য ও আজ্ঞানুবৃত্তি করছে। কিন্তু এই শব্দগুলোর পরিবর্তে আমরা ধর্মীয় পরিভাষা ব্যবহার করলে বলতে পারি যে, তারা তার বন্দেগী ও ইবাদাত করছে।

এবার এই ধারণাটিকে আরো প্রশস্ত করে দিন। গোটা বিশ্বলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা দেখতে পাবেন যে, নিখিল বিশ্ব এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণু এক প্রচণ্ড নিয়ম-শৃংখলায় আবদ্ধ হয়ে আছে। একটি ধূলি-কণা থেকে শুরু করে নক্ষত্রলোক অবধি গোটা বিশ্বলোকই ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায়, একটি নির্দিষ্ট আইন অনুসরণ করে চলছে। এই আইনের বিরুদ্ধাচরণ করবার ক্ষমতা কোন পদার্থের নেই। (যে অণুপরমাণু এর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে-ই ধ্বংস ও বিলুপ্তির কবলে নিক্ষিপ্ত হয়।) এই প্রচণ্ড আইনটি মানুষ, পশু, বৃক্ষ, পাথর, বায়ু, পানি এবং আসমান ও জমিনের তামাম দেহধারী বস্তু ও প্রাণীর ওপরই সমান পরিব্যাপ্ত; আর একেই আমরা বলে থাকি প্রাকৃতিক আইন বা কানুনে ফিতরাত (Law of Nature)। এর অধীনে যাকে যে কাজেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সম্পাদনেই সে লিপ্ত রয়েছে। তার ইঙ্গিতেই বায়ু প্রবাহিত হয়। তার নির্দেশেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তার হুকুমেই তারকারাজি গতিমান হয়। ফলকথা, এই নিখিল বিশ্বের সব কিছু এই আইনানুসারে সংঘটিত হচ্ছে। এই আইন প্রত্যেকটি অণুকে যে কাজে নিয়োজিত করেছে, তাতেই সে লিপ্ত রয়েছে। আমরা যাকে জীবন, স্থিতি ও সৃষ্টি বলে অভিহিত করি, তা হচ্ছে মূলত এই আই-নেরই আনুগত্যের ফল আর যাকে মৃত্যু, বিনাশ ও লয় বলে আখ্যা দেই, তাও হচ্ছে এই আইনেরই অবাধ্যরই ফলমাত্র। অন্যকথায় আমরা বলতে পারি ঃ প্রতিটি জীবন্ত ও স্থায়ী জিনিসই এই আইনের অনুগত। এর অনুগত্য না করে বিশ্বজগতের কোন জিনিসই জীবন্ত এবং স্থায়ী থাকতে পারে না।

কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে, আইনের আনুগত্য মূলত আইনের আনুগত্যই নয়, বরং যে সরকার আপন কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের বলে এই আইনটি প্রবর্তন করেছে, এ হচ্ছে তারই আনুগত্য। পরন্তু রাষ্ট্রের

নিয়ম-শৃংখলা কায়েম করার জন্যে অবশ্যই একজন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা বা একটি উচ্চতর সত্তার প্রয়োজন। ঠিক তেমনি প্রাকৃতিক আইনের আনুগত্যও হচ্ছে মূলত সেই প্রবল-পরাক্রান্ত রাষ্ট্র-সরকারের আনুগত্য, যে আইনটি তৈরী করে আপন কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাবলে প্রবর্তন করে দিয়েছে। অধিকন্তু এ রাষ্ট্রটি রয়েছে এমন একজন উচ্চতর শাসনকর্তার শক্তির মুঠোয় আবদ্ধ যিনি ছাড়া এতো বিশাল ব্যবস্থাপনা এক মুহূর্তের তরেও চলতে পারে না। এখানে যদি শাসনতান্ত্রিক শব্দ 'আনুগত্যে'র পরিবর্তে ধর্মীয় শব্দ 'ইবাদাত' ব্যবহার করি এবং 'শাসনকর্তা'র স্থলে 'আল্লাহ' কিংবা 'খোদা' শব্দ বসিয়ে দেই, তাহলে বলা যেতে পারে যে, গোটা বিশ্বলোক এবং তার প্রতিটি জিনিসই আল্লাহ্‌র ইবাদাত করেছে এবং এই ইবাদাতের ওপর প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব এবং স্থিতিই নির্ভরশীল। বিশ্বলোকের প্রতিটি জিনিস এবং সমগ্রভাবে নিখিল বিশ্বজাহান আল্লাহ্‌র ইবাদাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও গাফিল হতে পারে না। আর গাফিল হলে এক মুহূর্তও টিকে থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে এই বন্দেগীকেই কোথাও 'ইবাদাত' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও তা 'প্রশংসা-কীর্তন' (تسبيح) ও 'পবিত্রতা-বর্ণনা' (تقديس) নামে, আর কোথাও 'সিজদাকরণ' (سجود) ও 'আজ্ঞানুবর্তন' (قنوت) নামে উল্লেখিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের আয়াত লক্ষ্য করা যায়ঃ

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - (الذريات - ٣)

'আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি।'

وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته
ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون - (الانبياء - ٢)

'আস্‌মান ও জমিনে যতো জিনিস আছে এবং যা' কিছু রয়েছে খোদার কাছে, তা সবই তাঁর এবং তাঁর ইবাদাত থেকে কখনো অবাধ্যচরণ করে না আর কখনো পরিশ্রান্তও হয় না। (তারা) রাত-দিন তাঁরই প্রশংসাকীর্তনে লিপ্ত রয়েছে এবং কখনো তাঁর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।'

يسبح لله ما في السموات و ما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم (جمعه)

'আস্‌মান ও জমিনে যা' কিছু রয়েছে, সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা-কীর্তন করছে; সেই বাদশার (প্রশংসা), যিনি পবিত্র, পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ।'

الم تر ان الله يسبح له من في السموات و الارض و الطير صفت كل قد علم صلوته و تسبيحه . . . و لله ملك السموات و الارض و الى الله المصير - (النور - ٥)

'তোমরা কি দেখো না যে, আস্‌মান ও জমিনে যা' কিছু আছে এবং যে পাখীরা পাখা বিস্তার করে উড়ে বেড়াচ্ছে, সবাই আল্লাহ্‌র প্রশংসা-কীর্তন করছে; সবাই আপন প্রার্থনা ও প্রশংসা-কীর্তনের নিয়ম সম্পর্কে অবহিত। আস্‌মান ও জমিনের কর্তৃত্ব আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ এবং সবাইকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

تسبح له السموات السبع و الارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم - (بنى اسرائيل -)

'সাত আসমান ও জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবাই তাঁর প্রশংসা কীর্তন করছে। তাঁর প্রশংসাসহ স্তুতিবাদ করেনা এমন কোন জিনিসই নেই। কিন্তু তোমরা তাদের স্তুতিবাদ উপলব্ধি করো না।'

و له من في السموات والارض كل لله قانتون - (الروم - ٣)

'আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর। সবাই তাঁর নির্দেশের সামনে নত হয়ে আছে।'

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان - (الرحمن - ١)

'সূর্য ও চন্দ্র এক নির্দিষ্ট হিসাব অনুযায়ী আবর্তিত হচ্ছে আর বৃক্ষ ও নক্ষত্ররাজি সিজদারত রয়েছে।'

'লোকেরা কি খোদার কোন সৃষ্টির প্রতিই দৃষ্টিপাত করে না, যাদের ছায়া ডানে ও বামে অবনত হয়, যেন আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত রয়েছে এবং বিনয় প্রকাশ করছে? আর যতো জীবজন্তু ও ফেরেশতা আসমান ও জমিনে রয়েছে, সবাই আল্লাহ্‌কেই সিজদা করে এবং কখনো তাঁর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে না; বরং আপনার মহিমান্বিত প্রভুকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তা-ই পালন করে থাকে।' (আন্‌নাহ্‌ল ঃ ৫)
'তুমি কি দেখ না যে, যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে এবং চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড়, বৃক্ষ, জানোয়ার আর বহুতরো সৎলোক ও অবাধ্যতার দরুন শাস্তিযোগ্য বহু লোক—সবাই আল্লাহ্‌র সামনে সিজদারত রয়েছে?
'জমিন ও আসমানে যতো জিনিস রয়েছে, সবাই ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় আল্লাহকে সিজদা করছে।'

এই ইবাদত, সিজদা, তসবীহ, আজ্ঞানুবর্তি (قنوت) সমস্ত প্রাণবান ও নিষ্প্রাণ এবং সচেতন ও অচেতন বস্তুর ওপর সমানভাবে পরিব্যাপ্ত। আর ধূলির একটি কণা, পানির একটি বিন্দু এবং তৃণের একটি খণ্ডের ন্যায় মানুষও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরুপায়। মানুষ খোদাবিশ্বাসী হোক কি অবিশ্বাসী, খোদাকে সিজদা করুক কি পাথরকে, খোদার পূজা করুক কি অখোদার—সে যখন প্রাকৃতিক আইনানুযায়ী চলছে এবং এই আইনানুসারেই জিন্দা রয়েছে, তখন স্বভাবত সে না বুঝে শুনে, অনিচ্ছায় ও অসম্মতিক্রমে এবং বাধ্য হয়েই খোদার ইবাদত করছে; তাঁর সামনেই সিজদারত রয়েছে এবং তাঁরই তসবীহ পাঠে লিপ্ত রয়েছে। তার ওঠাবসা, চলা-ফেরা, পানাহার, শয়ন-জাগরণ সব কিছুই তাঁর ইবাদত। সে নিজের ইচ্ছাবলে অন্য কারো পূজা করতে পারে, নিজের জবান দ্বারা অন্য কারো গোলামী ও আনুগত্য করতে পারে; কিন্তু তার দেহের প্রতিটি পশম সেই খোদার ইবাদতেই মশগুল রয়েছে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার শোণিতধারা তাঁরই

ইবাদতে আবর্তিত হচ্ছে। তার অন্তর তাঁরই ইবাদতে ক্রিয়াশীল। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁরই ইবাদতে কর্মরত। এমন কি, যে জবান দ্বারা সে খোদাকে অস্বীকার এবং অন্যের স্তবস্তুতি করে, তাও প্রকৃতপক্ষে তাঁরই ইবাদতে চলমান।

বন্দেগীর প্রতিফল

এই বন্দেগীর প্রতিফল কিংবা পুরস্কার খোদার কাছ থেকে কি পাওয়া যায়? জীবন-জীবিকা, বাঁচার শক্তি ইত্যাদি যতো জিনিসই খোদার আইনানুসারে চলে এবং তার বন্দেগী করে, তারাই জীবিত ও টিকে থাকে এবং তাদেরকেই বাঁচার উপায় দান করা হয়, আর একেই আমরা জীবিকা (رزق) বলে আখ্যায়িত করি। আর যেসব জিনিস তার আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ওপর ধ্বংস ও বিপর্যয় আপতিত হয়; তাদের জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এ ধরনের কারবার বিশ্ব লোকের প্রতিটি বস্তুর সঙ্গেই হচ্ছে। এতে বৃক্ষ ও পাথর, মানুষ ও পশু, কাফের ও মুমিনের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।

وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها

(هود - ١)

'দুনিয়ায় এমন কোন গতিমান জিনিস নেই, যার জীবিকা আল্লাহর হাতে নয়। আল্লাহ প্রত্যেকের বাসস্থানও জানেন এবং তার চূড়ান্ত ঠিকানা সম্পর্কে অবহিত।

يا يها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله

يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون - (فاطر - ١)

"হে মানুষ! তোমরা নিজেদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ করো। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের জীবিকা দান করেন? তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই। অতএব, তোমরা পথ ভুলে কোথায় যাচ্ছো?"

هو الذى جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في منا كبها و كلوا من رزقه

(الملك - ٦)

"তিনিই জমিনকে তোমাদের জন্যে অধীন ও বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার প্রশস্ততার ওপর বিচরণ করো এবং তার রেজেক খাও।"

امن يبدء الخلق ثم يعيده و من يرزقكم من السماء و الارض اله

مع الله قل هتوا برها لكم ان كنتم صادقين - (النمل - ٥)

"সৃষ্টবস্তুকে কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং তারপর তাকে ফিরিয়ে নেন? কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবিকা দান করেন? আল্লাহর সাথে কি আর কোন মাবুদ আছে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করো।"

او لم يروا الى الطير فوقهم صفت و يقبضن ما يمسكهن الا

الرحمن انه بكل شيء بصير - امن هذا الذى هو جند لكم

ينصركم من دون الرحمن ان الكفرون الا في غرور ط امن هذا

الذى يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو و نفور -

(الملك - ٢)

"এরা কি পাখীদেরকে দেখতে পায়না, যারা এদের উপর পাখা বিস্তার করে দলবদ্ধভাবে উড়ে বেড়ায়? দয়াময় খোদা ছাড়া আর কেউ নেই, যিনি তাদেরকে আগলে রেখেছেন। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস দেখাশোনা করে থাকেন। এই দয়াময় ছাড়া আর কে লশকর হয়ে তোমাদের সাহায্য করেন? কিন্তু কাফেরগণ ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে। আল্লাহ যদি তোমাদের জীবিকা বন্ধ করে দেন, তবে আর কে তোমাদের জীবিকা দিতে পারে? কিন্তু কাফেরগণ বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার ওপর অটল হয়ে আছে।"

এ থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য বন্দেগীতে মানুষ যেমন অন্যান্য বস্তুনিচয়ের সঙ্গে সমান অধিকারসম্পন্ন, তেমনি এর পুরস্কার ও প্রতিফলের ব্যাপারেও তাকে তাদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। পুরস্কারের ধরনে যা কিছু পার্থক্য রয়েছে, তা মূলত যোগ্যতা ও প্রয়োজনের পার্থক্যের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ধরন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিগূঢ় সত্যের প্রতি আলোকপাত করলেই জানা যাবে যে, একটি বৃক্ষ, একটি পশু, একটি পক্ষী এবং একটি খড়কুটোর প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারে যেমন দেখাশোনা, রক্ষণা-বেক্ষণ, সাহায্য-সহায়তা ও জীবিকা সরবরাহ করছেন, তেমনি মানুষের প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুসারেও তাকে পুরস্কার দান করে থাকেন। এ-ব্যাপারে অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকলে তা শুধু পুরস্কারের ধরনের দিক থেকেই, তার যথার্থের দিক থেকে নয়। আর পুরস্কারের ধরনের অবস্থা হলো এই যে, তা প্রতিটি জিনিসের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। একটি মহিষকে যে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, তার প্রকৃতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক তেমনি ধরনের পুরস্কারেরই সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্য যে সব ধরনকে আমরা উত্তম বলে মনে করি, তা তার পক্ষে পুরস্কার নয়, বরং শাস্তিতুল্য বিবেচিত হবে। একজন উঁচুদরের অনুগৃহীত ব্যক্তি কুসুম-শয্যায় শুয়ে যে-সুখানুভব করে, একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পাখী তার খড়কুটোর বাসায় বসে ঠিক সেই সুখই অনুভব করে। খড়কুটোর বাসার মুকাবিলায় কুসুম-শয্যা লাখোবার গর্বানুভব করতে পারে; কিন্তু বাসার মালিকের যোগ্যতা অনুসারেই তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এদিকে থেকে উভয়ের প্রতি খোদার অনুগ্রহ সমান। অনুরূপভাবে মুমিন ও মুশরিক, কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞের ব্যাপারেও এই নিয়ম সমান ক্রিয়াশীল। যারা খোদাকে অবিশ্বাস করে এবং তাঁর পূজা-অর্চনা করে না, যারা স্রষ্টার সঙ্গে তার সৃষ্টিকেও শরীক করে, যারা বৃক্ষ ও প্রস্তরকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে, তাদের প্রতিও জীবন-জীবিকা, বাঁচার-অধিকার, তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের অনুগ্রহ ঠিক খাঁটি তওহীদ ও খোদা-বিশ্বাসীর মতোই বর্ষিত হয়ে থাকে, বরং প্রাকৃতিক বিধানের (Law of Nature) অনুবৃত্তি, অন্যকথায় 'প্রাকৃতিক ইবাদতের' বেলায় যদি কাফের মুমিনের চাইতে অগ্রবর্তী হয়, তবে সেই ইবাদতের প্রতিফলও কাফেরকে মুমিনের চাইতে উত্তমরূপে দেয়া হয়--প্রকৃত সত্যের দৃষ্টিতে তা যতোই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন।

উপাসনার প্রেরণা কেন জাগে

এবার খুব সহজেই এ-প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় যে, মানুষের মধ্যে ইবাদত বা উপাসনার প্রেরণা কেন স্বাভাবিকভাবে জাগে এবং তা কেন উপাস্যকে তালাশ করে বেড়ায়। নিখিল বিশ্ব এবং তার প্রতিটি বস্তুই যখন এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের বন্দেগী করছে, যখন মানব দেহের প্রতিটি পশমও তার ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে, মানব-দেহের তাবৎ মৌলিক উপাদান তাঁর সামনে সিজদারত রয়েছে, তাঁর বিধান অনুসারেই সেই উপাদানগুলোর মানব-দেহে একীভূত হয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁর গোলামীর উপরই মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, তখন ইবাদত ও বন্দেগী স্বভাবতই মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। যে মহারাজের সে গোলাম, তাকে যদিও সে দেখতে পায় না এবং জাগতিক রাষ্ট্রের ন্যায় খোদায়ী রাজ্যের দূত ও কর্মচারিগণও তার দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু গোলাম হিসেবেই যেহেতু তার জন্ম হয়েছে এবং বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি মুহূর্তই গোলামী করে চলছে এবং তার মালিকের রাজত্ব চারিদিক থেকে—ভিতর ও বাহির উভয় থেকেই—তাকে এবং আশপাশের তামাম বস্তুনিচয়কে আকড়ে ধরে রেখেছে, এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বিনয়, প্রার্থনা, আরাধনা ও উপাসনার এক প্রগাঢ় ভাবধারার সৃষ্টি হয় এবং তার অন্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন উপাস্যের সন্ধান করতে থাকে—যাতে করে সে তাঁর স্তব-স্তুতি করতে পারে, তাঁর মহিমা কীর্তন করতে পারে, তাঁর সামনে নিজের গোলামী ও ভক্তি-উপহার পেশ করতে পারে, তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনকালে সাহায্য কামনা করতে পারে এবং বিপদাপদে তাঁর শরণার্থী হতে পারে। এই স্বভাব-প্রকৃতি সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষকে উপাস্যের সন্ধানে বাধ্য করেছে। এই প্রেরণার ফলেই সে হামেশা উপাসনার কোন না কোন রূপ গ্রহণ করে এসেছে আর এই উপাদান থেকেই দুনিয়ায় ধর্মের উদ্ভব হয়েছে।

উপাস্যের সন্ধানে প্রকৃতির পথনির্দেশ

কিন্তু ওপরেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃতি প্রতিটি ব্যাপারে মানুষের মধ্যে শুধু একটি কামনা, একটি সহজ আকাংখা এবং নিছক একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করেই তাকে ছেড়ে দেয়, যাতে করে নিজের ঈপ্সিত বস্তুকে সে খুঁজে নিতে পারে। অন্যকথায় বলা যায়, প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। এক অজানা জিনিসের কামনায় তাকে উদ্বুদ্ধ করেই সে পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দেয়, যাতে করে মানুষ তার বিচার-বুদ্ধির ওপর নির্ভর

করে এবং নিজের ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রয়োগ করে জানতে পারে যে, তার অন্তরে যে জিনিসটির আগ্রহ জন্মেছে, তার প্রকৃতি যে জিনিসটি কামনা করছে, সেটি কী জিনিস, তা কোথায় রয়েছে এবং কিভাবে তা অর্জন করা যেতে পারে। এইখানে পৌঁছেই মানুষের সামনে নানারূপ সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং সে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তা-শক্তি ও বিচার-ক্ষমতা এবং আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা মুতাবেক সেইসব বিভিন্ন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে, যা আজকে আমরা মানব জাতির সমাজ ও তমুদ্দুনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। একথা নিঃসন্দেহ যে, এই সন্ধান-অন্বেষণ এবং গ্রহণ ও নির্বাচনে প্রকৃতি কখনো মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করে না। কিন্তু সে যেমন প্রতি পদক্ষেপে জীবজন্তুকে পথনির্দেশ করে, মানুষকে তেমনি পথ প্রদর্শন করে না। মানুষকে সে নেহাতই সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পথ দেখায়, অত্যন্ত ক্ষীণ আলো প্রদর্শন করে, যা মামুলি বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা খুঁজে বের করতে পারে না। এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, মানুষের বিচার -ক্ষমতা নির্ভুল পথের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রবৃত্তির তাড়না তাকে ভ্রান্ত পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়; খাদ্যের আকাংখা সৃষ্টির পেছনে প্রকৃতির লক্ষ্য ছিলো এই যে, মানুষ তার দেহকে এমন উপাদান সরবরাহ করবে, যা দ্বারা সে বেঁচে থাকতে পারে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলো পূর্ণতা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই 'বাঁচার জন্যে খাওয়া'র তাৎপর্যটি অনেক লোকই বুঝতে পারেনি। খাদ্যের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে প্রকৃতি তার কর্মধারা ও মানসিকতায় যে রসানুভূতির সঞ্চার করেছিলো, তাকেই সে জীবনের আসল লক্ষ্য ভেবে বসেছে আর প্রবৃত্তির তাড়না তাকে 'খাবার জন্যেই বাঁচা'র ভ্রান্ত ধারণায় নিক্ষেপ করে প্রকৃতির আসল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে পোশাক ও গৃহের কামনা মূলত শীততাপ থেকে দেহকে নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিলো; কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না তাকে বিস্ময়, অহঙ্কার ও জাঁকজমক প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত করেছে আর মানুষ প্রকৃতির অভিপ্রায়কে অগ্রাহ্য করে নানারূপ মূল্যবান পরিচ্ছদ ও গগণচুম্বী প্রাসাদ তৈরীতে লিপ্ত হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত তার নিজের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। এভাবে যেসব নৈসর্গিক প্রেরণা মানুষের মধ্যে নানারূপ জিনিসের জন্যে আকাংখার সৃষ্টি করেছে, তার সবারই এক

অবস্থা হয়েছে। মানুষ প্রকৃতির অভিপ্রায়কে না বুঝে এবং কখনো কখনো বুঝা সত্ত্বেও তাকে অগ্রাহ্য করে নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই আকাংখা পূরণ করার জন্যে এমন সব বিচিত্র ধরন ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে, যা প্রকৃতির মূল লক্ষ্যের চাইতে বেশী এবং অনেক ক্ষেত্রের তার বিপরীত ছিলো। পরন্তু এই জিনিস-গুলোই তাহজীব-তমুদ্দুন, রসম-রেওয়াজ ও রীতিনীতির রূপ ধারণ করে পূর্বগামীদের থেকে পশ্চাদগামী লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছে, যার বাঁধন পরবর্তী মানব জাতিকে এমনি আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে যে, প্রকৃতির নির্দেশ বুঝা তো দূরের কথা, তাদের পক্ষে নিজস্ব বিচার-ক্ষমতা প্রয়োগ করার স্বাধীনতাও আর রইলোনা; বরং পূর্বপুরুষদের অনুসৃত রীতি পবিত্র আইনের মর্যাদা নিয়ে তাদেরকে একেবারে অন্ধ তকলিদের পথে ঠেলে দিলো। অথচ প্রকৃতি পূর্বে যেরূপ মানুষকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ও প্রচ্ছন্ন নির্দেশ দান করতো, তেমনি আজো দান করছে এবং হামেশা দান করতে থাকবে। সুস্থ বিচারবুদ্ধি কিছুটা চেষ্টা করলে সর্বদাই এটা বুঝতে পারে।

উপাস্যের দিকে প্রকৃতির ইঙ্গিত

উপাস্য সন্ধানের স্বাভাবিক আকাংখার সাথেও কতকটা এ ধরনের ব্যবহারই করা হয়েছে। মানুষ যখন উপাসনার প্রেরণায় অস্থির হয়ে কোন উপাস্যের অন্বেষণ শুরু করলো, তখন প্রকৃতি সূক্ষ্ম ইশারায় তাকে প্রকৃত উপাস্যের সন্ধান বলে দিলো। সে বললো ঃ তোমার উপাস্য এমন এক শক্তি, যিনি তোমায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমার চাইতে উচ্চতর ক্ষমতাবান। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে তুমি দুর্বল। তিনি সকল বস্তুর ওপর কর্তৃত্বশালী এবং প্রত্যেক প্রাণীর জীবিকাদানকারী। তিনি আপন রূপ-সৌন্দর্য, শোভা-শ্রী ও মনোহারিত্বের কারণে তোমার সকল প্রকার স্তুতিবাদ ও প্রশংসা-বাক্যের উপযুক্ত। তাঁর জ্যোতিই সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে দীপ্তিমান করে। তাঁর রূপচ্ছটাই বিশ্বপ্রকৃতিকে এই যৌবন-শ্রী, সাজ-সজ্জা ও চিত্তহারী সৌন্দর্য দান করেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতাপ পানির তরঙ্গ, বাতাসের ঝাপটা, ভূমির কম্পন, পাহাড়ের উচ্চতা, বাঘের হিংস্রতা এবং সাপের ক্রুদ্ধ-তার মাঝে আপন তেজস্বিতা প্রকাশ করে। তাঁর পালন ক্ষমতা মায়ের বুকে স্নেহ ও ভালবাসা হয়ে, গাভীর স্তনের দুগ্ধরূপে এবং পাথরের বুকে পানি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এমনি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত প্রত্যেক যুগে বিভিন্নরূপ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোককে দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য ও

যোগ্যতা অনুযায়ী সেই ইঙ্গিত বলে এই গুপ্ত রহস্যটি উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে। আদিতে মানুষ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় (State of Nature) ছিলো, তখন এই ইঙ্গিতগুলোকে সে স্পষ্টত বুঝতে পারতো এবং এই ইঙ্গিত থেকে যে উপাস্যের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো, কেবল তাঁর সামনেই সে আনুগত্যের মস্তক নত করতো। কিন্তু যখনি সে এই অবস্থা থেকে সামনে এগিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তার পথে অগ্রসর হলো, তখনি তার হয়রানির সূত্রপাত হলো।

মানুষের হয়রানি

কেউ এ ধরনের গুণবিশিষ্ট উপাস্য পৃথিবীর বুকে তালাশ করলো এবং নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা এবং উপকারী ও অপকারী জীব-জন্তুর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লো। এ উদ্দেশ্যে সে যৌনাঙ্গের (Sexual Organs) অর্চনা শুরু করলো। আগুনের সামনে ধ্যান মগ্ন হয়ে বসলো। বাতাসের সামনে মাথা নত করলো। 'ধরিত্রী মাতা'র উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন শুরু করলো। মোটকথা, তার দৃষ্টি আশ-পাশের দৃশ্যাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো। কারো দৃষ্টি এ থেকে আরো কিছুটা অগ্রসর হলো। সে এইসব দুনিয়াবী উপাস্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে দেখতে পেলো, এই জিনিসগুলো তো তারই মতো অন্যের গোলামীতে লিপ্ত, নিজের স্থিতি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও অপরের মুখাপেক্ষী। এদের কাছে এমন কী জিনিস রয়েছে, যার জন্যে আমরা সাহায্যের হাত প্রসারিত করবো এবং শ্রদ্ধায় মাথা নত করবো? অবশেষে সে পৃথিবী ছেড়ে আসমানে উপাস্যের সন্ধান করলো। সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি সে দৃষ্টিক্ষেপ করলো। নক্ষত্ররাজির ঝিকিমিকি দেখে মুগ্ধ হলো এবং তাদেরকেই তার আরাধনার উপযুক্ত বলে ভেবে বসলো।

কিন্তু যার দৃষ্টি এর চাইতেও বেশী প্রসারিত ছিলো, সে এই সব আসমানী জিনিসের মধ্যে দুনিয়াবী জিনিসের চাইতে বেশী কিছু পার্থক্য দেখতে পেলো না। সে বললোঃ এগুলো অনেক উচ্চতর ও উন্নততর ঠিক, প্রদীপ্ত ও দীপ্তিমান ঠিক, কিন্তু নিজস্ব ক্ষমতা বলে একা কি করতে পারে? একটি নির্দিষ্ট বিধান, একটি ধরা-বাঁধা নিয়ম অনুসারে এরা আবর্তিত হচ্ছে। সূর্যের এতো শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবার কিংবা নিজের জায়গা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্যুত হবার ক্ষমতা অর্জন করেনি। চন্দ্রের আজও অর্ধ চন্দ্র হবার দিনে পূর্ণশশীরূপে

আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতা হয়নি। এমনিভাবে অপর গ্রহ-উপগ্রহও তার নির্ধারিত আবর্তন ধারা থেকে এক চুল পরিমাণও দূরে সরতে পারেনি। এই দাসত্ব, অক্ষমতা ও সুস্পষ্ট গোলামীকে প্রত্যক্ষ করে উক্ত উপাস্য সন্ধানী আসমান থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিলো। তামাম বস্তুবাদী ও দেহধারী জিনিসকেই সে পূজার অযোগ্য ঘোষণা করলো এবং উপাস্যের সন্ধানের বিমূর্ত কল্পনা (Abstract Ideas) ও অধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হলো। সে জ্যোতির প্রতি অনুরক্ত হলো। সম্পদ দেবীর প্রতি আসক্ত হলো। প্রেম দেবতার প্রতি অনুরক্ত হলো। সৌন্দর্য-দেবীর প্রতি সংসক্ত হলো। শক্তি-দেবতাকে সিজদা করলো। বিশ্ব-চালকের (World Forces) মূর্তি নির্মাণ করে তাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হলো। আত্মা, যুক্তি (Logos) এবং ফেরেশতাদেরকে সিযদার পাত্রে পরিণত করলো এবং তাদেরকেই একমাত্র উপাসনার উপযোগী ভেবে বস্লো।

এভাবে বিভিন্নরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা বিশ্বলোকের যে জিনিসের মধ্যেই নিজ নিজ চিন্তার পরিধি ও দৃষ্টিশক্তি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব, দানশীলতা শক্তিমত্তা, রূপ-সৌন্দর্য, তেজ-বীর্য ও সৃজনশীলতার ঝলকানি দেখতে পেয়েছে, তার সামনেই মাথা নত করে দিয়েছে। তারা প্রকৃতির দেয়া অনুসন্ধিৎসা বলে যতোদূর যেতে পেরেছে, গিয়েছে এবং তারপর থেমে গিয়েছে। কিন্তু যারা অধিকতর নির্ভুল অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসা ও সুস্থ বিচার-বুদ্ধির অধিকারী ছিলো এবং প্রকৃতির নির্দেশিত পথচিহ্ন ধরে সঠিকভাবে এগিয়ে চলছিলো, তারা এসব জাগতিক ও আসমানী উপাস্য এবং আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক দেবতাদের মধ্যে কারো দ্বারাই সন্তুষ্ট হতে পারলো না। এ কারণে তারা মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোর কোথাও বিরত হলো না, বরং সামনে এগোতে-এগোতে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে তারা বিশ্বলোকের তামাম বস্তুতান্ত্রিক, আধ্যাত্মিক, মানসিক, জাগতিক ও আসমানী শক্তি-গুলোকেই অন্য কারো বন্ধনে আবদ্ধ, অন্য কারো বন্দেগীতে মশগুল, অন্য কারো সামনে অবনত এবং অন্য কারো তসবীহ্ পাঠে রত দেখতে পেলো। এখানে পৌঁছে তারা নিজেদের হৃদয়-কর্ণে এই ধ্বনি শুনতে পেলোঃ

لا الـه الا انا فاعبدون - (انبياء - ٢) —"আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমারই বন্দেগী করো।"

বস্তুত যে উপাস্যের সন্ধানে তারা ছুটে চলছিলো, এ ছিলো তারই আওয়াজ। এবার প্রেমিককে কাছে পেয়ে প্রেমাস্পদ নিজেই মুখর হয়ে উঠলো। সে নিজেই নিজের সন্ধান জানিয়ে দিলো। তাই এখানে পৌঁছেই সন্ধানীদের পরিক্রমণ শেষ হয়ে গেলো। নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পেরে তারা সম্পূর্ণ পরিতুষ্ট হয়ে গেলো।[১] এ-এক অনস্বীকার্য সত্য যে, এই সব শেষ পথনির্দেশ পাবার পর আর কেউ অধিকতর সন্ধান ও অন্বেষার জন্যে অস্থির হয়নি। অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, অশান্তি যা কিছুই ছিলো, মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোতে ছিলো। কিন্তু এই সর্বশেষ পর্যায়ে পৌঁছে প্রতিটি অন্তরই সাক্ষ্য দিলো যে, যাকে খোঁজা হচ্ছিলো, সে হচ্ছে এই। এখন আর কোন সন্ধান ও অন্বেষার প্রয়োজন নেই।

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

মানুষ তার উপাস্যের সন্ধানে যতোদিন খোদার কাছে পৌঁছতে পারেনি, ততোদিন সে অস্থির ও অশান্ত ছিলো। তার অন্তরে সন্ধানের অপূর্ণতা এবং অন্বেষার অস্বস্তি অবিরাম খোঁচাখুঁচি করছিলো। কিন্তু যখনি সে এক ও অনন্য খোদার সন্ধান পেলো, তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে গেলো। আর কখনো সে উপাস্যের সন্ধানজনিত অস্থিরতা অনুভব করেনি।

এক খোদাই হচ্ছেন প্রকৃত উপাস্য

এখন প্রশ্ন এই যে, এরূপ কেন হলো? কি কারণে উপাস্য-সন্ধানের এই পরিক্রমণ খোদা ছাড়া অন্য কারো পর্যন্ত গিয়ে শেষ হলো না এবং খোদা পর্যন্ত পৌঁছে এমনিভাবে শেষ হলো যে, অন্তরে আর কারো অন্বেষণ স্পৃহাই

---

(১) অধুনা ধর্ম-বিষয়ক লেখকদের প্রবণতা বেশির ভাগ ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের দিকে নিবদ্ধ। তাঁরা বলেন যে, মানুষ কতকগুলো তুচ্ছ ধরনের শের্ক থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো। তারপর চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যদের মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি তাদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়ে চলেছে; এমনকি উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে মানুষ তওহীদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু ইতিহাস নিজেই এই ঐতিহাসিক মতবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। হযরত ঈসা (আঃ) থেকে আড়াই হাজার বছর আগে হযরত ইবরাহীম (আঃ) খালেছ তাওহীদের পূজারী ছিলেন। আর ঈসা (আঃ) থেকে দু' হাজার বছর পর আজো মানব-সমাজে কোটি কোটি শের্কের পূজারী রয়েছে। এটা কি ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রমাণ? ব্যাপার এই যে, তুচ্ছতম শের্ক থেকে নিয়ে উচ্চতম তওহীদ পর্যন্ত ইবাদত ও ধর্মবিশ্বাসের সকল প্রকরণ প্রত্যেক যুগেই পাওয়া গিয়াছে এবং আজ পর্যন্তও পাওয়া যায়। পার্থক্য হচ্ছে আসলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে, ঐতিহাসিক পরম্পরার মধ্যে নয়।

জাগ্রত হলো না? একটু তলিয়ে চিন্তা করলে এর একটিমাত্র কারণই আমাদের বোধগম্য হবে। আর তা হলো এই যে, যে-স্বাভাবিক প্রেরণা মানুষকে উপাসনার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, এক ও অনন্য খোদার উপাসনাই হচ্ছে তার আসল লক্ষ্য। এই প্রকৃত উপাস্য অবধি না পৌঁছা পর্যন্ত সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয় না, হতে পারে না। অবশ্য বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ ও হঠকারিতা কিংবা পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের ফলে অনেক লোক এই অশান্তি অনুভব করতে পারে না, এটা স্বতন্ত্র কথা।

উপরে যেমন বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে উপাসনার স্বাভাবিক প্রেরণা সৃষ্টির কারণই হচ্ছে এই যে, তার চারদিকের বিশ্ব প্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণুই খোদার বন্দেগীতে মশগুল। এমনিতরো অবস্থায় একজন অবিবেচক ও আত্মপীড়ক লোক যখন খোদা সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত অ-খোদার (গায়রুল্লাহ্‌র) উপাসনার জন্যে অবনত হয়, তখন তার চারিদিকের কোন পদার্থ---এমন কি, তার নিজ দেহেরও কোন অংশ তার সহযোগিতা করে না। যে পা দিয়ে সে নিজের মন-গড়া উপাস্যের দিকে অগ্রসর হয়, তা খোদার ইবাদতেই চালিত হয়। যে হাত দিয়ে তার সামনে নজর-নিয়াজ পেশ করা হয়, তা খোদার বন্দেগীতেই ক্রিয়াশীল হয়। যে ললাট দিয়ে তাকে সিজদা করা হয়, তা খোদার সিজদায়ই নত হয়ে থাকে। যে মুখ দিয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা হয়, তা খোদার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনেই মশগুল থাকে। এমতাবস্থায় এই গোটা পূজা-উপাসনা ও মিনতি প্রার্থনাই এক প্রকাণ্ড মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অপবাদ এবং এক সুস্পষ্ট জালিয়াতী হয়ে দাঁড়ায়, যার অসারতা সম্পর্কে বিশ্বলোকের প্রতিটি অণু-পরমাণু সাক্ষ্য দান করে। খোদা মানুষের প্রকৃতি পর্যন্ত এক সূক্ষ্ম ও অননুভূত আওয়াজে বারবার তাকে এই বলে সতর্ক করতে থাকে যে, এ তুমি কোন ধোঁকায় পড়েছো? তোমার কি বান্দার বন্দেগী, পূজারীর পূজা-অর্চনা এবং গোলামের আনুগত্য করতে লজ্জা করে না? أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ

উপাসনা ও গোলামীর একাত্মতা

উপাসনা মূলত গোলামীর শাখা মাত্র; সে তার প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী আপন মূলের সঙ্গেই থাকতে চায়। মানুষ যখন স্বীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতার

কারণে শাখাকে মূল থেকে পৃথক করে ফেলে—গোলামী করে একজনের আর উপাসনা করে অন্যজনের—তখন এই পার্থক্য একেবারে প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে যায় এবং তার অবচেতন মনে এক প্রচ্ছন্ন ও অননুভূত অতৃপ্তির সঞ্চার ঘটে। পক্ষান্তরে মাঝখান থেকে যখন নির্বুদ্ধিতার অন্তরাল অপসৃত হয়ে যায় আর মানুষ এই সত্যটি অবহিত হয় যে, স্রষ্টা, অধিপতি ও পালন-কর্তাই হচ্ছে উপাস্য---তখন গোলামী ও উপাসনা উভয়ই একীভূত হয়ে যায়, শাখা মূলের সঙ্গে মিলিত হয়, মেয়ে তার মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। আর এই মিলনের ফলে এমন আনন্দ, স্বাদ, মাধুর্য ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়, যা বিচ্ছেদ ও ছাড়াছাড়ির সময় একেবারে অনুপস্থিত ছিলো।

খোদায়ী খিলাফত ও প্রতিনিধিত্ব

গোলামী ও উপাসনার এহেন মিলনের ফলেই মানুষ অন্যান্য সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে এবং সে এমন এক উচ্চমর্যাদায় উন্নীত হয়, যাকে খোদা তাঁর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব বলে অভিহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার প্রতি আবার একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সেখানে বলা হয়েছে যে, খোদার গোলামী তো মানুষ স্বাভাবিকভাবে, বিনা ইচ্ছায় ও অভিপ্রায়ে, না জেনেশুনেও করছে; নির্বোধ পশু, অচেতন বৃক্ষ, নিষ্প্রাণ পাথর যেমন করছে, মানুষও ঠিক তেমনিভাবে করে যাচ্ছে। এদিক থেকে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। আর এ গোলামীর প্রতিদান অর্থাৎ বাঁচার অধিকার ও জীবিকা লাভ—এ ক্ষেত্রেও সে প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য সৃষ্টির চাইতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়; বরং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় মানুষকে যে বিচার-বুদ্ধি, বোধ-শক্তি, স্বাধীন ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তি দান করা হয়েছে, তাকে প্রয়োগ করে আপন মনিবকে—সে যার গোলাম সুষ্ঠুভাবে জানা এবং অচেতনভাবে যার গোলামী সে করে চলছে, সচেতনভাবেও তার ইবাদত ও উপাসনা করার মধ্যেই তার যা কিছু বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য নিহিত রয়েছে। সে যদি এ কাজ না করে এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান-শক্তির সাহায্যে আপন মালিকের পরিচিতি লাভ না করে, বরং নিজের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের পরিধির মধ্যে মালিককে ছেড়ে অন্যান্য শক্তির ইবাদত ও উপাসনা শুরু করে দেয়, তবে শ্রেষ্ঠত্ব তো দূরের কথা, সে পশুর চাইতেও নিকৃষ্টতর হয়ে যায়।

لهم قلوب لا يفقهون بها ز ولهم اعين لا يبصرون بها ز ولهم

اذان لا يسمعون بها ط اولئك كالانعام بل هم اضل ط اولئك هم الغفلون

(اعراف - ٢٢)

বস্তুত বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান-শক্তির মধ্যে কোনই শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য নেই। এটা শুধু শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার একটি অস্ত্রমাত্র। এই অস্ত্রটি মানুষকে এতটুকু যোগ্যতা দান করেছে যে, একে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সে অচেতন গোলামীর জৈবিক স্তর থেকে উন্নত করে সচেতন বন্দেগীর মানবিক স্তরে উপনীত হতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি এই অস্ত্র দ্বারা ভ্রান্ত কাজ করে এবং যে মনিবের সে গোলাম তাঁকে ছেড়ে এমন সব মনিবের বন্দেগী শুরু করে, প্রকৃতপক্ষে যাদের সে গোলাম নয়।[১] তবে সে পশুর স্তর থেকেও নীচে নেমে যায়। পশু দিকভ্রষ্ট নয়, কিন্তু মানুষ দিকভ্রষ্ট হয়ে যায়। পশু অবিশ্বাসী নয়, কিন্তু সে অবিশ্বাসী হয়ে যায়। পশু কাফের ও মুশরেক নয়, সে কাফের ও মুশরেক হয়ে যায়। পশুকে যে-স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছিলো, সেখানেই রয়ে গিয়েছে—আর জীব হিসেবে মানুষও সেখানেই রয়েছে। কিন্তু মানুষ হিসেবে তার যে উন্নতি করা উচিত ছিলো, তা সে করেনি; বরং উল্টো অবনতির দিকে চলে গিয়েছে। তরক্কীর জন্যে তাকে যে বুদ্ধির অস্ত্র দেয়া হয়েছিলো, তাকে সে মানবিক তরক্কীর জন্যে নয়, বরং জৈবিক উন্নতির জন্যে ব্যবহার করেছে। তাই সে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করলো, যাতে করে পশু যতোটা দূরবর্তী জিনিস দেখতে পারে, তার চাইতে বেশি দূরবর্তী জিনিস সে দেখতে পারে। সে রেডিও আবিষ্কার করলো, যাতে করে পশু যতোখানি দূরবর্তী আওয়াজ শুনতে পারে, তার চাইতে দূরের আওয়াজ সে শুনতে পারে। সে রেল ও মোটরগাড়ী তৈরী করলো, যাতে করে পশু যতোখানি পথ চলতে পারে, তার চাইতে বেশী সে চলতে পারে। সে উড়োজাহাজ তৈরী করলো, যাতে করে সে শূন্যলোকে বিচরণে পাখী-

(১) এই সকল উপাস্যের মধ্যে মানুষের প্রবৃত্তির লালসাও অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি খোদার গোলামী করে না, সে হয় মনগড়া মূর্তি বা কৃত্রিম উপাস্যের বন্দেগী করে নতুবা ফেরাউন তুল্য লোক কিংবা আপন প্রবৃত্তির গোলামী করে।

কুলকে হারিয়ে দিতে পারে। সে সমুদ্র জাহাজ তৈরী করলো, যাতে করে সে সন্তরণে মৎসকুলকে পরাজিত করতে পারে। সে যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করলো, যাতে করে সে লড়াই-যুদ্ধে পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। সে আমোদস্ফূর্তির উপকরণ সংগ্রহ করলো, যাতে করে সে পশুর চাইতে বেশী আনন্দময় জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু এই সব উন্নতি ও প্রগতি লাভ করা সত্ত্বেও তার মর্যাদা কি জৈবিক মর্যাদার চাইতে কিছুমাত্র উন্নত হয়েছে? বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান শক্তির সাহায্যে বস্তুজগতে সে যতো কিছু ভোগ-ব্যবহার করছে, তা সবই তো প্রাকৃতিক বিধানের অধীন---যে বিধান অনুযায়ী জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াই পশু জগত এক সীমাবদ্ধ পরিমাণে এমনি ভোগ ব্যবহারই করে থাকে। কাজেই এতো সেই অচেতন গোলামীরই মর্যাদা, যার মধ্যে পশু জগতও শামিল রয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে, পশু নিম্নস্তরের গোলামী করে নিম্নমানের জীবিকা পেয়েছে, আর মানুষ বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান-শক্তির সাহায্যে উচ্চমানের গোলামী করে উচ্চমানের জীবিকার উপযোগী হয়েছে। পশু তার আহার্য হিসেবে ঘাস পেয়েছে আর মানুষ রুটি-মাখন পেয়েছে। আবরণ হিসেবে পশু লোম ও পশম পেয়েছে আর মানুষ মিহি ও মোলায়েম কাপড় পেয়েছে। পশুকে বনের গুহায় আশ্রয় দেয়া হয়েছে আর মানুষকে সুদৃশ্য বাংলো এবং কুঠিতে স্থান দেয়া হয়েছে। পশুকে হেঁটে চলতে হচ্ছে আর মানুষকে মোটরগাড়ী সরবরাহ করা হয়েছে। এটা তার জৈবিক গোলামী ও অচেতন বন্দেগীর জন্যে যথেষ্ট পুরস্কার। কিন্তু তলিয়ে দেখা দরকার যে, তরক্কীর জন্যে তাকে যে অস্ত্র দেয়া হয়েছিলো, তার দ্বারা সে কি তরক্কী করেছে? উন্নতি বা তরক্কীর মানে তো ছিলো এই যে, জীব হিসেবে সে না বুঝে-শুনে যার গোলামী করছে, মানুষ হিসেবে বুঝে-শুনেও তারই গোলামী ও উপাসনা করা উচিত। জীব হিসেবে সে যার প্রাকৃতিক বিধানের (Natural Law) আনুগত্য করছে, মানুষ হিসেবে তারই নৈতিক বিধানের (Moral Law) অনুবৃত্তি করা উচিত। এমনি তরক্কী যদি সে লাভ করে, তবে নিঃসন্দেহে সে গোটা জীবজগত ও বস্তু জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। তাকে যে-খিলাফতের শক্তি ও যোগ্যতা দান করা হয়েছিলো, কার্যত সে তা অর্জন করবে এবং সে যেহেতু সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর চাইতে বেশী আপন স্রষ্টার গোলামী ও উপাসনা করবে, এই কারণে বিশ্বের তামাম সৃষ্টবস্তুর চাইতে বেশী পুরস্কারের উপযোগী হবে। কিন্তু সে

যদি এমনি তরক্কী অর্জন না করে বরং তরক্কীর উপাদানগুলোর অপব্যবহার করে উল্টো অবনতির নিম্নস্তরে নেমে যায়, তবে নিঃসন্দেহে সে অতি জঘন্য ও নিকৃষ্টতর জীবে পরিণত হবে—সে নিজস্ব নির্বুদ্ধিতার ফলে নিজেকে আজাবের উপযোগী করে তুলবে।[১] এই সত্যটিই সূরায়ে ত্বীনে বিবৃত করা হয়েছেঃ

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلين

الا الذين امنوا و عملوا الصلحات فلهم اجر غير ممنون—

(سوره طين)

"আমরা মানুষকে উৎকৃষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাকে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর অবস্থায় নামিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।"

এই সংক্ষিপ্ত কথাটি উপরিউক্ত বিস্তৃত আলোচনার দিকেই ইঙ্গিত করছে। এখানে 'উৎকৃষ্ট আকৃতি' বলতে মানুষকে উন্নতিকল্পে দুনিয়ার তামাম সৃষ্ট জীবের চাইতে অতিরিক্ত যে শক্তি ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে, তাকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু শুধু উৎকৃষ্ট আকৃতি লাভ করাটাই কার্যত কোন উন্নতি নয়। উন্নতি মূলত দু'টি জিনিসের ওপর নির্ভরশীলঃ প্রথমত এই শক্তি ও যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে আপন স্রষ্টার পরিচয় লাভ করা—এরই চরম পর্যায় হচ্ছে 'ঈমান' বা প্রত্যয়। দ্বিতীয়ত, স্রষ্টার নৈতিক বিধান (حكم شرعی) অনুযায়ী দুনিয়ার তাবৎ কাজ সম্পাদন করা, একেই 'সৎ কাজ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যে-ব্যক্তি এই দু'টি কাজ করেনি, সে তুচ্ছ জীবের চাইতেও নিকৃষ্টতর পর্যায়ে নেমে গিয়েছে। আর যে ব্যক্তি এমনি উন্নতি অর্জন করতে পেরেছে, সে অফুরন্ত পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এ পুরস্কার কখনো নিঃশেষিত হয় না; দুনিয়ার এই জীবন

(১) এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। এ ব্যাপারে অনেকে মারাত্মক ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছে। তারা খোদার প্রাকৃতিক বিধানের আনুগত্যকেই প্রকৃত ইবাদত মনে করে। তাদের মতে, যে ব্যক্তি বা দলই এই ইবাদত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে, সেই খোদার অনুগত ও সৎকর্মশীল লোক হিসেবে বিবেচিত এবং কোরআনে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিসমূহের উপযোগী হবে। অথচ মানুষের কাছে যে ইবাদত দাবি করা হয়েছে, তার মধ্যে শুধু প্রাকৃতিক বিধানের আনুগত্যই নয়, নৈতিক বিধানের আনুগত্যও শামিল রয়েছে।

থেকে পরকালীন জীবন পর্যন্ত এর ধারা সমানে অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে অচেতন গোলামীর বিনিময়ে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, তার ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন আর একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জীবিকা—ব্যস্ এটুকুই হচ্ছে পুরস্কার। পক্ষান্তরে সচেতন গোলামীর বিনিময়ে এমন সুখসম্পদ লাভ করা যায়, যা নির্দোষ ও অবিচ্ছেদ্য। এমন জীবিকা অর্জন করা যায়, যা বন্ধ হবার কোনোই আশংকা নেই।

ইবাদাত বা গোলামীর পূর্ণ অর্থ

এবার আমরা এমন স্থানে এসে পেঁৗছেছি, যেখানে ইবাদত শব্দটির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ অর্থ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপরের আলোচনা থেকে জানা গিয়েছে যে, ইবাদত শব্দটির মর্মগত অংশ দুটি এবং এ-দু'য়ের সমন্বয়ের ফলেই ইবাদতের অর্থ পূর্ণত্ব লাভ করেঃ এক গোলামী, অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিধানের যথাযথ অনুবর্তন করা এবং তার বিরুদ্ধাচরণ না-করা। দ্বিতীয়ত উপাসনা; এর পরিপূর্ণতার জন্যে দু'টি জিনিসের প্রয়োজনঃ

(১) প্রকৃত উপাস্য (معبود) অর্থাৎ এক খোদার খালেছ ও নির্ভেজাল পরিচয় লাভ। সে পরিচয়ে শের্কের চিহ্নমাত্র থাক্‌বেনা, কুফ্‌র ও অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ও সংশয়ের অণু পরিমাণ মিশ্রণ থাক্‌বেনা, খোদা ছাড়া আর কারো ভয়ের স্থান থাক্‌বেনা, আর কারো পুরস্কারের প্রত্যাশা থাকবেনা, কারো প্রতি ভরসা ও নির্ভরতা থাকবেনা, কারো প্রতি খোদায়ী ও সার্বভৌমত্ব আরোপিত হবেনা আর কাউকে উপকারী ও অপকারী মানা যাবে না, কারো সঙ্গে উপাসনা বা গোলামীর সম্পর্ক স্থাপন করা যাবেনা। এরূপ পরিচয়ের নামই হচ্ছে 'ঈমান'।

(২) জীবনের অচেতন দিকগুলোতে উক্ত উপাস্যের দেয়া প্রাকৃতিক বিধানের যেরূপ অনুবর্তন করা হয়, সচেতন দিকগুলোতে তাঁর নৈতিক বিধানের তেমনি আনুগত্য করা। এতে করে গোটা জীবন একই শাসক, একই কর্তৃত্ব এবং একই আইনের অনুবর্তী হয়ে একই রূপ ও একই আকৃতি লাভ করবে। এতে কোনো দিক থেকেই অসাম্য ও বৈসাদৃশ্যের স্থান থাকবে না। এরই নাম হচ্ছে 'সৎকর্ম' (عمل صالح)।

যে ব্যক্তি বলে যে, এই ইবাদত শুধু তসবীহ্, জায়নামাজ এবং খান্‌কাহ্ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, সে নিশ্চিতরূপে ভ্রান্তিতে লিপ্ত। ঈমানদার ও সৎকর্মশীল

ব্যক্তি যখন দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ে, বারো মাসে একমাস রোজা রাখে, বছরে একবার জাকাত দেয় এবং সারা জীবনে একবার মাত্র হজ্জ করে, কেবল তখনি সে ইবাদত করে না বরং তার গোটা জীবনই ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত হয়। সে যখন ব্যবসার ক্ষেত্রে হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালাল রুজির ওপর নির্ভর করে, তখন কি সে ইবাদত করে না? সে যখন লেনদেনের ব্যাপারে জুলুম, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা পরিহার করে ইনসাফ ও সততার সঙ্গে কাজ করে, তখন তা কি ইবাদত নয়? সে যখন খোদার বান্দাদের খেদমত এবং হকদারদের হক পৌঁছিয়ে দেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে, তখন কি তার প্রতিটি ক্রিয়াকাণ্ডই ইবাদত হয় না? সে যখন নিজের কথা ও কাজে খোদার বিধানের অনুবর্তন করে এবং তার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলে, তখন কি তার প্রতিটি কথা ও কাজ ইবাদত বলে গণ্য হবে না? কাজেই প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর বিধানের অনুবর্তন এবং তার শরীয়তের অনুসরণে মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ার যে কাজই সম্পাদন করে, তা-ই হচ্ছে ইবাদত। এমন কি, হাট-বাজারে তার কেনাবেচা, আপন পরিবার-পরিজনের মধ্যে বসবাস করা এবং খালেছ পার্থিব কাজে তার ব্যস্ততাও হচ্ছে ইবাদত।

কিন্তু এ হচ্ছে তুচ্ছ পর্যায়ের ইবাদত। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে—যেমন কোন রাজ্যের প্রজাসাধারণ রাজার আইনের অনুবর্তন এবং তার ফরমানের আনুগত্য করছে। এর চাইতে উঁচু মানের ইবাদত হলো : মানুষ তার মনিবের গোলামী বরণ করবে, তার আইন-কানুন শুধু নিজেই মেনে চলবে না, বরং অন্যান্য লোকের ওপরও তা প্রবর্তনের চেষ্টা করবে। তার বিধিনিষেধ শুধু নিজেই পালন করবে না, বরং দুনিয়ায় তার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যেও সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তার রাজত্বে শুধু নিজেই শান্তি-শৃংখলা, আনুগত্য ও বাধ্যতার সঙ্গে বসবাস করবে না, বরং নিজের মন, মস্তিষ্ক ও কর্মশক্তিকে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, বিকৃত প্রজাদের সংশোধন এবং বিদ্রোহী ও অবাধ্য লোকদের দমন করার জন্যেও নিয়োজিত করবে। এমন কি এ কাজে নিজের ধনমাল ও মনপ্রাণ উৎসর্গ করে দেবে।

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا ط (بقره - ١٨)

'এভাবে আমরা তোমাদেরকে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে উত্তম জাতি বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা লোকদের প্রতি 'সাক্ষী[১] হও এবং রসূলও তোমাদের প্রতি সাক্ষী হন।'

هو سمكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا

عليكم و تكونوا شهداء على الناس صلے فاقيموا الصلوة و اتوا الزكوة

و اعتصموا بالله ط (الحج - ٧٨)

'তিনি পূর্বেও তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছিলেন এবং এই কিতাবেও তা রেখেছেন, যাতে করে রসূল তোমাদের প্রতি সাক্ষী হন আর তোমরা লোকদের প্রতি সাক্ষী হও ; কাজেই তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত দান করো, এবং আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকো।'

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة

و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ط (الحج - ٤١)

'আমরা যাদেরকে দুনিয়ায় কর্তৃত্ব দান করবো, তারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত দান করবে, সুকৃতির আদেশ দেবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।'

যে-ইবাদাত সম্পর্কে মানুষ ধারণা করে নিয়েছে যে, তা' শুধু নামাজ-রোজা ও তসবিহ্-তাহ্‌লিলের সমষ্টি এবং পার্থিব বিষয়াদির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, এই হচ্ছে তার তাৎপর্য। প্রকৃতপক্ষে নামাজ-রোজা, হজ্জ-জাকাত ও তস্‌বিহ-তাহ্‌লিল হচ্ছে মানুষকে এক বৃহৎ ইবাদতের জন্যে

(১) অর্থাৎ নিজের জবান, আচরণ, চরিত্র ও চালচলন দ্বারা এবং নিজের কোরবানী, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সহিষ্ণুতার দ্বারা ইসলামের সত্যতার সাক্ষী হও। একদিকে গোটা দুনিয়ার সামনে কথা ও কাজের দ্বারা ইসলামের বাস্তব রূপ প্রদর্শন করো, অন্যদিকে ইসলামের পথে জানপ্রাণ উৎসর্গ করে প্রমাণ করো যে, এই দ্বীনের প্রতি তোমরা যথার্থই ঈমান এনেছো এবং তোমাদের কাছে এটি এমন সত্য যে, এর জন্যে জানপ্রাণ ও ধনমাল সবকিছু উৎসর্গ করা চলে।

যোগ্য করে তোলার নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্স (Training Course) মাত্র। সে ইবাদত মানব-জীবনকে জৈব জীবনের তুচ্ছ পর্যায় থেকে মানবীয় জীবনের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে। তাকে অচেতন ও সচেতন উভয় ক্ষেত্রে আপন মালিকের অনুগত আজ্ঞাবহ বান্দায় পরিণত করে। তাকে প্রকৃত বাদশাহর সাম্রাজ্যের ভেতর এমন একজন কর্মচারী বানিয়ে দেয় যে, নিজের ধন-প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে তার খেদমত করতে থাকে। মানুষ যখন ইবাদতের সাহায্যে এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন সে এমন মর্যাদা লাভ করে যে, বিশ্বের কোনো সৃষ্টিই তার সমকক্ষতার দাবী করতে পারেনা, ফিরেশ্‌তারা পর্যন্ত তার মর্যাদা থেকে নিম্নে পড়ে থাকে। সে কার্যত দুনিয়ায় খোদার খলীফা বনে যায়। তাকে খোদা ছাড়া আর কারো সামনে হাত পাতার লাঞ্ছনা দেয়া হয় না। তার গলায় খোদার গোলামী ছাড়া আর কারো গোলামীর বেড়ি থাকে না। তার পায়ে খোদার শৃঙ্খল ছাড়া আর কারো শৃঙ্খল থাকে না। তার মাথা খোদার নির্দেশ ছাড়া আর কারো নির্দেশের সামনে অবনত হয় না। সে হয় খোদার গোলাম এবং সকলের মনিব। সে হয় খোদার শাসিত এবং শাসক। সে খোদার তরফ থেকেই এ-দুনিয়ায় কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে। সে ফেরাউন ও নমরুদের মতো বিদ্রোহী ও জবরদখলকারী হয় না, বরং শাহী ফরমান বলে দুনিয়ায় খোদার প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং সততার সঙ্গে কর্তৃত্ব চালিয়ে যায়।

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في
الارض كما استخلف الذين من قبلهم ص وليمكنن لهم دينهم
الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ط يعبدوننى
لا يشركون بى شيئا ط (النور -٥٥)

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াদা করছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়ার খিলাফত (কর্তৃত্ব)

দান করা হবে, যেমন করে তাদের পূর্বেকার লোকদের দেয়া হয়েছিলো। আর তাদের দ্বীনকে---যাকে তারা নিজেদের জন্যে পসন্দ করেছে—অবশ্যই দৃঢ়তার সঙ্গে কায়েম করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতিকে নিশ্চিতরূপে শান্তি ও নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। কাজেই তারা যেনো আমারই ইবাদত করে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরীক না করে।

এ-তো হচ্ছে দুনিয়ার পুরস্কার। আখেরাতের পুরস্কার কি? তা হলোঃ

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون ○

(النور - ٥٢)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করেছে, আল্লাহকে ভয় করেছে এবং তাঁর গযব থেকে বেঁচে রয়েছে, সে-ই হচ্ছে সফলকাম।'

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة

وايتاء الزكوة ص يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ۙ

ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ط (النور ٣٧-٣٨)

'যে-সব লোককে কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কেনাবেচা আল্লাহর স্মরণ, নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত দান থেকে গাফেল করে না—যারা সে দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর বিপর্যস্ত হবে এবং দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যাবে, তাদের প্রত্যাশা এই যে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের উত্তম প্রতিফল দান করবেন এবং নিজস্ব অনুগ্রহ বলে তাকে আরো বাড়িয়ে দেবেন।'

ইবাদাতের ভুল অর্থ

পরিতাপের বিষয় যে, ইবাদতের এই সঠিক ও প্রকৃত অর্থ মুসলমানরা ভুলে গিয়েছে। তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজের নাম ইবাদত রেখে দিয়েছে এবং মনে করেছে, ব্যস এই কয়টি কাজ সম্পাদন করাই হচ্ছে ইবাদত আর এগুলো সম্পাদন করেই ইবাদতের হক আদায় করা চলেঃ এই গুরুতর ভুল ধারণা সাধারণ ও অসাধারণ উভয় শ্রেণীর লোককেই ধোকার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাধারণ লোকেরা গোটা সময়ের মধ্যে কয়েকটি

মুহূর্ত খোদার ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে বাকী গোটা সময়টাকে তার থেকে মুক্ত করে নিয়েছে। তারা খোদায়ী আইনের প্রতিটি ধারার বিরুদ্ধাচরণ করে, খোদার নির্ধারিত প্রতিটি সীমা লংঘন করে, মিথ্যা কথা বলে, পরনিন্দা করে, ওয়াদা ভঙ্গ করে, হারাম মাল খায়, হকদারের হক মারে, দুর্বলের প্রতি জুলুম করে, প্রবৃত্তির গোলামীতে মন, চোখ, হাত, পা সবকিছুকে অবাধ্যতার জন্যে উৎসর্গ করে দেয়; কিন্তু দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়ে, মুখে-মুখে কোরআন তেলাওয়াত করে, বছরে একমাস রোজা রেখে, নিজের সম্পদ থেকে কিছুটা দান করে দিয়ে এবং একবার হজ্জ করে এসেই ভাবে যে, আমরা খোদার ইবাদতকারী বান্দাহ বনে গিয়েছি। এরই নাম কি খোদার ইবাদত? তাঁর সিজ্‌দা থেকে মাথা তুলেই তোমরা প্রত্যেক মিথ্যা উপাস্যের সামনে মাথা নত করো, তিনি ছাড়া প্রত্যেক জিন্দা ও মুর্দাকে প্রয়োজন পূরণকারী মনে করো, কারো মধ্যে উপকার ও অপকার করার বিন্দু পরিমাণও শক্তি দেখলে অমনি তাকে খোদা বানিয়ে নাও, এক টুক্‌রা রুটির জন্যে কাফের ও মুশরেকদের সামনে পর্যন্ত হাতজোড় করো, তাদের পদচুম্বন করো, তাদেরকে রিজিকদাতা মনে করো, তাদেরকে সম্মান ও অসম্মানের মালিক জ্ঞান করো, তারা শক্তিমান বিধায় তাদের আইনকে আইন মনে করো আর তোমাদের ভ্রান্ত মতে খোদা তাঁর আইন প্রবর্তন কর্‌তে সমর্থ নন্ বিধায় নিঃসঙ্কোচে তাঁর আইন লংঘন করো—এই কি তোমাদের ইসলাম? এই কি তোমাদের ঈমানের লক্ষণ? এর ভিত্তিতেই তোমাদের ধারণা যে, তোমরা খোদার ইবাদত করছো? এইটেই যদি ঈমান ও ইসলাম হয় আর এটাই খোদার ইবাদত হয়, তাহলে আর কোন্ জিনিসটা তোমাদেরকে দুনিয়ায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রেখেছে? কোন্ জিনিসটা তোমাদের দ্বারা খোদা ছাড়া অন্যের দাসত্ব করাচ্ছে? কোন্ জিনিসটা তোমাদের গলায় গোলামী ও অপমানের বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে?

অসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকেরা এর বিপরীত এক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছে। তারা তস্‌বীহ ও জায়নামাজ নিয়ে হুজরার কোণে বসে গিয়েছে। খোদার বান্দারা ভ্রষ্টতায় লিপ্ত রয়েছে, দুনিয়ায় জুলুম ও অনাচারের বিস্তৃতি ঘটছে, মিথ্যার অন্ধকার সত্যের দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, খোদার দুনিয়ায় অত্যাচারী ও বিদ্রোহীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, খোদার বান্দাদের দ্বারা খোদায়ী আইনের পরিবর্তে শয়তানী বন্দেগী করানো হচ্ছে আর

এঁরা নফলের পর নফল পড়ে চলছেন, তসবিহ দানা বারবার ঘুরাচ্ছেন, সরবে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' জিকির করছেন। এঁরা কোরআন পড়ছেন শুধু সওয়াবের জন্যে, হাদীস পড়ছেন কেবল বরকতের জন্যে, সীরাতুন্নবী ও সাহাবা চরিত সম্পর্কে ওয়াজ করছেন শুধু গল্প বলার আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে। তাঁরা কোরআন, হাদীস, সীরাতুন্নবী ও সাহাবা-চরিতে কল্যাণ পথে আহবান, সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ তথা আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে কোনো শিক্ষা খুঁজে পায়না। এটা কি ইবাদত? পাপের বন্যা লোকদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াবে আর তাঁরা চোখ বন্ধ করে মুরাকাবায় মশগুল থাকবেন—এইটে কি ইবাদত? গোমরাহীর সয়লাব লোকদের হুজরার প্রাচীরে এসে আঘাত হানবে আর তারা দরজা বন্ধ করে নফলের পর নফল পড়তে থাকবে—একে কি ইবাদত বলে? কাফেররা সারা দুনিয়াময় শয়তানী বিজয়ের ডঙ্কা বাজাতে থাকবে, দুনিয়ায় তাদেরই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হবে, তাদেরই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চলবে, তাদের আইন-কানুনই প্রবর্তিত হবে, তাদের তরবারিই বিজয়-গৌরব লাভ করবে, তাদের সামনেই খোদার বান্দারা নতশির হবে আর তোমরা খোদার জমিন ও খোদার সৃষ্টিকে তাদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে নামাজ-রোজা ও জিকির-শোগলের মধ্যে ডুবে থাকবে—এর নামই কি ইবাদত? তোমরা যা করছো এই যদি ইবাদত হয় আর খোদার ইবাদতের হক এভাবেই আদায় হয়, তাহলে তোমরা ইবাদত করা সত্ত্বেও দুনিয়ার নেতৃত্ব অন্যান্যরা পাচ্ছে—এর কারণ কি? খোদা তোমাদের সঙ্গে কোরআনে যে ওয়াদা করেছেন, তা (মায়াজ আল্লাহ) কি মিথ্যা?

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ص وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا ط يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ط (النور-٥٥)

যদি খোদার ওয়াদা সত্য হয় এবং এটাও বাস্তব ঘটনা হয় যে, তোমাদের এই ইবাদত সত্ত্বেও দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তোমাদের করায়ত্ত নয়, তোমাদের দ্বীনও প্রতিষ্ঠিত নয় আর তোমরা ভয়-ভীতির বদলে শান্তি ও নিরাপত্তাও লাভ না করে থাকো, তাহলে তোমাদের বুঝা উচিত যে, তোমরা এবং তোমাদের গোটা জাতি ইবাদতকারী নয়, বরং ইবাদত বর্জনকারী। আর এই ইবাদত বর্জনের কুফলই তোমাদেরকে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে রেখেছে।

আল্লাহর পথে জিহাদ

সাধারণত 'জিহাদ' শব্দটির অর্থ করা হয় Holy war বা 'ধর্মযুদ্ধ'; আর দীর্ঘকাল যাবত শব্দটির যে ধরনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তাতে এটি শুধু 'উম্মাদনা'রই সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকদের মানব-চোখে এক ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে ওঠে। সে দৃশ্যটি হচ্ছে : ধর্ম পাগলের একটি দল নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে, দাঁড়ি উর্ধ্বে তুলে, রক্তিম চোখে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসছে আর সামনে কাফের পাওয়া মাত্রই গ্রেফতার করে নিচ্ছে এবং তার ওপর তরবারি রেখে বলছে, "শীগগীর 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়, নতুবা এক্ষুণি তোর শিরচ্ছেদ করা হবে।" বস্তুত চতুর পণ্ডিতেরা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে আমাদের এহেন চিত্র অঙ্কিত করেছে এবং তার নীচে মোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছে—

'রক্তের গন্ধ আসে এ জাতির ইতিহাস থেকে।'

মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের এহেন চিত্র যে ভদ্রজনেরা অঙ্কিত করছেন, তারা নিজেরাই কয়েক শতক ধরে চরম 'অধর্মের যুদ্ধে' (Unholy War) লিপ্ত রয়েছেন। তাদের নিজেদের চিত্রই অতি ভয়াবহ। তারা ঐশ্বর্য ও কর্তৃত্বের লালসায় সব রকম অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বর্বর দস্যুর ন্যায় সারা দুনিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। চারদিকে ব্যবসায়ের বাজার, কাঁচামালের ভাণ্ডার, কলোনী স্থাপনের মতো ভূমি এবং খনিজ পদার্থের সন্ধান করে ফিরছে। তাদের লালসার আগুনকে অনির্বান করে রাখার জন্যে তারা শুধু ইন্ধন সংগ্রহ করে চলছে। তাদের এ সংগ্রাম খোদার পথে নয়, উদরের

(১) প্রবন্ধটি ১৯৩৯ সালের মে সংখ্যা তর্জুমানুল কোরআন পত্রিকা থেকে গৃহীত।—সম্পাদক

পথে—তাদের যুদ্ধ হচ্ছে প্রবৃত্তি ও লালসার পথে। তাদের দৃষ্টিতে কোনো দেশে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকা কিংবা কাঁচামাল উৎপন্ন হওয়াটাই সে দেশের জনগণকে আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। কিংবা তাদের নিজস্ব কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদি কোনো দেশে বিক্রি করার সম্ভাবনা থাক্‌লে অথবা তাদের জনসংখ্যা কোথাও পুনর্বাসন করা সম্ভবপর মনে হলেও সে দেশের অধিবাসীকে তারা নির্দ্বিধায় আক্রমণ করতে পারে। এমনি কি, আর কিছু না থাকলেও সে দেশটি তাদের অধিকৃত কিংবা তারা অধিকার কর্‌তে ইচ্ছুক এমন কোনো দেশের পথিমধ্যে অবস্থিত—এই অপরাধটিও তার অধিবাসীদের আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। বস্তুত আমরা যা' কিছু করেছি তা অতীতের কাহিনী মাত্র; কিন্তু এদের কীর্তিকলাপ তো সাম্প্রতিক ব্যাপার—দিনরাত বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইরান, আমেরিকা এককথায় দুনিয়ার কোনো অঞ্চলই এদের এই উদর-কেন্দ্রিক অধর্মের যুদ্ধ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু তবু এদের চাতুর্যের প্রশংসা করতে হয়। তারা আমাদের চিত্রকে এমনি ভয়াবহ ও বিকটাকারে অঙ্কিত করেছে যে, তাদের নিজস্ব চিত্রই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। অবশ্য আমাদের নির্বুদ্ধিতাও কম প্রশংসার্হ নয়! আমরা শত্রুদের হাতে অঙ্কিত নিজস্ব চিত্র দেখেই এমনি ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়লাম যে, তার পেছনে উঁকি মেরে খোদ চিত্রকরদের চেহারাটা দেখার চেতনা পর্যন্ত হারিয়ে ফেল্‌লাম। পরন্তু অনুশোচনার সুরে মিনতি জানাতে লাগলাম: 'হুজুর' আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাতের কি বুঝি। আমরা তো সন্ন্যাসী ও পাদ্রীদের ন্যায় শান্তিবাদী ধর্মপ্রচারক মাত্র। ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবাদ এবং তদস্থলে অপর কতিপয় ধর্মবিশ্বাস লোকদের দ্বারা মানিয়ে নেয়াই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কাজ। তরবারির সংগে আমাদের কি সম্পর্ক! অবশ্য কখনো-কখনো আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আক্রমণ করার অপরাধ আমরা করে ফেলেছি। কিন্তু এখন তার থেকেও আমরা তওবা করেছি। পরন্তু হুজুরের সান্ত্বনার জন্যে তরবারি যুদ্ধকে 'সরকারীভাবে' বাতিল পর্যন্ত করে দেয়া হয়েছে। এখন শুধু জবান ও কলম চালানারই নাম রাখা হয়েছে জিহাদ। গোলা-বারুদ ও কামান-বন্দুক ব্যবহার করা সরকারের কাজ আর আমাদের কাজ হচ্ছে শুধু জবান ও কলম চালনা করা।

জিহাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কারণ

এতো গেলো রাজনৈতিক চালবাজির কথা। কিন্তু যেসব কারণে' আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করা অমুসলিম' এমন কি মুসলমানদের পক্ষেও দুরূহ হয়ে পড়েছে, নিরেট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে তার দু'টি বিরাট ও মৌলিক ভ্রান্তির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রথম ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, ইস্‌লামকে নিছক একটি ধর্মমাত্র—ধর্ম শব্দের প্রচলিত অর্থানুসারে—মনে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ভ্রান্তি এই যে, মুসলমানদেরকে একটি জাতি হিসেবে—জাতি শব্দটির সাধারণ ব্যবহার অনুযায়ী—গণ্য করা হয়েছে।

এই দু'টি মৌলিক ভ্রান্তি শুধু জিহাদ প্রসঙ্গকেই নয়, বরং সমগ্রভাবে ইস্‌লামের গোটা চিত্রকেই বিকৃত করে দিয়েছে এবং মুসলমানদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে।

সাধারণ পরিভাষা অনুসারে ধর্ম শব্দের অর্থ কতিপয় আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-অনুষ্ঠানের সমষ্টি বৈ কিছুই নয়। এই অর্থানুযায়ী ধর্ম বাস্তবিকই একটি ব্যক্তিগত (Private) ব্যাপারই হওয়া উচিত। এই প্রেক্ষিতে যে-কোন আকীদা পোষণ করা, বিবেকের ইচ্ছানুযায়ী ইবাদত করা এবং নিজস্ব খেয়াল-খুশী অনুসারে উপাস্যকে ডাকার ব্যাপারে প্রতিটি মানুষের পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। আর সে-ধর্মের জন্যে বড়োজোর তার মনে কোনো আবেগ, উদ্দীপনা ও ভালোবাসা থাকলে দুনিয়াময় নিজ আকিদা-বিশ্বাস প্রচার করা এবং অন্যান্য আকিদা পোষণকারীদের সঙ্গে বিতর্ক ও মুনাজারায় লিপ্ত হবারও তার অধিকার রয়েছে। এর জন্যে তরবারী ধারণ করবার অবকাশটা কোথায়? লোকদেরকে কি মেরে-কেটে কোনো আকীদার প্রতি বিশ্বাস করে তোলা যায়? ইস্‌লামকে যখন সাধারণ পরিভাষা অনুসারে একটি 'ধর্ম' আখ্যা দেয়া হয়, তখন অনিবার্যভাবেই এ-প্রশ্নটি উত্থিত হয়। আর বাস্তবিক পক্ষে ইস্‌লামের এই মর্যাদা স্বীকৃত হলে জিহাদের পক্ষে আর কোনো সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না।

এভাবে 'জাতি' হচ্ছে সমপ্রকৃতির লোকদের একটি সমষ্টি (Homogeneous Group of Men)—যারা কতিপয় মৌল বিষয়ে একাত্ম হবার কারণে পরস্পর একত্রিত এবং অন্যান্য দলগুলো থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। এই অর্থে যারা একটি জাতির মর্যাদা লাভ করবে, তারা দু'টি কারণেই

তরবারি ধারণ করতে পারেঃ তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিনিয়ে নেবার জন্যে কেউ যখন তার ওপর হামলা করবে কিংবা অন্যের ন্যায়সঙ্গত অধি-কার হরণের জন্যে সে নিজেই যখন কারো উপর আক্রমণ চালাতে মনস্থ করবে। প্রথম অবস্থায় তরবারি উত্তোলনের কিছু না কিছু নৈতিক যৌক্তিকতা রয়েছে বটে, (অবশ্য কোনো-কোনো 'ধর্মাত্মার দৃষ্টিতে এটাও ঘোর অন্যায় ও অসঙ্গত) কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় তো একমাত্র ডিক্টেটর ছাড়া অপর কেউ তরবারি ধারণকে সঙ্গত বলতে পারে না। এমন কি বৃটেন ও ফ্রান্সের বিশাল সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনায়করা পর্যন্ত একে সঙ্গত বলার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

জিহাদের তাৎপর্য

কাজেই ইস্‌লাম একটি 'ধর্ম' এবং মুসলমান একটি 'জাতি' পদবাচ্য হলে জিহাদের সমস্ত তাৎপর্য ও ও যৌক্তিকতাই একেবারে খতম হয়ে যায় এবং এটি আর 'সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত'ও হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইস্‌লাম কোনো 'ধর্ম' এবং মুসলমান কোনো 'জাতির' নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে মুলত এক বিপ্লবী মতবাদ ও মতাদর্শের নাম। গোটা দুনিয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাকে (Social Order) পরিবর্তিত ক'রে নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে তাকে পুনর্গঠিত করাই হচ্ছে এর লক্ষ্য, আর মুসলমান হচ্ছে এক আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলের (International Revolutionary party) নাম—নিজের ইপ্সিত বিপ্লবী প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই ইসলাম একে সংগঠিত করেছে। আর এই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে গৃহীত বিপ্লবী চেষ্টাসাধনা (Revolutionary Struggle) ও চূড়ান্ত শক্তি-প্রয়োগেরই নাম হচ্ছে 'জিহাদ'।

বস্তুত তামাম বিপ্লবী মতাদর্শের ন্যায় ইসলামও সাধারণ প্রচলিত শব্দাবলী পরিহার করে নিজের জন্যে এক বিশেষ পরিভাষা (Terminology) গ্রহণ করেছে। এর ফলে ইসলামের বিপ্লবী মতাদর্শ সাধারণ মতবাদগুলো থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। 'জিহাদ' শব্দটিও এই বিশিষ্ট পরি-ভাষারই অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম 'যুদ্ধ' (War) অর্থবোধক অপর কোনো আরবী শব্দকে ইচ্ছাকৃতভাবেই বর্জন করেছে এবং তার পরিবর্ত্তে 'জিহাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছে। এটি হচ্ছে ইংরেজী Struggle (চূড়ান্ত প্রচেষ্টা) শব্দর সমার্থক, বরং এর চাইতেও গভীর অর্থ বহ। ইংরেজীতে এর সঠিক অর্থ

হিসেবে বলা যায়ঃ To exert one's utmost endeavour in furthering a cause—'কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা।'

এখন প্রশ্ন হলো এই যে, পুরোনো শব্দাবলী পরিহার করে এই নতুন শব্দটি কেন গ্রহণ করা হয়েছে? এর একমাত্র জবাব এই যে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থোদ্ধারের জন্যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যগুলো যেসব যুদ্ধ বিগ্রহ করেছে, তাকে বুঝাবার জন্যেই 'যুদ্ধ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো এবং আজো তাই হচ্ছে। এইসব যুদ্ধ-বিগ্রহের অর্থ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বার্থ-লাভ—এর মধ্যে কোনো মতাদর্শ বা রীতি-নীতির পক্ষ সমর্থনের আদৌ লক্ষ্য থাকে না। ইসলামের যুদ্ধ এই ধরনের নয় বলে এই শব্দটিকে সে একেবারেই বর্জন করেছে। এক জাতির স্বার্থোদ্ধার বা অন্য জাতির ক্ষতি সাধন তার মোটেই লক্ষ্য নয়। দুনিয়ায় কোন্ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব থাকবে—এ-ব্যাপারেও তার কোনো আগ্রহ নেই। তার একমাত্র আগ্রহ ও লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণ। এই কল্যাণ সাধনের জন্যে তার একটি বিশেষ মতবাদ এবং একটি বাস্তব মতাদর্শ রয়েছে। এই মতবাদ ও মতাদর্শের বিরুদ্ধে যেখানে যে-জিনিসেরই কর্তৃত্ব রয়েছে, ইসলাম তাকেই সমূলে বিনাশ করতে চায়। সে কর্তৃত্ব যে-জাতি বা যে-দেশের হোক, তার প্রতি সে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজস্ব মতবাদ ও মতাদর্শের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। কে তার পতাকা বহন করছে আর কা'র কর্তৃত্বের ওপর তার আঘাত পড়ছে, এ-ব্যাপারে সে কোনো তারতম্য করে না। সে পৃথিবী চায়—পৃথিবীর কোনো অংশ বিশেষ নয়, বরং গোটা পৃথিবীই তার কাম্য। কিন্তু এক বা একাধিক জাতির হাত থেকে দুনিয়ার কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে তা বিশেষ কোনো জাতির হাতে ন্যস্ত করাই তার লক্ষ্য নয়। বরং মানবতার কল্যাণের জন্যে তার কাছে যে মতাদর্শ ও কর্মসূচী রয়েছে, তার দ্বারা গোটা মানব জাতিকে উপকৃত করানোই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক এমন সমস্ত শক্তিকেই সে কাজে লাগাতে ইচ্ছুক। আর এই যাবতীয় শক্তি প্রয়োগের ব্যাপক নামই হচ্ছে 'জিহাদ'। মুখের ভাষা ও লেখনীর সাহায্যে লোকদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেয়া এবং তাদের মানসিক বিপ্লব সৃষ্টিকেও বলা হয় জিহাদ'। আবার তরবারির সাহায্যে প্রাচীন অত্যাচারমূলক জীবন ব্যবস্থাকে বদলে দেয়া এবং নয়া সুবিচারমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাও জিহাদ আর এই পথে ধনমাল ব্যয় করা এবং দৈহিক প্রচেষ্টা চালানোকেও বলা হয় জিহাদ।

আল্লাহর পথে হবার শর্ত

কিন্তু ইসলামের জিহাদ শুধু জিহাদ'ই নয়, বরং সে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে কথাটি এর অপরিহার্য শর্ত। এ-শব্দটিও ইসলামের বিশিষ্ট পরিভাষার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু আল্লাহর পথে কথাটি দ্বারা লোকেরা এক গুরুতর ভুল ধারণায় পড়ে গিয়েছে। তারা মনে করে নিয়েছে যে, জোরপূর্বক লোকদেরকে ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাসে দীক্ষিত করে তোলাই হচ্ছে 'আল্লাহর পথে জিহাদ'। কারণ লোকদের সংকীর্ণ মনে আল্লাহর পথে কথাটির এ ছাড়া আর কোনো অর্থই ঠাঁই পায়নি। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য যে কাজই করা হবে, তার লক্ষ্য যদি কর্মীদের বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার না হয়, বরং শুধু খোদার সন্তুষ্টি লাভই তার উদ্দেশ্য হয়, তবে এমন প্রতিটি কাজকেই ইসলাম আল্লাহর পথের কাজ বলে ঘোষণা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারেঃ দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্য যদি এই দুনিয়ায়ই কোনো বৈষয়িক ও নৈতিক স্বার্থলাভ হয় তবে তা আল্লাহর পথে দান হবে না। কিন্তু একজন গরীব লোককে সাহায্য করে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা যদি এর উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে দান বলে বিবেচিত হবে। কাজেই যে সব সৎকাজ পুরোপুরি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে, সর্বপ্রকার স্বার্থপরতা মুক্ত হয়ে সম্পাদন করা হবে এবং এই আদর্শানুযায়ী করা হবে যে, মানুষের কল্যাণের জন্যে কাজ করাই হচ্ছে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উপায় আর বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া মানব জীবনের আর কোনো লক্ষ্যই হতে পারে না—এই সকল কাজের জন্যই 'আল্লাহর পথে' পরিভাষাটি নির্দিষ্ট।

জিহাদের সঙ্গেও আল্লাহর পথে শর্তটি এ জন্যেই জুড়ে দেয়া হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, কোনো ব্যক্তি বা দল যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করার এবং ইসলামী মতাদর্শের আলোকে নয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সংগ্রামে লিপ্ত হবে, তখন এই প্রতিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধি লক্ষ্য হতে পারবে না। কিংবা কাইসারকে অপসারিত করে নিজেই কাইসার হয়ে বসা এবং নিজের জন্যে ধন-দওলত, খ্যাতি-প্রসিদ্ধি বা মানমর্যাদা লাভ করার ক্ষীণতম ইচ্ছা পর্যন্ত এই সংগ্রামের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। তার সমস্ত কোরবানী ও মেহনতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে মানব সমাজে এক সুবিচারপূর্ণ জীবন-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা এবং এর বিনিময়ে

খোদার সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু তার কাম্য হতে পারবে না। কোরআন বলছে ঃ

الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله - والذين كفروا يقاتلون
في سبيل الطاغوت - (النساء - ٧٦)

ঈমানদার লোকেরা খোদার পথে লড়াই করে আর কাফেরগণ লড়াই করে 'তাগুতের' পথে।

'তাগুত' শব্দের উৎস হচ্ছে 'তুগ্ইয়ান'। এর মানে হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। নদীর পানি যখন সীমা বা কূল ছাপিয়ে ওঠে, তখন বলা হয় যে, তুগইয়ানী (প্লাবন) এসেছে। এইভাবে মানুষ যখন তার সঙ্গত সীমা অতিক্রম করে অন্য মানুষের ওপর 'খোদা' হয়ে বসার কিংবা নিজের বৈধ অংশের চাইতে বেশি ফায়দা হাসিল করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করে, তখন একেই বলা হয় 'তাগুতের পথে' লড়াই। এর মুকাবিলায় খোদার পথে সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার বুকে খোদার দেয়া সুবিচারমূলক আইনের প্রতিষ্ঠা। সংগ্রামীরা নিজেরা যেমন সে আইনের অনুবর্তন করবে, অন্যান্য লোকদেরকেও তেমনি তার অনুবর্তন করতে বাধ্য করবে। কোরআন বলছে ঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض
ولا فسادا والعاقبة للمتقين - (القصص - ٨٣)

'আখেরাতে সম্মান ও মর্যাদা আমরা তাদের জন্যেই রেখে দিয়েছি, যারা দুনিয়ায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না। বস্তুত খোদাভীরু লোকদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের সাফল্য।'

হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ঃ একব্যক্তি রসূলে করীম (ছ)-কে জিজ্ঞেস করলো, খোদার পথে সংগ্রামের তাৎপর্য কি? এক ব্যক্তি ধনমালের জন্যে যুদ্ধ করে; দ্বিতীয় ব্যক্তি বীরত্বের খ্যাতিলাভ করার জন্যে সংগ্রাম করে; তৃতীয় ব্যক্তি শত্রুতা চরিতার্থ করা কিংবা জাতীয় অহঙ্কারবশতঃ যুদ্ধ করে। এর

মধ্যে কা'র যুদ্ধকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ বলা চলে? জবাবে হযরত বললেন এদের কারো যুদ্ধকেই আল্লাহর পথে বলা যায় না বরং যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্যেই যুদ্ধ করে এবং এছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্য পোষণ করেনা, কেবল তার যুদ্ধই হচ্ছে আল্লাহর পথে যুদ্ধ।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ কেউ যদি যুদ্ধ করে আর তার মনে উট বাঁধার একগাছি রশি লাভ করারও নিয়্যত থাকে, তবে তার সমস্ত প্রতিফলই নষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুত যে কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করা হয়—কোনো প্রকার ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থের জন্যে নয়—আল্লাহ কেবল তাই মঞ্জুর করে থাকেন। কাজেই ইসলামী দৃষ্টিতে জিহাদের পূর্বে 'আল্লাহর পথে' শর্তটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১] নিছক জিহাদ তো দুনিয়ার সকল প্রাণীই করছে। প্রত্যেকেই নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছে। কিন্তু 'মুসলমান' হচ্ছে এক বিপ্লবী দলের নাম নিজস্ব জান ও মাল ব্যবহার করে দুনিয়ার তাবৎ বিদ্রোহী শক্তির সঙ্গে লড়াই করা এবং এই উদ্দেশ্যে দেহ—আত্মার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করা এক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী আদর্শ। কিন্তু তা' এ জন্যে নয় যে, অন্যান্য বিদ্রোহীদেরকে অপসারিত করে সে নিজেই তাদের জায়গা দখল করে বসবে বরং দু নিয়া থেকে বিদ্রোহ ও সীমা লংঘনকে নিশ্চিহ্ন করে একমাত্র খোদায়ী আইনকে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এটা করতে হবে।

'জিহাদ' ও 'আল্লাহর পথে' কথাটির এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতির পর আমি ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের কিছুটা ব্যাখ্যাদান করতে চাই। এতে করে জিহাদের উদ্দেশ্যে (Objective)এবং ইসলামী দাওয়াতের জন্যে তার আবশ্যকতা অতি সহজেই বোঝা যাবে।

ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত

ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের সারমর্ম নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে ঃ

يا يها الناس عبدوا ربكم الذى خلقكم - (بقره - ٢١)

(১) এইখানে এসে লোকেরা একটি গুরুতর ভুল করে বসেছে। তারা নিছক 'জিহাদ' ও 'আল্লাহর পথে জিহাদে'র পার্থক্যকে একে বারে উড়িয়ে দিয়েছে। এর ফলে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকারের জন্যে প্রচেষ্টা এবং খোদার বাণীকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টার মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্যই বাকী থাকেনি।

'হে মানুষ! তোমরা কেবল আপন প্রভুর দাসত্ব করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।'

এই আয়াতে ইসলাম শুধু কৃষক, শ্রমিক, জমিদার ও কারখানাদারকেই আহবান জানায়নি, বরং গোটা মানব জাতিকেই সে সম্বোধন করেছে নির্বিশেষে। ইস্‌লাম মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই ডাক দিয়েছে। সে কেবল বলেছেঃ তোমরা যদি খোদা ছাড়া অন্য কারো গোলামী, আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তন করে থাকো, তবে তা পরিত্যাগ করো। তোমার নিজের মধ্যে যদি প্রভুত্বের আকাংখা থাকে তো তাও মুছে ফেলো। কারণ অন্য মানুষকে নিজের গোলাম বানাবার এবং অন্য কাউকে নিজের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করার কোন অধিকার তোমাদের কারো নেই। তোমাদের সবাইকে এক খোদার বন্দেগী ও গোলামী স্বীকার করতে হবে। এই বন্দেগী ও গোলামীর ব্যাপারে তোমাদের সবাইকে একই পর্যায়ে এসে দাঁড়াতে হবে।

تعالوا الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك
به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

'এসো, আমরা ও তোমরা এমন একটি কথায় ঐক্যবদ্ধ হই, যা' আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তা'হলো এই যে, আমরা খোদা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী ও গোলামী করবোনা এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে খোদার সঙ্গে অপর কাউকে অংশীদার করবো না। পরন্তু আমরা নিজেদের মধ্যেও কেউ কাউকে খোদার পরিবর্তে আদেশ করার অধিকারী বলে মানবোনা।

এই হচ্ছে ইসলামের সর্বাত্মক ও বিশ্বব্যাপক বিপ্লবী দাওয়াত। ইস্‌লাম উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেছে ان الحكم الا لله—আদেশ দান বা কর্তৃত্ব করার অধিকার আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। কেউ নিজে নিজেই মানুষের ওপর শাসক হয়ে বসার অধিকারী নয়—নিজের ইচ্ছামত কোনো বিষয়ে নির্দেশ দান এবং কোনো বিষয়ে নিষেধ করারও অধিকার কারো নেই। কোনো মানুষকে আদেশ নিষেধ করার স্বাধীন অধিকারী মনে করার অর্থই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তাকে খোদায়ীর ব্যাপারে অংশীদার করা আর এটাই হচ্ছে অশান্তি ও বিশৃংখলার মূল উৎস। আল্লাহ্ মানুষকে যে নির্ভুল প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন যাপন জন্যে সহজ-সরল পথ বাত্‌লে দিয়েছেন,

তার থেকে মানুষের বিচ্যুতির কারণ হলো এই যে, প্রথমত সে খোদাকে ভুলে যায় এবং ফলত নিজের স্বরূপকেও বিস্মৃত হয়। এর অনিবার্য পরিণাম ফল দাঁড়ায় এই যে, একদিকে কতিপয় ব্যক্তি কিংবা খান্দান অথবা শ্রেণী প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে প্রভুত্বের দাবি করে বসে এবং নিজেদের শক্তিকে অবৈধভাবে প্রয়োগ করে মানুষকে গোলামে পরিণত করে নেয়। অন্যদিকে এই খোদাবিস্মরণ ও আত্মবিস্মৃতির ফলেই লোকদের এক বিরাট অংশ ঐ শক্তিমানদের প্রভুত্বের দাবিকে স্বীকার করে বসে এবং তাদের আদেশ-নিষেধ নতশিরে পালন করে চলবার দাসখতও লিখে দেয়। এটাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জুলুম, পীড়ন, অন্যায়, অশান্তি ও অবৈধ শোষণের (Exploitation) মৌল কারণ। এ কারণে ইসলাম এর ওপরই প্রথম আঘাত হানে। সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে:

لا تطيعوا امر المسرفين الذين في الارض ولا يصلحون
(الشعراء - ٧)

'যারা সীমা-লংঘন করে, দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃখলার সৃষ্টি করে এবং কোনোরূপ সংস্কারমূলক কাজই করে না, তাদের হুকুমের আনুগত্য মাত্রই কোরোনা।'

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا -
(الكهف -)

'যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে আপন প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে গিয়েছে এবং প্রতিটি কাজে সীমা-লংঘনই যার অভ্যাস, তাদের আনুগত্য মোটেই স্বীকার কোরোনা।'

الا لعنة الله على الظالمين - الذين يصدون عن سبيل الله
ويبغونها عوجا - (هود - ٢)

'যারা খোদার নির্ধারিত সহজ-সরল জীবন-পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং তাকে কঠিন ও কুটিল করবার প্রয়াস পায়, সেই সব জালেমের ওপর খোদার অভিসম্পাৎ।'

ইসলাম মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করে: ءارباب متفرقون خير ام الله

الواحد القهار ---যেসব ছোট-বড় খোদার গোলামীর ফলে তোমরা নিষ্পিষ্ট হচ্ছো, তাদের গোলামীই কি গ্রহণযোগ্য, না সর্বশক্তিমান খোদার গোলামী? এই এক খোদার গোলামী কবুল করলে ঐ ছোটো খাটো মিথ্যা খোদাদের প্রভুত্বের জাল থেকে তোমরা কখনোই নিষ্কৃতি পাবে না। এরা যে কোনো প্রকারে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে রাখবেই এবং অশান্তি ও বিশৃংখলাও সৃষ্টি করতে থাকবে:

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزة اهلها اذلة وكذالك يفعلون - (النمل - ٣)

‘এই বাদশাহ্‌রা যখন কোনো লোকালয়ে প্রবেশ করে, তখন সেখানকার জীবন-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং তার সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে এটাই হচ্ছে তাদের চিরাচরিত স্বভাব।

واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل ط والله لا يحب الفساد - (بقره - ٢٠٥)

এই শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করতে পারলে দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত ও নব্য বংশধরদের ধ্বংস করে, কিন্তু আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃংখলাকে মোটেই ভালোবাসেন না।’

এখানে বিস্তৃত আলোচনার কোনো অবকাশ নেই। সংক্ষেপে আমি এই কথাটিই পাঠকদের অন্তর্নিবিষ্ট করে দিতে চাই যে, ইস্‌লামের তওহীদ ও খোদা পরস্তির দাওয়াত অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় একটি নিছক ধর্মীয় আহবানই নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এ একটি ব্যাপকতর সমাজ-বিপ্লবের (Social Revolution) আমন্ত্রণ। যারা ধর্মীয় জীবনে পুরোহিত, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাদশাহ, নেতা ও শাসক এবং অর্থনৈতিক জীবনে মহাজন, জমিদার ও

ইজারাদার সেজে সাধারণ মানুষকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে—এই বিপ্লবী আহবানের প্রত্যক্ষ আঘাত এর প্রত্যেকটি শ্রেণীর ওপর পড়ে। এই সমস্ত লোকেরা কোথাও প্রকাশ্যভাবে ছোটোখাটো 'খোদা' হয়ে বসেছে, নিজেদের জন্মগত ও শ্রেণীগত অধিকারের ভিত্তিতে বিশ্ববাসীর কাছে আনুগত্য ও গোলামীর দাবি জানিয়েছে এবং স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেঃ ما لكم من الـه غيرى (আমি ছাড়া তোমাদের কোনো প্রভু নেই) انا ربكم الاعلى (আমিই তো তোমাদের বড় খোদা') انا احى و اميت। (আমিই জীবনমৃত্যুর একমাত্র মালিক) من اشد منا قوة (আমার চাইতে বেশী শক্তিশালী আর কে আছে?)।

আবার কোথাও এরা জনসাধারণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর(Exploit) জন্যে কৃত্রিম খোদার মূর্তি ও প্রতিকৃতি বানিয়ে রেখেছে। এই সবের আড়ালে থেকে এরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের খোদায়ী অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করেছে। সুতরাং কুফর, শেরেক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইস্‌লামের দাওয়াত এবং এক খোদার বন্দেগী, গোলামী ও আনুগত্যের জন্যে প্রচার তৎপরতা সমকালীন সরকার, তার সমর্থক কিংবা সরকার আশ্রিত শ্রেণী-গুলোর সাথে সরাসরি সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এই কারণে যখনি কোনো নবী—يا قوم اعبدوا الله مالكم من الـة غيره (হে জাতি! একমাত্র আল্লাহ্‌র গোলামী স্বীকার করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো প্রভু নেই) বলে আওয়াজ তুলেছেন, তৎকালীন সরকার অমনি তাঁর বিরুদ্ধে এসে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত অবৈধ স্বার্থ-শিকারী ও সুযোগ সন্ধানী শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছে। কারণ এটা শুধু কোনো অবাস্তব ও অতি-প্রাকৃতিক প্রস্তাবের (Metaphysical Proposition) বিবৃতি ছিলোনা, বরং এ ছিলো এক প্রচণ্ড সমাজ-বিপ্লবের ঘোষণা। আর এই ঘোষণা শোনা-মাত্রই এর মধ্যে রাজনৈতিক বিপ্লবের উত্তাপ অনুভব করে নেয়া হতো।

ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

এটা নিঃসন্দেহ যে, দুনিয়ার সমস্ত নবীই ছিলেন বিপ্লবী নেতা, আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সবচাইতে বড়ো বিপ্লবী নেতা। কিন্তু দুনিয়ার সাধারণ বিপ্লবী নেতা এবং এই খোদাপরস্ত বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য-রেখা রয়েছেঃ তা হলো এই যে, অন্যান্য বিপ্লবী

লোকেরা যতোই সদুদ্দেশ্যপরায়ণ হোক না কেন, সুবিচার ও ন্যায়পরতার নির্ভুল মর্যাদা তাঁরা কখনোই লাভ করতে পারেন না। এঁরা হয় নিজেরাই নিপীড়িত শ্রেণী থেকে আসেন কিংবা তাদের পক্ষাবলম্বনের ভাবধারা পোষণ করেন। অতঃপর সমগ্র বিষয়টিকে এই বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে থাকেন। এর স্বাভাবিক পরিণামে তাঁদের দৃষ্টি কখনো নিরপেক্ষ ও খালেস মানবতাবাদী হতে পারে না, বরং তাঁরা এক শ্রেণীর প্রতি ক্রোধ ও ঘৃণা এবং অপর শ্রেণীর প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করতে বাধ্য হন। তাঁরা জুলুমের প্রতিকার হিসেবে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যা' পরিণামে একটি পাল্টা জুলুম হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ, হিংসা-দ্বেষ ও শত্রুতামূলক ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে এমন কোনো সুসম, সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়, যাতে সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতি কল্যাণ লাভ করতে পারে। কিন্তু নবীদের আচরণ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা যতোই নির্যাতিত ও নিপীড়িত হোন না কেন, তাঁদের সঙ্গী-সাথীদের ওপর যতোই অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালানো হোক না কেন--তাঁদের পরিচালিত বিপ্লবী আন্দালনে কখনো তাঁদের ব্যক্তিগত ভাবধারা ও অনুভূতি প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাঁরা সরাসরি খোদার নির্দেশ ও হেদায়াত অনুসারে কাজ করতেন। আর খোদা যেহেতু মানবীয় অনুভূতি থেকে উর্ধে, কোনো মানব-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো সম্বন্ধ নেই কিংবা কোনো শ্রেণীবিশেষের প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ বা শত্রুতাও নেই--সেহেতু খোদার নির্দেশাধীন নবীগণ সমস্ত বিষয়কে নিরপেক্ষ ও সুবিচারপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচার করতেন; যে-জিনিসে গোটা মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত তা-ই তাঁরা গ্রহণ করতেন। তাঁরা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সঙ্গত সীমার মধ্যে থেকে তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করতে পারে এবং ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক কিংবা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের বেলায় পূর্ণ ভারসাম্য কায়েম হতে পারে। এ কারণেই নবীদের বিপ্লবী আন্দোলন কখনো শ্রেণী সংগ্রামে (Class-War) পরিণত হতে পারেনি। তাঁরা সামাজিক পুনর্গঠনের (Social Reconstruction) জন্যে এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর ওপর চাপিয়ে দেননি; বরং তার জন্যে এক সুবিচারমূলক পন্থা অবলম্বন করেন, যাতে সমগ্র মানব জাতির জন্যে

বৈষয়িক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা বর্তমান ছিল।

জিহাদের প্রয়োজন ও তার উদ্দেশ্য

এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে ইসলামের পেশকৃত সমাজ-ব্যবস্থার (Social Order) বিস্তৃত বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইনশাআল্লাহ পরে বিস্তৃত আলোচনা পেশ করা যাবে। আপাততঃ এ প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, ইস্‌লাম নিছক একটি ধর্মবিশ্বাস এবং কতিপয় ইবাদত অনুষ্ঠানের সমষ্টিমাত্র নয়, বরং ইসলাম একটি ব্যাপক ও সর্বাত্মক জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ার বুক থেকে তামাম অত্যাচারী ও অশান্তি সৃষ্টিকারী জীবন ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে তৎ পরিবর্তে এক সংস্কারমূলক কর্মসূচী প্রবর্তিত করাই তার চরম লক্ষ্য। কারণ তার মতে এটাই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ ও মঙ্গলের সর্বোত্তম পন্থা।

এই ভাঙ্গন ও পুনর্গঠন, বিপ্লবী ও সংস্কারের জন্যে ইসলাম কোনো বিশেষ জাতি বা দলকে নয়, বরং গোটা মানব সমাজের প্রতিই আহবান জানায়। এমন কি খোদ জালেম, শোষক ও দুর্নীতিবাজ শ্রেণীকে--রাজা বাদশাহ ও সমাজ-নেতাকে পর্যন্ত সে এই ব্যাপারে আমন্ত্রণ জানায়। সবার উদ্দেশ্যেই তার একমাত্র ডাক হলো ঃ স্রষ্টার নির্ধারিত সীমা-রেখার মধ্যে থেকে তোমরা জীবন যাপন করো। তোমাদের জন্যে সত্য ও সুবিচারমূলক জীবন-ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। এখানে কোনো মানুষের সঙ্গে শত্রুতা নেই। শত্রুতা রয়েছে জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধে, অশান্তি ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে। এক ব্যক্তি তার স্বাভাবিক সীমা লংঘন করে এমন জিনিস পেতে চায়, আল্লাহর দেয়া প্রকৃতি অনুযায়ী যা তার প্রাপ্য নয় এহেন প্রবৃত্তির সাথেও রয়েছে শত্রুতা।

এই বিপ্লবী দাওয়াত যারা কবুল করবে, তারা যে-কোনো শ্রেণী, গোত্র, জাতি বা দেশেরই লোক হোক না কেন, সমান অধিকার ও সুসম মর্যদার সাথে ইসলামী দল ও সমাজের সভ্য হতে পারে। এভাবে তারা সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলে পরিণত হবে, কোরআন মজীদ যাকে 'হিজবুল্লাহ' (আল্লাহর দল) বা 'উম্মতে মুসলিমা' নামে আখ্যায়িত করেছে।

এই দলটি জন্মলাভ করেই তার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জিহাদ শুরু করে দেয়। দুনিয়ায় তার অস্তিত্বটাই অনৈসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার

কর্তৃত্বকে বিলুপ্ত করা এবং তার বিপরীত এক সুসম ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক ও তমদ্দুনিক ব্যবস্থার কর্তৃত্ব—কোরআন যাকে 'কালেমাতুল্লাহ' বলে উল্লেখ করেছে—প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য করে তোলে। এই দলটি যদি অনৈসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বদলানোর এবং ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই না করে, তবে তার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। কারণ তাকে আর কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টিই করা হয়নি এবং এই জিহাদ ছাড়া তার কোনো যথার্থ কাজও নেই। কোরআনে তার সৃষ্টির একটিমাত্র উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে আর তা' হলো এইঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - (ال عمران)

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি; তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে সমগ্র মানবতার (কল্যাণের) জন্যে। তোমরা (লোকদের) সুকৃতির আদেশ দাও, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং খোদার প্রতি ঈমান পোষণ করো।'

বস্তুত এটা কোনো ধর্মপ্রচারক, ওয়ায়েজ (Preachers) ও সুসংবাদ-দাতার (Missionaries) দল নয়, বরং এ হচ্ছে একটি খোদায়ী সেনার দল—لتكونوا شهداء على الناس দুনিয়া থেকে জুলুম শোষণ, অশান্তি-বিশৃংখলা, অনৈতিকতা, খোদাদ্রোহিতা ও দুর্নীতিপরায়ণতাকে নির্মূল করা, মানুষের ওপর থেকে খোদা ছাড়া অন্যান্য শক্তির প্রভুত্ব খতম করা এবং দুষ্কৃতির স্থানে সুকৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে তার কর্তব্য।

قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله

—(তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো, যতোক্ষণ না অশান্তি ও বিপর্যয় নির্মূল হয়ে যায় এবং মানুষ শুধু খোদার আনুগত্যের সুযোগ পায়)

الا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد كبير

—(তোমরা যদি এ কাজ না করো তো দুনিয়ার বুকে অশান্তির সৃষ্টি হবে, ধ্বংস ও বিশৃংখলা ব্যাপক আকার ধারণ করবে)

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

(—সেই আল্লাহই তাঁর রসুলকে জীবন যাপনের, সরল পথ এবং সত্য অনুসরণের নির্ভুল বিধানসহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি সকল প্রকার আনুগত্যকে নির্মূল করে সত্য অনুসরণের এই একমাত্র বিধানকে সবার ওপর জয়ী করে দিতে পারেন —যদিও খোদায়ীর ব্যাপারে অংশবাদী লোকেরা এটা মোটেই পসন্দ করে না।)

কাজেই এই দলের পক্ষে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল না করে উপায় নেই। কারণ অশান্তি ও বিশৃংখলাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা একটি বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থার সহায়তায়ই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পক্ষান্তরে শান্তি ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থা ততোক্ষণ পর্যন্ত কায়েমই হতে পারে না, যতোক্ষণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বিশৃংখলাকারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শান্তিকামী ও সংস্কারবাদীদের হাতে ন্যস্ত না হবে।

বিশ্ব-সংস্কারের কথা বাদ দিলেও এই দলের পক্ষে নিজস্ব মতাদর্শ পালন করাও—যদি রাষ্ট্রব্যবস্থা ভিন্ন মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়—একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। কোনো দল যখন বিশেষ কোনো ব্যবস্থাকে সত্যাশ্রয়ী বলে মনে করে, তখন ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থেকে সে নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারে না। একজন কম্যুনিস্ট ইংল্যাণ্ড কিংবা আমেরিকা থেকে কম্যুনিজম অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইলে তাতে সে কিছুতেই সফলকাম হবে না। কারণ পুঁজিবাদী জীবন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে জবরদস্তি তার ওপর চেপে বসবে এবং তার এই চাপ থেকে সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে একজন মুসলমানও কোনো অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে থেকে ইসলামী আদর্শে জীবন যাপন করতে চাইলে তাতে সে সফলকাম হতে পারে না। কারণ যেসব আইন-কানুনকে সে বাতিল মনে করে, যে সকল কাজকে সে হারাম বিবেচনা করে, যে সব লেনদেনকে সে অবৈধ মনে করে, যে জীবন পদ্ধতিকে সে অশান্তিকর বিবেচনা করে, যে-শিক্ষাব্যবস্থাকে

সে ধ্বংসাত্মক মনে করে—তার সবই তার নিজ সত্তা, ঘরবাড়ী ও সন্তান-সন্ততির ওপর চেপে বসবে। সে সবের বন্ধন থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না। কাজেই কোনো বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা দল স্বাভাবিক কারণেই বিপরীত আদর্শের শাসন-কর্তৃত্ব নিশ্চিহ্ন করে জীবনের সর্বত্র নিজস্ব আদর্শের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে বাধ্য। কারণ তা না করলে নিজস্ব আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এরূপ চেষ্টা থেকে বিরত থাকলে কিংবা তার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হলে স্পষ্ট-ভাবে বুঝতে হবে যে, তার বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দাবি একেবারেই মিথ্যা।

عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا
وتعلم الكاذبين - لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم
الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم .... انما يستاذنك الذين
لا يؤمنون بالله واليوم الاخر - (التوبة - ٨)

‘হে নবী! আল্লাহ তোমায় মাফ করুন। তুমি ঐ লোকদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুমতি কেন দিলে? অথচ জিহাদই এমন একটি মাপকাঠি যদ্দ্বারা তোমাদের সামনে ঈমানের সাচ্চা দাবিদার ও মিথ্যা দাবিদারের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারা কখনো জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করার দায়িত্ব থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে তোমার নিকট আবেদন জানাতে পারে না।...অবশ্য যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করেনা, কেবল তারাই এহেন আবেদন পেশ করতে পারে।

এই আয়াত ক'টিতে কোরআন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে যে, কোনো দলের পক্ষে নিজস্ব ঈমানের (Conviction) দাবিতে সত্যবাদী হবার একমাত্র মাপকাঠি হলো তার গৃহীত আদর্শকে সমাজ ও রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশীল করার জন্যে ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা। যদি কেউ

বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়, তবে তার ঈমানের দাবি যে একেবারে মিথ্যা, এটাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়। এর স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত ইসলামী আদর্শের প্রতি লোকদের 'নাম-মাত্র' বিশ্বাসেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। প্রথমত তারা বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ঘৃণার সঙ্গে স্বীকার করবে; তারপর ধীরে ধীরে তাদের মন তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। এমন কি, এই ঘৃণাই একদিন অনুরাগের স্থান দখল করে বসবে। পরিণামে অবস্থা এতোদূর গিয়ে গড়াবে যে, বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার ব্যাপারে তারা নিজেরাই সাহায্য ও সহায়তা করতে শুরু করবে। ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে অনৈসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির জন্যে নিজেদের জান ও মাল দ্বারা সংগ্রাম করবে। তাদের শক্তি-শ্রম ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টির কাজে ব্যয়িত হবে। আর এই পর্যায়ে পৌঁছার পর একটি নিকৃষ্টতম মিথ্যা এবং একটি প্রতারণার নাম হিসেবে ইসলামের মুনাফেকী দাবি ছাড়া মুসলমান ও কাফেরের মধ্যে আর কোনোই পার্থক্য থাকবে না। হাদীসে নবী করীম (ছ) এই পরিণতির কথা স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করেছেন

و الذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر و تاخذن يد المسىء و لتطرنه على الحق اطرا و ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض او ليلعننكم كما لعنهم -

'যে-খোদার হাতে আমার জীবন, তার শপথ করে বলছি ঃ তোমাদেরকে সুকৃতির আদেশ দান করতে হবে, দুষ্কৃতি থেকে লোকদের বিরত রাখতে হবে এবং পাপাচারী লোকদের হাত ধরে বলপূর্বক সত্যের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নচেৎ খোদার প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে পাপাচারী লোক-দের প্রভাব তোমাদের মনের ওপর পড়বে এবং পরিণামে তাদের ন্যায় তোমরাও অভিশপ্ত হয়ে পড়বে।'

বিশ্বব্যাপী বিপ্লব

এই আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অনৈসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নির্মূল করে ইস্‌লামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের প্রকৃত লক্ষ্য (Objective)। কেবল একটি মাত্র দেশ কিংবা কতিপয় দেশেই নয়—বরং গোটা দুনিয়ায়ই ইসলাম এই বিপ্লব সৃষ্টি করতে

চায়। যদিও প্রথমত মুসলিম দলের সভ্যদের নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায়ই বিপ্লব সৃষ্টি করা কর্তব্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক বিশ্বব্যাপক বিপ্লব (World Revolution) সৃষ্টি করাই হচ্ছে তাদের চরম লক্ষ্য। বস্তুত যে বিপ্লবী আদর্শ জাতীয়তার পরিবর্তে মানবতার কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হয়, তা' আপন লক্ষ্যস্থলকে কখনো বিশেষ দেশ কিংবা বিশেষ জাতির চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত রাখতে পারে না; বরং নিজস্ব স্বভাবের তাগিদেই সে বিশ্বব্যাপী বিপ্লবকে নিজের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য। বস্তুত সত্য কখনো ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। কোনো নদী বা পাহাড়ের এপারে যা সত্য হতে পারে, ওপারেও তা-ই সত্য হতে হবে—এটাই হচ্ছে সত্যের দাবি। মানব জাতির কোনো একটি অংশকেও এই সত্য থেকে বঞ্চিত করা চলে না। মানুষ যেখানেই জুলুম-পীড়ন ও বাড়াবাড়ির যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, সেখানে তার সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া সত্যের কর্তব্য। এই বিষয়টিই কোরআন মজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত করেছে ঃ

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - (النساء - ٧٥)

'তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা খোদার পথে সেইসব পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্যে কেন লড়াই করোনা, যারা দুর্বল হবার কারণে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থনা করছে ঃ হে খোদা! এই জালেম কর্তৃত্বাধীন জনপদ থেকে আমাদের বের করে নাও।'

পরন্তু জাতীয় ও স্বাদেশিক বিভাগ সত্ত্বেও মানবীয় সম্পর্ক সম্বন্ধটা অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এর ফলে কোনো দেশই নিজস্ব নীতি ও আদর্শ পুরোপুরি পালন করতে পারে না, যতোক্ষণ না প্রতিবেশী দেশগুলোতেও সেই নীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই সাধারণ সংস্কার ও আত্মসংরক্ষণের খাতিরে কোনো একটি ভূখণ্ডে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে ক্ষান্ত না হওয়া, বরং নিজস্ব শক্তি ও সঙ্গতি অনুযায়ী উক্ত ব্যবস্থাকে দুনিয়ার

সর্বত্র সম্প্রসারণের চেষ্টা করাই হচ্ছে মুসলিম দলের অবশ্য কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে তারা একদিকে নিজেদের চিন্তাধারা ও মতবাদ দুনিয়াময় প্রচার করবে এবং দেশের মানুষকে এই আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানাবে, কারণ এর মধ্যেই রয়েছে তাদের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। অপর-দিকে তারা শক্তিমান হলে অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করবে।

হযরত রসূলে করীম (স) এবং তাঁর পর খোলাফায়ে রাশেদীন এই নীতি অনুসারেই কাজ করে গিয়েছেন। মুসলিম দলের জন্মভূমি আরব দেশেই সর্বপ্রথম ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। অতঃপর রসূলে করীম (স) পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে ইসলামী নীতি ও আদর্শ গ্রহণের আহবান জানান। কিন্তু এ আহবান তারা গ্রহণ করবে কিনা, এবং এর জন্যে মোটেই অপেক্ষা করা হলোনা; বরং শক্তি অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ শুরু করে দিলেন। রসূলে করীম (ছ)-এর পর হযরত আবু-বকর সিদ্দীক (রা) মুসলিম দলের নেতা নিযুক্ত হন। তিনি রোম ও পারস্য এই দুই অনৈসলামী রাষ্ট্রের ওপর যুগপৎ আক্রমণ চালান। আর পরবর্তীকালে হযরত উমর ফারুক (রা) এই আক্রমণকে সাফল্যের শেষ প্রান্ত অবধি পৌঁছিয়ে দেন। মিসর, সিরিয়া, রোম ও পারস্যের জনগণ প্রথমত একে আরবদের সাম্রাজ্যবাদী কর্ম-নীতি মনে করতো। তারা ভাবলো, পূর্বে যেমন একটি জাতি অন্যান্য জাতিকে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্যে আক্রমণ করতো, আরবরাও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আক্রমণ চালিয়েছে। এই ভুল ধারণার কারণে তারা কাইজার[১] ও কিসরার[২] পতাকাতলে সমবেত হয়ে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো। কিন্তু অচিরেই তারা মুসলিম দলের বিপ্লবী আদর্শের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এরা অত্যাচারমূলক জাতীয়তাবাদের (Aggressive Nationalism) নিশানবর্দার নয়, বরং জাতীয়তাবাদী অভিসন্ধি থেকে মুক্ত এক নির্ভেজাল সুবিচারমূলক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই এরা এগিয়ে এসেছে এবং কাইজার ও কিসরার প্রশ্রয়ে যে অত্যাচারী শ্রেণীগুলো তাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে চলছে, তাদের 'খোদায়ীকে' খতম করাই এদের উদ্দেশ্য। এই সত্যটি উপলব্ধি করার সাথে-সাথে আক্রান্ত দেশগুলোর

(১ ও ২) যথাক্রমে প্রাচীন রোম ও পারস্য সম্রাটের উপাধি—অনুবাদক

জনগণের নৈতিক সহানুভূতি মুসলিম দলের প্রতি ঘুরে গেলো। তারা একে একে কাইজার ও কিসরার পতাকা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে লাগলো। তাদেরকে বলপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হলেও তারা মনের সমর্থন ছাড়াই যুদ্ধ করতো। বস্তুত প্রথম যুগের মুসলমানদের বিস্ময়কর দেশ জয়ের এটাই হচ্ছে মূলীভূত কারণ। এই কারণেই ইস্‌লামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বিজিত দেশগুলোর অধিবাসিগণ ইস্‌লামী সমাজব্যবস্থাকে বাস্তবে ক্রিয়াশীল দেখে দলে দলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্তর্জাতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অন্যান্য দেশেও এই আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এর পতাকা হাতে অগ্রসর হয়।

আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক বিশেষণ অপ্রাসঙ্গিক

এ-পর্যন্তকার আলোচনা সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে অতি সহজেই বুঝা যাবে যে, সাধারণ যুদ্ধের ন্যায় ইসলামী জিহাদকে আক্রমণাত্মক (Offensive) ও প্রতিরক্ষামূলক (Deffensive) ইত্যাকার নামে কিছুতেই বিভক্ত করা চলে না। কেবল জাতীয় ও স্বাদেশিক যুদ্ধগুলোকেই এইভাবে ভাগ করা চলে। কারণ আক্রমণ ও প্রতিরক্ষা ইত্যাকার পরিভাষাগুলো একটি দেশ বা একটি জাতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক দল যখন একটি বিশ্বব্যাপক মতবাদ ও মতাদর্শ নিয়ে উত্থিত হয়, মানুষ হিসেবে দুনিয়ার সমগ্র জাতিকে সে আদর্শের দিকে আহবান জানায় এবং প্রত্যেক জাতির লোকদেরকে সমান মর্যাদার সাথে নিজ দলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয় আর শুধু বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রব্যবস্থা খতম করে নিজস্ব আদর্শের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করে, তখন এরূপ ক্ষেত্রে পারিভাষিক 'আক্রমণ' ও 'প্রতিরক্ষার' কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া পরিভাষার কথা ছেড়ে দিলেও ইসলামী জিহাদকে 'আক্রমণাত্মক' ও 'প্রতিরক্ষামূলক' নামে ভাগ করা আদপেই সমীচীন নয়। কারণ ইসলামী জিহাদ একই সঙ্গে আক্রমণাত্মক ও প্রতিরক্ষামূলক এই দুই শ্রেণীর কাজই সম্পাদন করে থাকে। মুসলিম দল বিরোধী আদর্শের রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর হামলা করে বলে এই কাজ আক্রমণাত্মক, আর নিজ আদর্শ পালন করার জন্যে সে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করতে বাধ্য বলে এটা প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু একটা দল হিসেবে তার এমন কোনো ঘর-বাড়ী নেই যে তার প্রতিরোধ

করবে। তার কাছে আসল জিনিস হচ্ছে আদর্শ; এর প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার জন্যেই তার সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত। অনুরূপভাবে বিরোধী দলের ঘর-বাড়ীর ওপরও সে হামলা করে না, হামলা করে তার নীতি ও আদর্শের ওপর। পরন্তু তাকে জবরদস্তি আদর্শচ্যুত করাও এই হামলার উদ্দেশ্য নয়, বরং তার আদর্শের কবল থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়াই শুধু এর উদ্দেশ্য।

জিম্মিদের অবস্থা

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিরোধী ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শের অনুসারী লোকদের অবস্থা কি হয়ে থাকে, এখান থেকে সে প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে যায়। ইসলামী জিহাদ লোকদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, উপাসনা পদ্ধতি ও সামাজিক রীতি-নীতির ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করেনা; বরং ধর্মবিশ্বাস ও মতাদর্শ গ্রহণের ব্যাপারে ইসলাম লোকদেরকে পূর্ণ আজাদী দান করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে রাষ্ট্র চালনার অধিকার দিতে সে আদৌ সম্মত নয়। পরন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সামষ্টিক কল্যাণের পরিপন্থী কোনো কাজ-সম্পাদন নীতিও ইসলামী রাষ্ট্রে চালু রাখবার অধিকার তাদেরকে দেয়া যেতে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়ঃ ইসলাম রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেই সকল প্রকার সূদী কারবার বন্ধ করে দেবে। জুয়াখেলার অনুমতি কোনোক্রমেই দিবেনা। কেনা-বেচা ও আর্থিক লেনদেনের যেসব ধরন ইসলামী আইন অনুযায়ী হারাম, তা সবই বন্ধ করে দেবে। বেশ্যালয় ও অশ্লীলতার আড্ডাগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলবে। অমুসলিম নারীদেরকেও 'সতরে'র ন্যূনতম সীমা মেনে চলতে বাধ্য করা হবে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় অশ্লীল ও উলঙ্গভাবে চলাফেরা করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা হবে। সিনেমা শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে[১] এবং সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়বস্তু ও ভাবধারা থেকে তাকে মুক্ত করা হবে। কাউকে সহশিক্ষা প্রবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে না। এই ধরনের আরো বহু সামাজিক কার্যক্রমের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে, যা' অমুসলিমদের মতে

---

(১) আধুনিক কালের টেলিভিশনও এই নীতির আওতায় পড়বে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এগুলোর চিত্তবিনোদনমূলক ভূমিকাকে একেবারে নস্যাৎ করে দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নৈতিক সীমার মধ্যে থেকে নির্মল আনন্দ দান ও শিক্ষা বিস্তারই হবে এগুলোর মুখ্য ভূমিকা।—সম্পাদক

অবৈধ ও গর্হিত না হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সমতুল্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে এই কাজগুলো শুধু সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের খাতিরেই নয়, বরং নিজের নিরাপত্তা (Defence) বিধানের জন্যেও করতে হবে।

এই ব্যাপারে কেউ যদি ইসলামের প্রতি অনুদারতার অপবাদ চাপাতে চায়, তবে তার একটি বিষয় তলিয়ে দেখা উচিত : ইসলাম তার বিরোধী আদর্শের লোকদের প্রতি যতোখানি উদারতা প্রদর্শন করে, দুনিয়ার কোনো বিপ্লবী ও সংস্কারবাদী আদর্শ তার বিপরীত আদর্শের লোকদের সাথে ততোখানি করেনি। অন্যান্য সমাজে তো বিরোধী আদর্শের লোকদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলতে দেখা যায়।[২] এমনকি, অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে সেখানকার লোকেরা দেশত্যাগ পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলাম তার বিপরীত আদর্শের অনুবর্তীদের পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে সকল প্রকার উন্নতি লাভের সুযোগ দান করে। এককথায়, ইসলাম তার বিরোধী লোকদের সাথে এমন উদার ব্যবহার করে, দুনিয়ায় যার কোনো তুলনা মেলেনা।

সাম্রাজ্যবাদের সন্দেহ

এই পর্যন্ত এসে আবার আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু আল্লাহ্‌র পথে চালিত সংগ্রামকেই বলা হয় জিহাদ। আর এইরূপ জিহাদের ফলে যখন ইস্‌লামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, তখন কাইজার ও কিস্‌রার স্থলে নিজেদেরই প্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ জায়েজ নয়। মুসলমান কখনো তার ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা, খোদার বান্দাদেরকে নিজের গোলামে পরিণত করা এবং তাদের কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থ অবৈধভাবে কেড়ে নিয়ে দুনিয়ার বুকে নিজের জন্যে স্বর্গসুখ রচনা করার জন্যে যুদ্ধ করেনা আর মুসলমান হিসেবে এ-সবের জন্যে সে সংগ্রামও করতে পারে না। কারণ এ-ধরনের সংগ্রাম আল্লাহর পথে হয় না, হয় শয়-তানের (طاغوت) পথে আর এ ধরনের শাসনের সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই। বস্তুত ইসলামের জিহাদ হচ্ছে একটি নিরস ও স্বাদহীন মেহনত, এতে জান-মাল ও কামনা-বাসনার কোরবানী ছাড়া আর কিছু নেই।

---

(২) এর অধুনাতন দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাশিয়ার কমুনিস্ট বিপ্লব—অত্যাচার-নির্যাতন ও রক্তপাতের ব্যাপারে ইতিহাসে যার কোনো নজীর নেই।

এই জিহাদ সফলকাম হলে এর ফলে রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জিত হলে সাচ্চা মুসলিম শাসকদের ওপর এক বিরাট দায়িত্বভার এসে চেপে বসে। এর ফলে ঐ বেচারাদের রাতের ঘুম ও দিনের আরাম পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। কিন্তু এর বিনিময়ে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা ও শাসন ব্যবস্থা থেকে কোনোরূপ স্বাদ ও আনন্দই উপভোগ করতে পারে না। অথচ এই সমস্ত স্বাদ-আনন্দ লাভের জন্যেই দুনিয়ায় সাধারণত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত ইসলামের শাসক প্রজাসাধারণ থেকে বিশিষ্ট কোনো উচ্চতর সত্তা নয়, কোনোরূপ শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনেও সে বসতে পারে না। নিজের সামনে সে অপরের মাথা নত করাতে পারে না; শর্‌য়ী' বিধির খেলাফ একটি পাতাও সে নড়াতে পারে না। নিজের কোনো আত্মীয়, বন্ধু এমনকি নিজের ব্যক্তি সত্তাকেও সে অপর কোনো তুচ্ছতম ব্যক্তির সঙ্গত দাবি পূরণ থেকে রেহাই দেবার অধিকারী নয়। সঙ্গত অধিকার ছাড়া একটি 'দানা' পর্যন্ত সে গ্রহণ করতে পারে না; বিন্দু পরিমাণ ভূমিও দখল করতে পারে না। একজন মধ্যম ধরনের মুসলমানের জীবনযাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় বেতনের চাইতে একটি পাই পরিমাণ বেশী অর্থও বায়তুলমাল থেকে গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েজ নয়। সে 'বেচারা' কোনো প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী করতে পারে না। দাস-দাসীর বাহিনী পুষতে সে অপারগ। বিলাস ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহ করতে সে অসমর্থ। কারণ একদিন তার সমস্ত কৃতকর্মের চুলচেরা হিসাব গ্রহণ করা হবে—সর্বদা এই ভয়ে সে ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকে। তার মনের ওপর সতত এই ভয় চেপে থাকে যে, হারাম পন্থায় অর্জিত একটি পয়সা, জোরপূর্বক দখলকৃত একখণ্ড ভূমি, এতোটুকু অহঙ্কার ও ফেরাউনী আচরণ, অত্যাচার ও বে-ইনসাফীর একটি নজীর এবং প্রবৃত্তি-পূজার একটি চিহ্নমাত্র তার আমলনামায় পাওয়া গেলে সে জন্যেও তাকে আখেরাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেউ যদি বাস্তবিকই দুনিয়ার স্বার্থ ও আনন্দ লাভের জন্যে লোভাতুর হয় আর সে ইসলামী বিধান অনুসারে রাষ্ট্র চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়, তবে তার চাইতে নির্বোধ আর কেউ হতে পারে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের চাইতে বাজারের একজন নগণ্য দোকানদারের অবস্থা অনেক ভালো হয়ে থাকে। সে দিনের বেলায় খলীফা বা শাসকের চাইতে বেশি উপার্জন করে এবং রাতের বেলা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাতে পারে। কিন্তু খলীফা

বেচারা না তার সমান উপার্জন করার সুযোগ পায় আর না পায় রাতের বেলায় নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাবার অবসর।

ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে এই হচ্ছে বুনিয়াদী পার্থক্য। অনৈসলামী রাষ্ট্রে শাসকবর্গ নিজেদেরই খোদায়ী ও প্রভুত্ব কায়েম করে বসে এবং দেশের সমস্ত উপকরণ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ শুধু জনগণের খেদমতই করে যায়, এর বিনিময়ে সাধারণ নাগরিকদের চাইতে বেশি কিছু নিজেদের জন্যে গ্রহণ করে না। ইসলামী রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসকে যে-বেতন দেয়া হতো, তার সাথে আজকের কিংবা সেকালের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সিভিল সার্ভিসের বেতনের তুলনা করলেই ইস্‌লামের দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বগ্রাসের মধ্যে মূলগত পার্থক্যটা উপলব্ধি করা যায়। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার খোরাসান, ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের গভর্ণরদের বেতন আজকের পুলিস ইন্সপেক্টরদের বেতনের চাইতেও অনেক কম ছিলো। প্রথম খলীফা আবুবকর সিদ্দিক (রা) মাসিক মাত্র একশো টাকা বেতনে এতোবড়ো রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বেতন মাসিক দেড় শো টাকার বেশি ছিল না। অথচ তখনকার বায়তুলমাল দুনিয়ার দু'টি বিরাট সাম্রাজ্যের পরিত্যক্ত ধনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিলো। দৃশ্যত সাম্রাজ্যবাদও দেশজয় করে, আর ইসলামও দেশজয় করে; কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিতে আসমান ও জমিনের পার্থক্য বিদ্যমান।

এই হচ্ছে ইসলামী জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ। অথচ এর সম্পর্কে কতো অপপ্রচারই শোনা যাচ্ছে! অবশ্য ইস্‌লাম, মুসলমান ও জিহাদের এই বিশুদ্ধ ধারণা আজ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে কোথাও এর চিহ্নমাত্র দেখা যায়না কেন—একথা জিজ্ঞেস করলে আমি বলবোঃ এ-প্রশ্ন আমার কাছে তুলে লাভ নেই। মুসলমানদের দৃষ্টি তাদের প্রকৃত জীবন-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে তা'বিজ তুমার, আমল-তদবির, মোরাকিবা ও কৃচ্ছ সাধনার দিকে ফিরিয়ে যারা পরকালীন মুক্তি এবং ইহকালীন কল্যাণ ও উদ্দেশ্য লাভের অতি সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়েছে, এ-প্রশ্ন আজ তাদের কাছেই তোলা উচিত। কারণ এরাই তো শিখিয়েছে যে, চেষ্টা-সাধনা ও প্রাণপণ সংগ্রাম ছাড়া শুধু তসবিহ পাঠ কিংবা কোনো কবরস্থ ব্যক্তির অনুগ্রহ লাভ করলেই সব কিছু অর্জিত হতে

পারে। এরাই তো ইস্‌লামের সারবস্তু, মূলনীতি ও উদ্দেশ্যকে গোপন করে অন্ধকার গহবরে নিক্ষেপ করেছে এবং সোচ্চারে আমীন বলা, রফে' ইয়াদাইন করা এবং ইসালে সওয়াব ও কবর জিয়ারত ইত্যাকার অসংখ্য খুঁটিনাটি বিষয়ে মুসলমানদের মন মগজকে জড়িয়ে ফেলেছে—যার ফলে তারা আপন সত্তা, নিজস্ব জীবন লক্ষ্য এবং ইস্‌লামের স্বরূপ ও মূলতত্ত্বকে ভুলে বসেছে। এদের থেকে কোনো সদুত্তর না পাওয়া গেলে মুসলিম নাম-ধেয় নেতৃবৃন্দ ও শাসকবর্গের কাছেই এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা উচিত। কারণ এরা কোরআন মজীদ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার দাবি করে বটে, কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে কোরআনের আইন বিধান ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দেয়া পথ-নির্দেশের কোনো প্রাধিকারই স্বীকার করে না। এরা কখনো কখনো কোরআন খতমের ব্যবস্থা, ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন এবং কোরআনের কাব্য-গুণের প্রশংসা-কীর্তন করে বটে; কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধানকে চালু করবার কোনো দায়িত্বই বোধ করে না। এর প্রকৃত কারণ হলো, এদের প্রবৃত্তি ইসলামী বিধি-বিধান গ্রহণ করতে এবং তার দায়িত্ব পালন করতে মোটেই সম্মত নয়। এরা খুব সহজেই মুক্তিলাভ করতে চায়।

আজাদীর ইসলামী সংজ্ঞা

জনৈক ভদ্রলোক লিখছেন ঃ

'কোরআনের সুরায়ে আহ্‌জাবে হযরত জায়েদ বিন হারেসা ও হযরত জয়নাব (রা) সম্পর্কে যে-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহের সৃষ্টি হয়। রসুলে করীম (সা) হযরত জায়েদকে বলেন ঃ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ (তোমার স্ত্রীকে আপন স্বামিত্বের অধীন রাখো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো) কিন্তু হযরত জায়েদ (রা) নবী করীমের এই আদেশ অমান্য' করে হযরত জয়নাব (রা)-কে তালাক দান করেন। এই কাজটি যে নবীর আদেশের বিপরীত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত জায়েদের এই অবাধ্যতা সামান্য পরিমাণও অপসন্দ করেছেন—কোরআনের বাচনভঙ্গিতে স্পষ্টভাবে কি ইশারা ইঙ্গিত কোথাও এমন কথা পাওয়া যায় না; বরং কাহিনীর সূচনাতেই الَّذِىٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ (যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন) বলে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে স্বভাবতই এই সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, নবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা চলে এবং তাঁর আদেশ প্রামাণ্য বলে সাব্যস্ত হলেও তার আনুগত্য আল্লাহ্‌র বিধানের ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়।

প্রশ্নটিতে কোনো জটিলতার অবকাশ নেই; মাত্র কয়েকটি শব্দেই উত্থাপিত সন্দেহের নিরসন করা চলে। কিস আসলে সন্দেহটি যেখান থেকে

(১) প্রবন্ধটি ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।—সম্পাদক

উদ্রিক্ত হয়েছে, সেটি অনেকগুলো ভ্রান্তিরই উৎস এবং এই ভ্রান্তিগুলোর পরম্পরা বহুদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। এই কারণে উল্লিখিত সন্দেহ নিরসন করার সঙ্গে সঙ্গে তার মূলভিত্তি ও শাখাপ্রশাখার ওপরও আলোকপাত করার একান্ত প্রয়োজন বোধ করছি।

কোরআন হাকীম আইন ও বিধানদাতার প্রসঙ্গটি আসমানী কিতাবের চাইতে বেশি স্পষ্টতর ভাষায় বিবৃত করেছে। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, নিরঙ্কুশ আদেশদাতা আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়—ان الحكم الا لله (খোদা ছাড়া আর কেউ আদেশ দেয়ার যোগ্য নয়)। কেবল তিনিই নিজ ইচ্ছানুরূপ আদেশ দানের অধিকারী—ان الله يحكم ما يريد (আল্লাহ্ যেরূপ ইচ্ছা আদেশ দান করেন)। তিনি এমন আদেশকর্তা যে, তাঁর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে টু-শব্দটি করার অবকাশ নেই—لا يسئل عما يفعل (তাঁর কোনো কাজ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা চলেনা)। কেবল তাঁর আনুগত্যই মানুষের প্রতি ফরয এবং এ জন্যে ফরয যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর দাস আর মূলত তাঁর দাসত্ব করার জন্যেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে—وما خلقت الجن

والانس الا ليعبدون

(আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি)। তিনি ছাড়া মানুষ আর কারো সৃষ্টি নয়—নয় কারো গোলাম ও দাসানুদাস। এ কারণেই কোনো মানুষের প্রতি অপর কোনো মানুষের আনুগত্য করা ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়—يقولون هل لنا من الامر من شيء - قل ان

الامر كله لله (লোকেরা জিজ্ঞেস করেঃ আদেশদানের ব্যাপারে আমাদের কি কোনো অংশ আছে? বলে দাওঃ আদেশদান সমগ্রভাবে আল্লাহর জন্যেই নির্ধারিত)। কোনো মানুষের ওপর অপর কোনো মানুষের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব

বা প্রভুত্ব (Absolute Authority) নেই। কিংবা খোদা ছাড়া অপর কারো আদেশের আনুগত্য কর—আদেশটি কোনো বিশিষ্ট লোকের বলেই—কোনো মানুষের প্রতি বাধ্যতামূলকও করা হয়নি।

বস্তুত কোরআন নাজিল করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো এই যে, মানুষের গলদেশ থেকে গায়রুল্লাহর আনুগত্যের বেড়ি খুলে ফেলতে হবে। মানুষকে প্রকৃত সার্বভৌম শক্তি (Real Sovereign) আল্লাহ্ তায়ালার বান্দাহ রূপে গড়ে তোলার পর তার মতামত ও বিবেক শক্তিকে পুরোপুরি মুক্তি দান করতে হবে। তাই দুনিয়ার সকল ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে কোরআনই মানবীয় গোলামীর বিরুদ্ধে সবচাইতে বেশি জিহাদ ঘোষণা করেছে। এই গ্রন্থ কোনো মানুষকেই নিজের মনগড়া হালালকে হালাল এবং মনগড়া হারামকে হারাম বলে মানাবার অধিকার দেয় না—কোনো মানুষকেই নিজের আদেশ-নিষেধের নিরঙ্কুশ আনুগত্য এবং অধীনস্থ লোকদের ওপর খোদায়ী মর্যাদা দাবীর অধিকার দেয়না। এই ধরনের আনুগত্য ও অধীনতাকে কোরআন এক প্রকারের শের্ক বলে ঘোষণা করে এবং যারা আলেম, পীর, পণ্ডিত, পুরোহিত ও দুনিয়ার শাসকদেরকে ছোটোখাটো 'খোদা' (Gods other than God) বানিয়ে নেয়, তাদেরকে মুশরেক বলে গণ্য করে। কারণ মানুষ যখন এই ধরনের মানুষের আনুগত্য করে, তখন স্বভাবতই তার মূলে খোদায়ী ধারণা ও দাসত্বের অনুভূতি ক্রিয়াশীল থাকে। একজন মানুষ যখন অপর কোনো মানুষকে দোষ-ত্রুটি-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করে, তাকে সর্বজ্ঞ ও সবজান্তা জ্ঞান করে, কেবল তখনি সে তার সামনে নিজের মানসিক, আত্মিক ও দৈহিক আজাদী সম্পূর্ণত বিসর্জন দিয়ে বসে। অথবা যখন কোনো মানুষ কাউকে ব্যক্তিগত মর্যাদার ভিত্তিতে আদেশ-নিষেধ করার একচ্ছত্র মালিক এবং কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও শাসন পরিচালনার স্বাভাবিক অধিকারী বলে মনে করে কিংবা তাকে লাভ-ক্ষতি, ভালো-মন্দ ও জীবিকা বন্টনের নিয়ামক বলে ধারণা করে, তখনি সে তার সামনে মাথা নত করে দেয়। কিন্তু খোদা ছাড়া অপর কোনো সত্তাকে এই সকল গুণের আধার মনে করাই হচ্ছে শের্ক ও গোলামীর নামান্তর। পক্ষান্তরে তওহীদের—যার অনিবার্য ফল হচ্ছে আজাদী—শিক্ষা হলো এই যে, খোদা ছাড়া তামাম বস্তুকেই এই সকল গুণ থেকে বঞ্চিত মনে করতে হবে—তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকারকে অস্বীকার করতে হবে।

এই ভূমিকাটি অন্তর্নিবিষ্ট করে নেয়ার পর নবীর আনুগত্যকে ইসলামে কী হিসেবে ফরয করা হয়েছে এবং কোন্ দৃষ্টিতে তার ওপর দ্বীনইসলামের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে, সেটা খোঁজ করা দরকার। বস্তুত নবী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (যেমন ইবনে ইমরান, ইবনে মরিয়ম্ কিংবা ইবনে আবদুল্লাহ) এবং এ কারণেই তিনি আদেশ-নিষেধ করার ও হালাল হারামের সীমা নির্ধারণ করার অধিকারী—এ হিসেবে তাঁর আনুগত্য মোটেই বাধ্যতামূলক নয়। এ রকম হলে তো (মায়াজাল্লাহ) খোদ নবীই 'ছোট-খাট খোদা'দের (ارباب من دون الله) মধ্যে শামিল হয়ে যাবেন এবং এর ফলে তাঁর নবী হিসেবে আগমনের উদ্দেশ্য তাঁর নিজের দ্বারাই পণ্ড হয়ে যাবে। তাই কোরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বিষয়টির মীমাংসা করে দিয়েছে। সে বলেছেঃ ব্যক্তিগতভাবে নবী তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ—

قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا[১] وقالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم[২] অবশ্য মানুষ হিসেবে তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। তাঁর তরফ থেকে শুধু নবুয়্যতই নয়, তার সাথে 'হুকুম'ও দান করা হয়েছে—

اولئك الذين اتينهم الكتب والحكم والنبوة[৩]

আর 'হুকুম' শব্দের ভেতর বিচার ক্ষমতা (Judgement) ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা (Authority) উভয় অর্থই নিহিত রয়েছে। কাজেই নবীর প্রাপ্ত ক্ষমতা তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা নয়, বরং এ হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক (Delegated) ক্ষমতা। এই কারণে তাঁর আনুগত্য হচ্ছে মূলতঃ খোদারই আনুগত্য—من يطع الرسول فقد اطاع الله[৪] তাঁর আগমনের

(১) হে নবী, তাদেরকে বলোঃ আমার খোদা পবিত্র, আমি কি একজন মানুষ নবী বৈ অন্য কিছু? (২) তাদের নবীগণ তাদেরকে বলেছেঃ আমরা তোমাদের মতোই মানুষ মাত্র। (৩) এই নবীদেরকে আমরা কিতাব, 'হুকুম' এবং নবুয়্যত দান করেছি। (৪) যে ব্যক্তি নবীর আনুগত্য করলো সে খোদারই আনুগত্য করলো।

উদ্দেশ্যই হলো : খোদার তরফ থেকে তাঁর বিধি-বিধান তিনি জারি করবেন এবং লোকেরা সে বিধি-বিধানেব আনুগত্য করে চলবে—

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ۵

এই হিসেবে তাঁর আদেশ হচ্ছে খোদারই আদেশ এবং সে সম্পর্কে টু শব্দটি করার অধিকার কারো নেই—

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ۶

তাঁর অবাধ্যতা করা তো দূরের কথা, মনের কোণে তেমন ধারণা ঠাঁই পেলেও ঈমান একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়—

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ۷ আর সে অবাধ্যতার পরিণাম হচ্ছে অনন্তকালব্যাপী দুঃখ, শাস্তি ও ব্যর্থতা- يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ۸

(৫) আমরা যে নবী পাঠিয়েছি, আল্লাহর হুকুমে তাঁর আনুগত্য করার জন্যেই পাঠিয়েছি।

(৬) যে ব্যক্তি হেদায়াত সুস্পষ্ট হবার পরও নবীর সঙ্গে বিতর্ক করবে এবং ঈমানদার লোকদের পন্থা থেকে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করবে, সে যেদিকে ফিরবে, তাকে সেদিকেই আমরা ফিরিয়ে দিবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো ; আর জাহান্নাম হচ্ছে খুবই খারাপ স্থান।

(৭) খোদার শপথ, তারা আদৌ মুমিন হতে পারবেনা, যতোক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিরোধের ব্যাপারে তোমাকে ফয়সালাকারী স্বীকার করবে, আর তুমি যা কিছু ফয়সালা করবে, সে ব্যাপারে তারা মনের কোণেও কোনো বিরক্তি বোধ করবেনা বরং তার সামনে মাথা নত করে দেবে।

(৮) যারা কুফরী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদের ওপর এমনি বিপদ আপতিত হবে যে, সে ধরণীকে নিজের ওপরে চাপিয়ে নিতে চাইবে।

উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীর আনুগত্য ও অনুবর্তনের ওপরই দ্বীন ও ঈমানের ভিত্তি স্থাপিত এবং এর ওপরই হেদায়াত বা সুপথপ্রাপ্তি একান্তভাবে নির্ভরশীল। (وان تطيعوه تهتدوا) কিন্তু এই আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু নবীর ব্যক্তিগত ও মানবীয় সত্তা নয়। কারণ লোকদেরকে খোদার পরিবর্তে নিজের গোলাম ও দাসানুদাসে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ কোনো নবীকে পাঠাননি, বরং তাদেরকে খোদার বিধানের অনুগত করে তোলাই হচ্ছে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য—

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة - ثم
يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربانيين [৯]

লোকদেরকে নিজের ব্যক্তিগত খাহেশাতের অনুবর্তী বানানো এবং তাদের ওপর ব্যক্তিগত মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় কোনো নবী আসেননি। তাদেরকে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বের শিকলে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে সম্পূর্ণ অসহায় করে ফেলা, নিজের মতের প্রতিকূল মত পোষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং তাদের মন-মগজকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা কখনো নবী আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো না। কারণ এ হচ্ছে মূলতঃ গায়রুল্লাহরই দাসত্ব, আর একে নির্মূল করার জন্যেই নবী প্রেরিত হন। মানুষের গলায় মানুষ যতো গোলামীর শিকল পরিয়ে রেখেছে, সেগুলোকে ছিন্ন করাই নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য

و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم [১০] মানুষের জন্যে কর্তব্য ও অধিকার নির্ণয় করা এবং জায়েজ ও না-জায়েজের মনগড়া সীমা-নির্ধারণ করার যেসব ইখ্তিয়ার মানুষ করায়ত্ত করে রেখেছিলো, সেগুলোকে ছিনিয়ে

---

(৯) এটা কোনো মানুষের কাজ নয় যে, আল্লাহতায়ালা তাকে কিতাব, 'হুকুম' ও নবূয়্যত দান করলে সে লোকদেরকে বলবে : 'তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার বান্দাহ হয়ে যাও; তা নয়, বরং বলবে : 'তোমরা খোদার বান্দাহ হও।'

(১০) এই নবী তাদের ওপর থেকে চাপানো বোঝা অপসারিত করেন এবং যেসব বন্ধনে তারা আবদ্ধ, সেগুলোকে ছিন্ন করেন।

নেয়ার জন্যেই নবী প্রেরিত হয়েছেন— ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكتاب هذا حلال وهذا حرام ১১। মানবীয় নির্দেশ ও ফয়সালার সামনে মাথা নত করার যে আপমান লাঞ্ছনা মানুষ বরণ করে নিয়েছিলো তা নিষ্কৃতি দেবার জন্যেই নবুয়্যতের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে—

ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ১২

কাজেই লোকদের গলা থেকে অন্যের বেড়ি খুলে ফেলে নিজের বেড়ি পরিয়ে দেয়া, হালাল ও হারামের সীমা-নির্ধারণ করার ইখ্‌তিয়ার অন্যের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের করায়ত্ত করা এবং স্বৈরাচারের থেকে অন্যাদেরকে অপসারিত করে নিজেই সেখানে জাঁকিয়ে বসা নবীর পক্ষে কিভাবে সঙ্গত হতে পারে? তিনি তো এহেন আচরণের জন্যেই ইহুদী ও নাসারাদের ভর্ৎসনা করেছেন— اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ১৩

কাজেই একথা তিনি কিভাবে বল্‌তে পারেন যে, এখন তোমরা খোদাকে ছেড়ে আমাকেই প্রভু বানিয়ে নাও এবং আমার খাহেশাতেরই অনুসরণ করো?

এ কারণেই আল্লাহতায়ালা নবীর মাধ্যমে বারবার এ-সত্যটি প্রচার করেছেন যে, মুমিনের প্রতি যে আনুগত্য ফরয করা হয়েছে এবং যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তো দূরের কথা, কোনো মুমিনের চুল পরিমাণ অসন্তোষ প্রকাশের অধিকার নেই, তা' মানুষ হিসেবে নবীর আনুগত্য নয়, বরং নবী হিসেবে নবীর আনুগত্য। অর্থাৎ যে জ্ঞান, যে-পথনির্দেশ, যে বিধান, যে-কানুন আল্লাহর নবী আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন, এ হচ্ছে তারই আনুগত্য। অতএব ইসলাম মানুষকে যে-আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে, মূলত তা মানুষের আনুগত্য নয়, বরং খোদার আনুগত্য।

---

(১১) তোমাদের মুখে যা' আসে, মিছামিছি তাকেই হালাল কিংবা হারাম বলে চালিয়ে দিও না।

(১২) আমাদের মধ্যে কেউ যেনো খোদার পরিবর্তে অন্য মানুষকে নিজের প্রভু না বানায়।

(১৩) তারা আলেম ও পীরদেরকে খোদার পরিবর্তে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।

انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله - (النساء - ١٦)

'হে নবী! আমরা তোমার প্রতি সত্যাশ্রয়ী কিতাব নাজিল করেছি, যাতে করে তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহর দেখানো সত্যানুসারে ফয়সালা করতে পারো।'

و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون - (المائده - ٧)

'যে-ব্যক্তি খোদার অবতীর্ণ বিধান অনুসারে ফয়সালা করেনা, মূলত সে-ই হচ্ছে জালেম।'

এই আনুগত্যের বাঁধনে অন্যান্য মানুষ যেমন আবদ্ধ, তেমনি মানুষ হিসেবে খোদ নবীও আবদ্ধ ঃ

ان اتبع الا ما يوحى الى - (الانعام - ٥)

'আমি শুধু সেই জিনিসের অনুসরণ করি, যা' আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।

এই ধরনের আরো বহু আয়াত থেকে এ-সত্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, আনুগত্য শুধু আল্লাহ্‌তায়ালার জন্যেই নির্ধারিত। আর দুনিয়ার বুক থেকে গায়রুল্লাহ্‌র দাসত্ব এবং মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্বকে চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্যেই ইসলাম এসেছে। ইসলামে মানুষ হিসেবে কোনো মানুষেরই আনুগত্যের স্থান নেই। এখানে নবীর আনুগত্য রয়েছে এই শর্তে যে, তাঁকে আল্লাহর তরফ থেকে 'হুকুম' দেয়া হয়েছে। শাসকদের আনুগত্য রয়েছে এই শর্তে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌ ও রসূলের বিধানকে জারি করবেন। আলেমদের আনুগত্য রয়েছে এই শর্তে যে, তাঁরা খোদা ও রসূলের আদেশ-নিষেধ এবং তাদের নির্ধারিত সীমারেখা সম্পর্ক লোকদের অবহিত করবেন। এদের মধ্যে কেউ যদি খোদার হুকুম পেশ করেন, তবে তার সামনে মাথা নত করা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে তার টু-শব্দটি করারও অধিকার নেই। কারণ খোদার সামেনে তার চিন্তা ও মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই। কিন্তু কেউ যদি খোদার পরিবর্তে নিজের মত পেশ করে, তবে মুসলমানের পক্ষে তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক

নয়। এ-ক্ষেত্রে তার স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার রয়েছে। সে স্বাধীনভাবে ঐক্যমত কিংবা ভিন্নমত উভয়ই পোষণ করতে পারে। এ-ব্যাপারে আলেম, নেতা ও শাসক তো দূরের কথা, খোদ নবীর ব্যক্তিগত মতের বিপরীত মত পোষণ করতেও কোনো বাধা নেই।

বস্তুতঃ নবী করীম (সা)-এর মিশনের একটি অংশ ছিলো মানুষের গলায় খোদার আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার বেড়ি পরিয়ে দেয়া আর দ্বিতীয় অংশ ছিলো তার গলা থেকে মানুষের আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার বেড়ি খসিয়ে ফেলা। নবী হিসেবে তাঁর দুনিয়ায় আসার উদ্দেশ্যের মধ্যে এই দু'টি কাজই শামিল ছিলো আর দু'টিরই গুরুত্ব ছিলো সমান। প্রথম কাজটি সম্পাদনের জন্যে নবী হিসেবে সমস্ত মুসলমানকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও শর্তহীন আনুগত্যে বাধ্য করার প্রয়োজন ছিলো। কারণ তাঁর আনুগত্যের ওপরই ছিলো খোদার আনুগত্য নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কাজটি সম্পাদনের জন্যে সর্বাগ্রে তাঁর নিজেরই কাজ ও আচরণ দ্বারা একটি সত্য মুসলমানদের অন্তর্নিবিষ্ট করে দেয়া একান্তই প্রয়োজন ছিলো। তা' হলো এই যে, মানুষের এমনকি, মানুষ হিসেবে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্‌র আনুগত্য করাও মুসলমানদের পক্ষে কর্তব্য নয়। তাদের আত্মা মানুষের গোলামী থেকে সম্পূর্ণ আজাদ। বস্তুত এটি ছিলো অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক কাজ। একটি মাত্র সত্তার মধ্যে নবুয়্যত ও মনুষ্যত্ব এই দু'টি মর্যাদার সমাবেশ ঘটেছিলো এবং এ দু'টিকে কোনো স্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা পার্থক্য করাও সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূল আল্লাহ্‌র দেয়া হিকমত ও বিচক্ষণতার বলে এ কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। একদিকে তিনি নবী হিসেবে এমন আনুগত্য লাভ করেন যে, দুনিয়ার ইতিহাসে কখনো কোনো নেতারই তেমন অনুগত্য করা হয়নি। অপরদিকে মানুষ হিসেবে তিনি তাঁর উৎসর্গপ্রাণ অনুবর্তীদেরকে মত-প্রকাশের এমন স্বাধীনতা দান করেন যে, দুনিয়ার কোনো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নেতাও তাঁর অনুগামীদের তেমন স্বাধীনতা দান করেননি। বস্তুত নবী হিসেবে নিজের অনুবর্তীদের ওপর তাঁর কতোখানি কর্তৃত্ব ছিলো এবং মুসলমানরা তাঁর প্রতি কতো প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করতো, এটা যদি কেউ তলিয়ে চিন্তা করে এবং সেই সঙ্গে এমনি জবরদস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও তিনি কিভাবে সামাজিক কাজ-কারবারে নিজের পয়গম্বরী ও মানবীয় মর্যাদাকে পৃথক করে

রাখতেন—নবী হিসেবে নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করার সাথে-সাথে মানুষ হিসেবে লোকদেরকে মত প্রকাশের কিরূপ পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দান করতেন এবং নিজের ব্যক্তিগত মতের বিপরীত মত পোষণের ব্যাপারে তাদেরকে কিরূপ উৎসাহ দিতেন, এটা যদি কেউ লক্ষ্য করে, তবে সে মানতে বাধ্য হবে যে, এহেন উন্নত মানের আত্মসংযম, বিস্ময়কর বিচার-শক্তি ও পূর্ণাঙ্গ বিচক্ষণতা একমাত্র নবীর মধ্যেই থাকা সম্ভবপর। এখানে এসে মনে হয়, নবীর ব্যক্তিসত্তা আলাদা হওয়া সত্ত্বেও তা' যেনো পয়গম্বরী সত্তার ভেতর বিলীন হয়ে যায়। নবী ব্যক্তিগতভাবেও পয়গম্বরীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যখন ব্যক্তিগতভাবে কাজ করেন, তখন নিজের অনুবর্তীদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ফুঁকে দেন, তাদেরকে নির্ভুল গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রশিক্ষণ দান করেন। মানুষের সামনে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার পদ্ধতি তাদেরকে শিখিয়ে দেন। তাদেরকে বাত্‌লে দেন যে, কোনো মানুষের মুকাবিলায় তাদের স্বাধীন মত পোষণের অধিকার রয়েছে। এমনকি, যে পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং বিশাল ব্যক্তিত্বকে তারা খোদার পয়গম্বর হিসেবে উচ্চতম কর্তৃত্বের আসনে বসাতে বাধ্য, তাঁর মুকাবিলায়ও তাদের মত পোষণের পূর্ণ আজাদী রয়েছে। নবী ছাড়া অন্য কেউ লোকদের ওপর এমনি পূর্ণাঙ্গ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারলে সে অবশ্যই তাদেরকে নিজের গোলাম বানিয়ে নেবে এবং তাদের ওপর পীর-পণ্ডিত ও রাজা-বাদশাদের মতোই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসবে।

হযরত বলেছেনঃ

انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به و اذا امرتكم بشيء من رائي فانما انا بشر-

'আমিও একজন মানুষমাত্র। আমি যখন তোমাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে কোন আদেশ দেই তা' মেনে নিও। আর যখন নিজের মন থেকে কিছু বলি তো জেনে রেখো, আমিও একজন মানুষ মাত্র।'

একবার হযরত মদীনার কৃষকদেরকে খেজুর চাষ সম্পর্কে একটা পরামর্শ দেন। লোকেরা সেই পরামর্শ অনুসারে কাজ করলো। কিন্তু তাতে কোনো উপকার হলো না। এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বললেনঃ

اني انما ظننت ظنا و لا تواخذوني بالظن و لكن اذا احدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لم اكذب على الله-

'আমি তো অনুমান করে একটি কথা বলেছিলাম। তোমরা আমার অনুমান ও ব্যক্তিগত মতগুলো গ্রহণ করো না। অবশ্য আমি খোদার তরফ থেকে কিছু বললে তা' গ্রহণ করো; কারণ আমি খোদার ওপর কখনও মিথ্যা আরোপ করি না।'

বদর যুদ্ধের সময় হযরত প্রথমে যেখানে শিবির স্থাপন করলেন, সে জায়গাটি মোটেই উপযুক্ত ছিলো না। হযরত হাব্‌বাব ইবনে মান্‌জার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,'এ-জায়গাটি কি অহীর সাহায্যে নির্বাচিত করা হয়েছে না শুধু যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে করা হয়েছে'? হযরত বললেন ঃ 'অহীর সাহায্যে নয়'। হাব্‌বাব বললেন ঃ 'তাহলে আমার মতে সামনে এগিয়ে অমুক জায়গায় শিবির স্থাপন করা উচিত'। হযরত তাঁর মতই গ্রহণ করলেন এবং সেই অনুসারে কাজ করলেন।

বদরের যুদ্ধ-বন্দীদের সম্পর্কে হযরত সাহাবাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং নিজেও জামায়াতের একজন সাধারণ সভ্য হিসেবে মত প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে হযরত উমর (রা) নবী করীম এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মত থেকে অসঙ্কোচে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। এ-ঘটনার কথা তামাম ইতিহাস গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই মজলিসে হযরত তাঁর আপন জামাতা আবুল আ'সের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন এবং সাহাবাদেরকে বলেন যে, তোমাদের সম্মতি থাকলে এর কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে যে-হারটি গ্রহণ করা হয়েছে তা' একে ফেরত দেওয়া হবে। সাহাবাগণ সানন্দে অনুমতি দিলে তিনি হারটি আবুল আ'সকে ফেরত দেন।

খন্দক যুদ্ধকালে হযরত বনী গাতফানের সঙ্গে সন্ধি করার মনস্থ করেন। আনসার প্রধানগণ বললেন ঃ 'এ-সিদ্ধান্ত অহীর ভিত্তিতে হলে তো কোনো কথাই নেই। আর যদি হযরত নিজের মতানুসারে এটা করতে চান তো এ-ব্যাপারে আমাদের ভিন্ন মত রয়েছে।' হযরত তাঁর মতই গ্রহণ করলেন এবং নিজ হাতে সন্ধিপত্রের খসড়াটি ছিঁড়ে ফেললেন।

হোদাইবিয়ার সন্ধিকালে দৃশ্যতঃ চাপে পড়ে সন্ধি করা মুসলমানদের পক্ষে মোটেই মনোপুত ছিলোনা। হযরত উমর (রা) তো প্রকাশ্যভাবেই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু হযরত যখন বললেন যে, এ-কাজ আমি খোদার পয়গম্বর হিসেবেই করছি, তখন ইসলামী সম্ভ্রমের কারণে মনে মনে সবাই ক্ষুব্ধ থাকলেও কেউ মুখ ফুটে কিছু বলবার সাহস পেলেন

না। এমনকি নবী হিসেবে গৃহীত হযরতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন—এ ভুলের জন্যে হযরত উমর (রা) মৃত্যু পর্যন্ত নানাভাবে অনুতাপ করে গিয়েছেন।

হোনাইন যুদ্ধের সময় গনীমতের মাল বণ্টনের ব্যাপারে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের প্রতি হযরত যে উদারতা প্রদর্শন করেন, তাতে আনসারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত তাদেরকে কাছে ডাকেন। তিনি নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে এ কথা বললেন না যে, আমি খোদার নবী, আমার যা' ইচ্ছা করবো; বরং তাদের সামনে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করলেন—একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধান তাঁর বিরোধী মতপোষণকারীদের সামনে যেভাবে করে থাকেন। এ বক্তৃতায় তিনি নবুয়্যাতের প্রতি তাদের ঈমানকে আবেদন করলেন না, বরং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তির কাছে আবেদন জানালেন। এভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করে তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

এটা তো হচ্ছে সমাজের উচুস্তরের লোকদের সাথে ব্যবহারের কথা। কিন্তু নবী করীম (সা) গোলাম ও বাঁদীদের মধ্যে পর্যন্ত আজাদীর প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। বারীরাহ নাম্নী এক বাঁদী তার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু স্বামী ছিলো তার ভালবাসায় অধীর। সে স্ত্রীর পিছনে আকুলি-বিকুলি করে ফিরছিলো। নবী করীম (সা) বললেনঃ 'তুমি স্বামীর কাছে ফিরে গেলে ভালো হতো'। সে জিজ্ঞেস করলোঃ 'ইয়া রসূলুল্লাহ। আপনি কি আমায় আদেশ দিচ্ছেন?' তিনি বললেনঃ 'আদেশ নয়, বরং সুপারিশ করছি।' সে বললোঃ 'যদি সুপারিশ হয় তো আমি ওঁর কাছে যেতে চাই না।'

এ-ধরনের বহুতরো দৃষ্টান্ত থেকে প্রতিভাত হয় যে, হযরত কোনো বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী কথা বলছেন—এটা যখনি অনুমান কিংবা তাঁর স্পষ্টোক্তি থেকে বোঝা যেতো, সাহাবারা অমনি সে ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতেন। আর এই স্বাধীন মত ব্যক্ত করার ব্যাপারে হযরত নিজেই তাদের উৎসাহ প্রদান করতেন। এরূপ ক্ষেত্রে মতদ্বৈততা করা শুধু সঙ্গতই ছিলোনা, তাঁর কাছে পছন্দনীয়ও ছিলো। এমনকি তিনি কখনো কখনো নিজের মত প্রত্যাহারও করতেন।

এবার হযরত জায়েদের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। হযরতের সাথে তাঁর কয়েক রকমের সম্পর্ক ছিলো। একটি সম্পর্ক হলোঃ হযরত ছিলেন

তাঁর নেতা আর তিনি ছিলেন হযরতের অনুগামী। দ্বিতীয় সম্পর্ক হলোঃ হযরত ছিলেন তাঁর শ্যালক আর তিনি ছিলেন হযরতের ভগ্নিপতি। তৃতীয় সম্পর্ক হলোঃ হযরত ছিলেন তাঁর অভিভাবক আর তিনি ছিলেন হযরতের প্রতিপালিত। স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও না হবার দরুন তিনি তাকে তালাক দেবার মনস্থ করেন। এমতাবস্থায় প্রত্যেক শ্যালক তার ভগ্নিপতিকে এবং অভিভাবক তার প্রতিপালিতকে স্বভাবতই যে-পরামর্শ দিতে পারে তিনি সেই পরামর্শই দেন। অর্থাৎ খোদাকে ভয় করো এবং স্ত্রীকে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকো। কিন্তু মেজাজের যে পার্থক্যের দরুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়েছিলো, তা' হযরত জায়েদই বেশী অনুভব করতে পারতেন। এটা তাঁর দ্বীন ও ঈমানের নয়, বরং আত্মানুভূতির ব্যাপার ছিলো। এই কারণে তিনি হযরতের পরামর্শ গ্রহণ না করে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। এই অবাধ্যাচরণটা রসূলের বিরুদ্ধে ছিলোনা—হযরতও রসূলে খোদা হিসেবে পরামর্শ দেননি। এ কারণেই তিনি জায়েদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি, খোদাও অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। যদি হযরতের পরিবর্তে অপর কোনো লোক হতো আর সে কাউকে ছেলেবেলা থেকে প্রতিপালন করতো, তার প্রতি নানাভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতো, এমনকি শেষ পর্যন্ত গোলামীর দ্বারা কলঙ্কিত হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে নিজের বোন বিবাহ দিতো আর তারপর বারণ করা সত্ত্বেও তার বোনটি তালাক দিয়ে ফেলতো—তবে সে অবশ্যই অসন্তোষে ফেটে পড়তো। কিন্তু হযরত শুধু অভিভাবক আর শ্যালকই ছিলেন না, বরং রসূলে খোদাও ছিলেন। আর রসূল হিসেবে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করানো এবং মানুষের সামনে মানুষের হৃত আজাদীকে ফিরিয়ে দেওয়াও তাঁর কর্তব্য ছিলো। এ কারণেই তিনি আদেশ না দিয়ে বরং পরামর্শ দেন এবং সে পরামর্শের বিপরীত কাজ করায় আদৌ কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, তাঁর ভিতরে পয়গম্বরী সত্তা ও মানবীয় সত্তা আলাদা-আলাদাভাবেও বর্তমান ছিলো। আবার পরস্পর সম্পৃক্তও ছিলো। এই দু'টি ক্ষমতার প্রয়োগে তিনি এমনি বিস্ময়কর ভারসাম্য স্থাপন করেছিলেন যে, একজন নবীর পক্ষেই শুধু তেমনি ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর। মানুষ হিসেবেও তিনি এমনিভাবে কাজ করতেন যে, নবুয়্যাতের দায়িত্বও তার ভিতর দিয়ে পালন হয়ে যেতো।

বস্তুত মহানবীই সর্বপ্রথম দুনিয়ায় স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করে-ছিলেন এবং স্বীয় কাজ ও আচরণ দ্বারা নিজের অনুবর্তীদেরকে খোদায়ী বিধানের আনুগত্যের সাথে সাথে মানুষের সামনে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। এরি ফলে দেখা যায়, সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সমস্ত মানুষের চাইতে বেশী খোদায়ী বিধানের অনুগত এবং সবার চাইতে বেশী স্বাধীন চিন্তাশীল ও গণতন্ত্রবাদী। তাঁরা কোনো বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনেও নিজেদের স্বাধীন মতামতকে বিসর্জন দিতেন না। কোনো বিরাট ব্যক্তিত্বের অভিমত বলেই কোনো অভিমতকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করতে হবে—তাঁদের মনমস্তিষ্কে এমনিতরো ধারণার কোনো স্থানই ছিলোনা। তাঁদের মধ্যে যিনি বিরাট ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর বিরাটত্বকে তাঁরা নিজেরা স্বীকার করতেন, এবং যার বিরাটত্ব আজ গোটা দুনিয়া স্বীকার করছে—তার মতামতকেও তাঁরা শুধু তাঁর বিরাটত্বের কারণেই গ্রহণ করেননি, বরং স্বাধীনভাবে তা' বর্জনও করেছেন, গ্রহণও করেছেন। নবী করীম (সা)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন এই স্বাধীন মত পোষণের সবচাইতে বড়ো সমর্থক। তাঁরা আপন মনিবের আনুগত্যের ব্যাপারে লোকদের আজা-দীকে শুধু স্বীকৃতিই দেননি, বরং তার উৎসাহও দিয়েছেন। তাঁরা কোনো তুচ্ছতম ব্যক্তির কাছেও এ দাবি করেননি যে, আমরা বিরাট লোক, কাজেই আমাদের কথা নিঃশব্দে মেনে নাও।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের শাসকরা চিন্তার স্বাধীনতাকে ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, জুলুম-পীড়ন ও অর্থবলের সাহায্যে সর্বতোভাবে খর্ব করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাবেঈন ও তাবে'-তাবেঈন এবং তাঁদের পরও সুদীর্ঘকাল যাবত মুসলমানদের মধ্যে এই ভাব-ধারাটি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিলো। প্রথম দিককার দুই-তিন শতক পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে এর অত্যন্ত উজ্জ্বল নিদর্শনাদি লক্ষ্য করা যাবে। শাসক ও কর্তাব্যক্তিদের সামনে স্বাধীন মত প্রকাশ করা তো তুলনামূলকভাবে একটি তুচ্ছ জিনিস। আত্মা ও মস্তিষ্কের যথার্থ স্বাধীনতার পরিচয় হলো এই যে, মানুষ যাকে পবিত্র মনে করবে, যার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব তার অন্তরের নিভৃততম কোণে গিয়ে বদ্ধমূল হবে, তারও অন্ধ অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং তার সামনে স্বাধীনভাবে ভাববে ও স্বাধীনভাবে মত স্থির করবে। এহেন ভাবধারাই আমরা ঐ যুগের আলেম সমাজের মধ্যে দেখতে পাই।

সাহাবায়ে কেরামের চাইতে বেশী সম্মানিত ব্যক্তি আর কে হতে পারে? আর তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা তাবেঈনের চাইতে বেশী আর কার অন্তরে থাকতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা স্বাধীনভাবে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের সমালোচনা করতেন, তাঁদের মতানৈক্যগুলোকে বাছ-বিচার করতেন এবং একজনের মত ছেড়ে অন্যের মত গ্রহণ করতেন। তাঁদের এই মতানৈক্যের ব্যাপারে ইমাম মালেক কতোখানি স্পষ্টভাবে বলছেন ঃ خطاء وصواب فانظروا فى ذالك সাহাবাদের মতামতে ভুলও রয়েছে, নির্ভুল জিনিসও রয়েছে ঃ তোমরা নিজেরা চিন্তা করে মত স্থির করো।' এমনিভাবে ইমাম আবু হানিফা বলছেন احدا لقولين خطاء والمائم فيه موضوع---'দুটি ভিন্ন উক্তির মধ্যে একটি অবশ্যই ভুল হবে।'

তাছাড়া স্বয়ং এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যেও কেউ দাবি করেননি যে, আমরা ভুলের উর্ধ্বে, সুতরাং তোমরা বিচার-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে শুধু আমারই মতের অনুসরণ করো। সাইয়েদেনা আবুবকর সিদ্দীক কোন বিষয়ে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কথা বললে সঙ্গে বলে দিতেন ঃ هذا رائى فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطا فمنى واستغفر الله ---'এটা আমার মত; নির্ভুল হলে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, ভুল হলে আমারই ত্রুটি এবং আমি খোদার কাছে মাগফেরাত কামনা করছি।'

হযরত উমর ফারুক বলেন ঃ لا تجعلوا خطاء الراى سنة للامة 'মতের ভ্রান্তিকে উম্মতের জন্যে সুন্নত বানিওনা।

হযরত ইবনে মস্‌উদের উক্তি হচ্ছে ঃ الا لا يقلدن احدكم دينه رجلا ان امن امن وان كفر فانه لا اسوة فى الشر 'সাবধান! নিজের দ্বীনের ব্যাপারে কেউ অন্যের অন্ধ অনুসরণ করোনা, যাতে করে সে মুমিন হলো তো তুমিও মুমিন রইলে আর সে কাফের হলো তো তুমিও কাফের হয়ে গেলে। অন্যায় ও ভ্রান্তির কাজে কারো অনুসরণ করতে নেই।'

ইমাম মালেক বলছেন ঃ انما انا بشر اخطى واصيب فانظروا فى رائى فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلمالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه---'আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার মত ভুলও হয়, নির্ভুলও হয়। তুমি আমার মতামত সম্পর্কে চিন্তা করো; তাতে যা' কিছু কিতাব ও সুন্নাহ মাফিক পাও তা' গ্রহণ করো আর যা' তার বিপরীত দেখো, তা' বর্জন করো।' এই ইমাম মালেকেরই একটি ঘটনা ইতিহাসে

বর্তমান রয়েছে। আব্বাসীয় খলীফা মনসুর তাঁর 'আল মুয়াত্তা' (الموطا) নামক গ্রন্থকে গোটা ইসলামী জাহানের কর্মবিধি বানাতে চেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত ফিকহী মজহাবকে রহিত করে শুধু মালেকী মজহাবকে চালু রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব নিজেই তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখেন; কারণ চিন্তা-গবেষণা, মতামতের স্বাধীনতা ও ইজতিহাদ করার ব্যাপারে অন্যের অধিকার হরণ করতে তিনি মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না।

ইমাম আবু ইউসুফ বলছেন: لايحل لاحدان يقول مقالتنا حتى يعلم من اين قلنا—'আমাদের উক্তির উৎস কি, এটা না জানা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে শুধু আমাদের উক্তির সমর্থক হয়ে দাঁড়ানো আদৌ সঙ্গত নয়।'

ইমাম শাফেয়ী বললেন, مثل الذى يطلب العلم بلاحجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه افعى تلدغه وهو لا يدرى ---যে ব্যক্তি দলিল-প্রমাণ ছাড়াই জ্ঞান অর্জন করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন: এক ব্যক্তি রাতের বেলায় কাঠ কুড়াচ্ছে। সে কাঠের বাণ্ডিল তুলে নিচ্ছে, অথচ তার জানা নেই যে, বাণ্ডিলের মধ্যে সাপ লুকানো রয়েছে যা তাকে কামড়ে দেবে।

নবী করীম (সা) তাঁর অনুবর্তীদের মধ্যে ইজতিহাদ ও অনুসন্ধান, চিন্তা ও দৃষ্টির স্বাধীনতা এবং অবাধ সত্য জিজ্ঞাসার যে ভাবধারা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, প্রায় তিন শতক পর্যন্ত তা' মুসলমানদের মধ্যে পূর্ণ মর্যাদার সাথে বেঁচে ছিলো। তারপর শাসক, আলেম ও পীরদের স্বেচ্ছাচার সে-ভাবধারাকে হরণ করতে শুরু করে দিলো। চিন্তাশীল লোকদের থেকে চিন্তা করার অধিকার, চক্ষুষ্মান লোকদের থেকে দেখবার অধিকার এবং বাক্‌শক্তিসম্পন্ন লোকদের থেকে কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হলো। রাজদরবার থেকে শুরু করে মাদ্রাসা ও খানকাহ্ পর্যন্ত সর্বত্র মুসলমানদেরকে যথারীতি গোলামীর প্রশিক্ষণ দান শুরু করা হলো। তাদের ওপর মন, মগজ, আত্মা ও দেহের গোলামী পুরাদস্তুর কর্তৃত্বশীল হয়ে বসলো। রাজদরবারীরা নিজেদের সামনে রুকু ও সিজদা করিয়ে গোলামীসুলভ মানসিকতার সৃষ্টি করলো। মাদ্রাসাচালকরা খোদাপরস্তির সাথে লোক-দের মন-মগজে পূর্বসূরী পূজার হলাহল ঢেলে দিলো। খানকাহ্‌ধারীরা 'বাইয়াত'-এর সুন্নাহসম্মত প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে মুসলমানদের গলায়

দাসত্বের এমন বেড়ি পরিয়ে দিলো; যার চাইতে অধিক ভারী ও কঠিন বেড়ি সম্ভবতঃ মানুষের জন্যে আর কখনো তৈরী করেনি। এইভাবে গায়-রুল্লাহ্‌র সামনে আভূমি লোকদের মাথা নত হতে লাগলো। গায়রুল্লাহ্‌র সামনে নামাজের ন্যায় হাত বাঁধা শুরু হলো। মানুষের সামনে চোখ তুলে তাকানো অশিষ্টাচার হয়ে দাঁড়ালো। মানুষের হাত-পায়ে চুম্বন দেয়ার রীতি চালু হলো। মানুষ মানুষের প্রভু ও অন্নদাতা হয়ে বসলো। মানুষ নিজেই নিজেকে আদেশ-নিষেধের নিরঙ্কুশ মালিক এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের কর্তৃত্ব থেকে বে-নিয়াজ ঘোষণা করলো। মানুষকে দোষ-ত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত বলে বিবেচনা করা হলো। মানুষের আদেশ ও তার মতামতকে বিশ্বাসের দিক থেকে না হলেও কার্যত খোদার হুকুমের মতোই অবশ্য পালনীয় আখ্যা দেয়া হলো। আর এভাবেই الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا اربابا من دون الله আয়াতে যে আহবান জানানো হয়েছিলো তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হলো। এরপর আর কোনো নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত উন্নতিরই সম্ভাবনা বাকী রইলোনা; বরং অবনতি ও অধঃপতন হচ্ছে এর অনিবার্য পরিণতি।

উদারনীতি

যদি একটি জিনিসকেই একব্যক্তি কালো, দ্বিতীয় ব্যক্তি সাদা, তৃতীয় ব্যক্তি হলুদ এবং চতুর্থ ব্যক্তি লাল বলে, তবে এই চারটি মতই যুগপৎ সত্য হবে—এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে যদি একটি কাজকেই এক জনে মন্দ, অন্যজনে ভালো জানে, একজনে তা' নিষেধ করে, অন্যজনে তার আদেশ দেয়, তবে উভয় মতই নির্ভুল হবে, উভয়েই সত্যাশ্রয়ী হবে এবং আদেশ ও নিষেধের স্পষ্ট বৈপরিত্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের আদেশ যথার্থ হবে—এটাও কিছুতেই সম্ভবপর নয়। যে ব্যক্তি এমনি পরস্পর বিরোধী উক্তিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এমনি পরস্পর বিরোধী বিধিনিষেধকে সত্যাশ্রয়ী ঘোষণা করে, তার এ কাজের দু'টি ব্যাখ্যাই হতে পারে ঃ হয় সে সবাইকে খুশী করতে ইচ্ছুক, নচেৎ সে এ-বিষয়ে কোনো চিন্তাই করেনি, বরং কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সে মতপ্রকাশ করে ফেলেছে। মোটকথা উভয় অবস্থাই বিচার-বুদ্ধি ও সততার একেবারে পরিপন্থী আর বিভিন্ন মতের লোকদেরকে সত্যাশ্রয়ী বলে বিশ্বাস করা কোনো বুদ্ধিমান ও সত্যপ্রিয় লোকের পক্ষে কোনো কারণেই শোভনীয় হতে পারে না।

সাধারণত লোকদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, দশজন বিভিন্ন মতপোষণকারী লোকের বিভিন্নরূপ ও পরস্পর বিরোধী মতবাদকে যথার্থ ঘোষণা করাই হচ্ছে 'উদারতা'। কিন্তু আসলে এটা উদারতা নয়, বরং ঠিক মুনাফেকী। উদারতার অর্থ হলো ঃ যেসব লোকের বিশ্বাস ও আচরণ আমাদের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত, তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা, তাদের

---

(১) প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালের জুন সংখ্যা 'তর্জুমানুল কোরআন' পত্রিকা থেকে গৃহীত।
—সম্পাদক

অনুভূতিকে সমীহ করা, তাদের পক্ষে পীড়াদায়ক সমালোচনা থেকে বিরত থাকা এবং তাদেরকে বিশ্বাস ত্যাগ করানো ও তাদের কাজের পথে বাধা সৃষ্টির জন্যে বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন না করা। এই ধরনের সহন-শীলতা এবং এভাবে লোকদেরকে বিশ্বাস ও কাজের স্বাধীনতা দেয়া শুধু একটি মহৎ দৃষ্টান্তই নয়, বরং বিভিন্ন মতপোষণকারী জাতিগুলোর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যেও এটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিজেরা একটি আকীদা পোষণ করা সত্ত্বেও কেবল অন্য লোকদেরকে খুশী করার জন্যে তাদের বিভিন্নরূপ বিশ্বাসকে সত্য-জ্ঞান করা এবং নিজেরা একটি কর্মনীতির অনুগামী হয়েও অন্যান্য নীতির অনুগামীদেরকে সত্যাশ্রয়ী বলা পরিষ্কার মুনাফেকী; আর এহেন মুনাফেকীসুলভ মতপ্রকাশকে কোনক্রমেই উদারতা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ যুক্তিসঙ্গত কারণে নীরবতা অবলম্বন করা আর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকা উচিত।

বস্তুত ইসলাম আমাদেরকে সঠিক উদারনীতি শিক্ষা দিয়েছে। আমা-দেরকে বলা হয়েছে ঃ

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم -
كذلك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما
كانوا يعملون - (انعام - ١٠٣)

'এরা খোদাকে ছেড়ে আর যেসব উপাস্যকে ডাকে, তাদের নিন্দাবাদ কোরোনা; কারণ তার জবাবে অজ্ঞতাবশত এরা অহেতুক খোদাকে গালাগাল করবে। এভাবেই আমরা প্রত্যেক জাতির কর্মধারা সুন্দর করে দিয়েছি। অতঃপর তাদের সবাইকে আপন প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদের প্রভু জানিয়ে দেবেন যে, তারা কিরূপ কাজ করেছে।'

والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما -

(مؤمنون - ٦)

'খোদার সৎ বান্দাহ হচ্ছে তারাই, যারা মিথ্যা ব্যাপারে সাক্ষী হয় না'[১] আর যখন কোনো অসঙ্গত কাজের পাশ দিয়ে চলে, তখন আত্মমর্যাদার সাথে চলে।'

قل يا يها الكفرون لا اعبد ما تعبدون و لا انتم عبدون ما اعبد
و لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عبدون ما اعبد - لكم دينكم
و لى دين - (الكفرون)

'হে নবী! তাদেরকে বলে দাওঃ হে কাফেরগণ! তোমরা যেসব উপাস্যকে পূজা করো, আমি তাদের পূজা করি না। আর আমি যে মাবুদের পূজা করি, তোমরা তার পূজা কর না। এমন কি তোমরা যে সব উপাস্যের পূজা করেছো, ভবিষ্যতেও আমি তাদের পূজা করবো না, আর আমি যার পূজা করি, তোমরাও তার পূজা করবে না। তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার দ্বীন আমার জন্যে।'

لا اكراه فى الدين - (البقره - ٣٣)

'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বলপ্রয়োগ নেই।'

و يدرءون بالحسنة السيئة و مما رزقنهم ينفقون - و اذا سمعوا
اللغو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا و لكم اعمالكم سلم عليكم
لا نبتغى الجاهلين - (القصص - ٦)

---

(১) সত্য বিরোধী প্রতিটি কাজই মিথ্যা পদবাচ্য। যেসব জায়গায় মুশরেকী কাজ সম্পাদিত হয়, কুফরী চিন্তাধারা প্রসারিত হয়, অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ সম্পন্ন হয়, অত্যাচার ও খোদাদ্রোহিতা অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে মূলত মিথ্যারই চর্চা করা হয়। অনুরূপভাবে যেখানে কোনো মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টিকে খোদা বানিয়ে তার সামনে মানুষ গোলামী প্রকাশ করে, সেখানেও মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই হয় না। এ হচ্ছে মিথ্যার ব্যাপক সংজ্ঞা। এই মিথ্যার সাক্ষী না হবার তাৎপর্য এই যে, এইসব কাণ্ড দেখা ও তাঁর সাক্ষী হবার জন্যে মুমিন কখনো এ ধরনের জায়গায় ইচ্ছাকৃতভাবে যাবে না।

'তারা দুষ্কৃতিকে সুকৃতি দ্বারা বিদুরিত করে, আমাদের দেয়া জীবিকা থেকে খরচ করে এবং কোন অসঙ্গত কথা শোনামাত্রই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তারা বলে ঃ আমাদের আমল আমাদের জন্যে আর তোমাদের আমল তোমো-দের জন্যে; তোমাদেরকে সালাম। আমরা জাহেল লোকদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না।'

فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب - وامرت لاعدل بينكم - الله ربنا وربكم - لنا اعمالنا ولكم اعمالكم - لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير - (الشورى - ١٠)

'অতএব তোমরা তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান জানাও এবং তোমাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী স্বকীয় আদর্শের ওপর অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। তাদের কামনা বাসনার আদৌ অনুসরণ কোরোনা, বরং বলো ঃ আমি আল্লাহর দেয়া কিতাবের প্রতি ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমদেরও প্রভু, তোমাদেরও। আমা-দের আমল আমাদের জন্যে তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। তাঁর দিকেই সবার ফিরে যেতে হবে।'

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن - (النحل - ٦)

'তোমার প্রভুর পথে হিকমত ও সুন্দর নসীহতের সঙ্গে লোকদের ডাকো এবং তাদের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করো।'

বস্তুত একজন সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এমনি উদারনীতিই অবলম্বন করতে পারে। এমন ব্যক্তি যে আদর্শকে

নির্ভুল মনে করবে, তার ওপর কঠোরভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, নিজের মত-বিশ্বাস স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও প্রচার করবে, অন্যদেরকে সে মতাদর্শের দিকে আহবানও জানাবে, কিন্তু কারো মনেই সে আঘাত দেবে না। কারো প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করবে না। কারো মত-বিশ্বাসের ওপর হামলা চালাবে না। কারো পূজা-উপাসনা ও ক্রিয়াকর্মে বাধা সৃষ্টি করবে না। কাউকে জবরদস্তি নিজের আদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করবে না। এরপর বাকী থাকে শুধু সত্যকে সত্য জেনেও সত্য না বলা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বুঝেও সত্য বলে চালানোর বিষয়টি। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো সত্যাশ্রয়ী মানুষেরই কাজ হতে পারে না।

বিশেষত লোকদেরকে খুশী করার জন্যে এরূপ কাজ করা তো নিতান্তই নিকৃষ্ট ধরনের তোষামোদ। এহেন তোষামোদ শুধু নৈতিক দৃষ্টিতেই ঘৃণ্য নয়, বরং যে-উদ্দেশ্যে মানুষ এতোটা নিম্নস্তরে নেমে আসে, সে উদ্দেশ্য কখনো সফলকাম হয় না। কোরআন সুস্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى - ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا نصير - (البقره - ١٥)

'ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমাদের প্রতি আদৌ খুশী হবেনা, যতোক্ষণ না তোমরা তাদের মিল্লাতের অনুবর্তী হবে। (হে নবী!) বলে দাও যে, আল্লাহর পথই হচ্ছে সোজা পথ। নচেত তুমি ইলম্ লাভ করার পরও যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো, তাহলে খোদার হাত থেক বাঁচাবার জন্যে কোনো সমর্থক ও সাহায্যকারীই তুমি পাবেনা।'

অবশ্য মিথ্যা উদারনীতি সাধারণত রাজনৈতিক স্বার্থেই প্রচার করা হয়, আর বর্তমান যুগে এটা 'সঙ্গত' কাজ বলেই গণ্য, কারণ পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় বহু পূর্বেই রাজনীতি ও নৈতিকতাকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে সকল 'গবেষক' বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে আদৌ

কাজে না লাগিয়েই নিজেদের ধর্মীয় গবেষণা থেকে এই অভিনব মতবাদ দাঁড় করিয়েছেন যে, 'সমস্ত ধর্মই সত্যাশ্রয়ী'—তাদের অবস্থাটা সত্যিই পরিতাপ জনক। কারণ যেসব ব্যক্তি দাবি করেন যে, যুক্তির মানদণ্ডে যাচাই না করা পর্যন্ত আমরা কোনো কথা উচ্চারণ কিংবা স্বীকার করিনা, সেই সব যুক্তিবাদীদের মুখ থেকেই এ-কথাটি শোনা যায়। যুক্তির মানদণ্ড তাদের এই অভিনব আবিষ্কারটিকে তিল পরিমাণ গুরুত্ব দিতেও সম্মত নয়। যে বিভিন্ন ধর্মকে যুগপৎ সত্যাশ্রয়ী বলে সার্টিফিকেট দেয়া হয়, তাদের মূলনীতিতে দিন আর রাত্রির মতোই স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাদের একটি বলে, খোদা একজন। দ্বিতীয়টি বলে, দুজন। তৃতীয় বলে, তিনজন। চতুর্থটি বলে; বহুতরো শক্তি খোদায়ীর অংশীদার। আর পঞ্চটিতে আদৌ খোদা সম্পর্কিত ধারণার অস্তিত্ব নেই। এই পাঁচটি মতই কি সত্য হতে পারে? একটি মানুষকে খোদার স্থানে উন্নীত করে। দ্বিতীয়টি খোদাকে টেনে মানুষের মধ্যে নামিয়ে আনে। তৃতীয়টি মানুষকে বান্দাহ আর খোদাকে মনিব ঘোষণা করে। আর চতুর্থটি বান্দাহ ও মনিবের ধারণা থেকেই মুক্ত। সততার দৃষ্টিতে এই চারটি মতকে একত্র করার কি অবকাশ আছে? একটি মানুষের মুক্তিকে কাজের ওপর নির্ভরশীল মনে করে। দ্বিতীয়টি মুক্তির জন্যে ঈমানকেই যথেষ্ট মনে করে। তৃতীয়টি ঈমান ও আমল উভয়কেই মুক্তির জন্যে শর্ত আরোপ করে। এই তিনটি মত কি কি যুগপৎ সত্য হতে পারে? একটি দুনিয়া ও তার জিন্দেগীর বাইরে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টির মতে দুনিয়া ও তার জিন্দেগীর মধ্যেই মুক্তির পথ নিহিত। এই দু'টি পথই কি সমান নির্ভুল হতে পারে? এহেন পরস্পর-বিরোধী জিনিসকে সত্যের সার্টিফিকেট দানকারী বস্তুর নাম যদি বিচার বুদ্ধি হয়, তা'হলে দুই বিপরীতকে একত্র করা অসম্ভব আখ্যাদানকারী বস্তুর নাম অন্য কিছু হওয়া উচিত।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কতকগুলো ধারণাকে অভিন্ন (common) বলে মনে হয় বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সে ধারণাগুলোর মর্মমূলে পৌঁছবার কোনো চেষ্টাই করেনা, বরং শুধু উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করেই কতিপয় ভুল জিনিসকে ভুল পন্থায় সাজিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করে বসে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এই অভিন্ন রূপটি এক গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে আমাদের পথনির্দেশ করে। সে বলে দেয় যে, এই ধর্মগুলো মূলত একই কাণ্ড থেকে

নির্গত। এদের সমস্ত ধারণা ও শিক্ষার ভিত্তিমূল এক। কোনো বিশেষ জ্ঞান-উৎস বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাষায় মানুষকে এই অভিন্ন সত্যগুলোর সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্বে অবস্থিত এবং হাজার-হাজার বছরের ব্যবধান সম্পন্ন লোকেরা কোনো বিশেষ দূরদৃষ্টি লাভ করেছে। সেই দূরদৃষ্টির সাহায্যে তারা সবাই একই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কিন্তু ধর্মগুলো যখন নিজস্ব উৎস ও ভিত্তিমূল থেকে দূরে সরে যায়, তখন তাদের মধ্যে কিছু বহিরাগত ধারণা এবং নতুন মত-বিশ্বাস ও শিক্ষাদীক্ষা ঢুকে পড়ে। আর এই পরবর্তী জিনিসগুলো যেহেতু ঐ অভিন্ন উৎস এবং অভিন্ন দূরদৃষ্টি থেকে উৎসারিত ছিলোনা বরং বিভিন্নরূপ প্রকৃতি ও প্রবণতা এবং বিভিন্ন ধরনের পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী লোকদের উদ্ভাবিত ছিলো—এ কারণেই তারা ঐ অভিন্ন ভিত্তির ওপর যে-প্রাসাদগুলো গড়ে তুলেছে, তা' ডিজাইন, ধরন ও আকৃতিতে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে।

কাজেই সত্য ও যথার্থ বলে আখ্যা দিতে হলে সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত সাধারণ ভিত্তিকেই দেয়া যেতে পারে—বর্তমান ধর্মগুলোর বিভিন্ন রূপ, ধরন ও আকৃতিকে নয়। কারণ সত্য একটি নির্ভেজাল বস্তু; তার অংশগুলোর মধ্যে অনৈক্য থাকতে পারে না। আমরা যেমন কালো, সাদা, লাল, সবুজ ইত্যাদিকে সাধারণভাবে 'রঙ' বলে আখ্যা দেই, তেমনি এক খোদা, দুই খোদা ও অসংখ্য খোদা বিশিষ্ট বিভিন্ন মতবাদের ওপর 'সত্য' শব্দটি প্রয়োগ কর্‌তে পারিনা।

দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের ভিত্তিমূল এক এবং একই সত্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন জাতির সামনে প্রকাশ করা হয়েছে—একথা কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। এই কিতাবে বারবার বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই খোদার রসূল ও পয়গম্বর এসেছেন— ولقد بعثنا في كل امة رسولا (النحل-٥)

وان من امة الا خلا فيها نذير - (فاطر - ٣) এই সমস্ত নবী ও রসূল একই উৎস থেকে সত্যের বাণী লাভ করেছেন।— جاءو بالبينت والزبر والكتب المنير

(ال عمران - ١٩) لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتاب

(الحديد - ١٣) - والميزان - এঁদের সবার এই একই পয়গাম ছিলোঃ

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت - (انعام ٥)

'খোদার বন্দেগী করো এবং তামাম খোদাদ্রোহী শক্তিকে বর্জন করো।' সবার কাছে খোদার তরফ থেকে একই অহী এসেছিলোঃ

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا

انا فاعبدون - (انبياء - ٢)

'হে মুহাম্মদ! তোমার আগে আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি এই অহী নাজিল করেছি যে, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, সুতরাং তুমি আমারই বন্দেগী করো।'

তাঁদের কেউ একথা বলেননি যে, আমরা যা' কিছু পেশ করছি, তা' আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধির ফল, বরং সবাই বলেছেন যে, এ সব কিছুই খোদার তরফ থেকে আগত।

وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله - وعلى الله فليتو

كل المؤمنون - ومالنا ان لا نتو كل على الله وقد هدنا سبلنا

(ابراهيم - ٢)

'খোদার অনুমতি ছাড়া কোনো প্রমাণ নিয়ে আসার ক্ষমতা আমরা রাখিনা। যারা ঈমানদার, তারা তো খোদার ওপরই ভরসা রাখে। খোদাই যখন আমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তখন তাঁর ওপরই কেন আমরা ভরসা রাখি না।'

পরন্তু তাঁদের কেউ একথা বলেননি যে, তোমরা আমারই বন্দেগী করো, বরং সবাই বলেছেন যে, তোমরা খোদার বান্দাহ হও ঃ

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب و الحكم و النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله و لكن كونوا ربانيين -

(ال عمران - ٨)

'এটা কোনো মানুষের কাজ নয় যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, 'হুকুম' ও নবুয়্যাত দান করলে সে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার বান্দাহ বনে যাও, বরং সে একথাই বলবে যে, তোমরা খোদার বান্দাহ হও।'

বস্তুত দুনিয়ার জাতিসমূহকে তাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এই সাধারণ শিক্ষাই দান করেছিলেন।

কোরআন মজীদ বলছে যে, প্রথমত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। অর্থাৎ তারা এক খালেস মানবীয় প্রকৃতির ওপর (State of Nature) ছিলো এবং তাদের কাছে খোদার তরফ থেকে সহজ, সরল ও সত্যপথের জ্ঞান এসেছিলো।[১] তারপর তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এই মতানৈক্যের কারণ হলো, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের সঙ্গত সীমা অতিক্রম করার, নিজের স্বাভাবিক মর্যাদার চাইতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করার এবং স্বাভাবিক অধিকারের চাইতে বেশী অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলো। অতঃপর লোকদেরকে অধিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক ইনসাফ (Social Justice) প্রতিষ্ঠা করার জন্যে খোদার তরফ থেকে নবী আসতে লাগলো। দুনিয়ায় সকল নবীর এই একই মিশন ছিলো। যারা এই নবীর মিশনকে গ্রহণ করেছে, তাঁর দেয়া জ্ঞান সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে এবং নবীর প্রদত্ত আইনের অনুবর্তন করেছে, কেবল তারাই হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী আর বাকী সবাই

১। এখানে একটি সত্য অন্তনিবিষ্ট করে নেয়া দরকার যে, মানবসভ্যতা সম্পর্কে কোরআনের শিক্ষা আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ ও ইতিহাস দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোরআন বলছে যে, দুনিয়ায় মানুষের আবির্ভাব অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে হয়নি, বরং খোদার দেয়া জ্ঞানের আলোকে হয়েছিলো। খোদা সর্বপ্রথম মানুষ আদমকে পয়গম্বর বানিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে দুনি[illegible] [illegible]কভাবে বসবাস করার উপযোগী জ্ঞান দান [illegible]

মিথ্যাশ্রয়ী—যারা নবীর আনুগত্যকে অস্বীকার করেছে, তারাও মিথ্যাশ্রয়ী আর যারা নবীর শিক্ষাকে নিজস্ব খাহেশাত অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে, তারাও মিথ্যাশ্রয়ী।

وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا (يونس - ٢)

'লোকেরা আসলে একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো; অতঃপর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে।'

كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين
وانزل معهم الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا
فيه ط وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم
البينت بغيا بينهم - فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا
فيه من الحق باذنه والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم -
(بقره-٢٦٠)

'লোকেরা প্রথমে একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। (অতঃপর তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে) আল্লাহ্ তায়ালা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীদের প্রেরণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গে সত্যাশ্রয়ী কিতাবও নাজিল করেন, যাতে করে তাঁরা লোকদের মধ্যকার বিবাদমান বিষয় ফয়সালা করতে পারেন। আর লোকদের মধ্যকার এই মতানৈক্যের একমাত্র কারণ হলো, তারা একে অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিলো।[১] নচেত আল্লাহ্র তরফ থেকে তো তাদের কাছে অনেক আগেই সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এসেছিলো।

---

(১) মূল আয়াতে কোরআন بغى শব্দ ব্যবহার করেছে। এর মানে হলো, সঙ্গত সীমা লংঘন করা এবং লড়ালড়ি ও বিদ্রোহ করা। কোরআনের দৃষ্টিতে চিন্তা-বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা ও সামাজিক অবিচারের (Social Injustice) একমাত্র কারণ হলো, কিছু লোকের মধ্যে সীমা লংঘন করার প্রবণতা দেখা দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু লোক অপর লোকদের ওপর 'খোদা' হয়ে বসে এবং তাদেরকে নিজের গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করে। কতক লোক

অতঃপর যারা নবী ও কিতাবের কথা মেনে নিয়েছিলো, আল্লাহ্ তাদেরকে সত্যপথ প্রদর্শন করলেন—যে সম্পর্কে লোকদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছিলো। আল্লাহ্ যাকে চান, সত্য পথের সন্ধান দান করেন।'

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس (الحديد - ٣)

'আমরা নবীদেরকে সুস্পষ্ট পথনির্দেশ সহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে কিতাবও নাজিল করেছি আর তাদেরকে মানদণ্ড দান করেছি[১] যাতে করে লোকেরা ইনসাফপূর্ণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমরা লোহা নাজিল করেছি, যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি নিহিত রয়েছে আর লোকদের জন্যে রয়েছে উপকার।'

فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى - ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى - (طه - ٧)

'অতঃপর যে ব্যক্তি আমার দেয়া পথনির্দেশ অনুসারে চলবে, সে কখনো সৎপথ থেকে বিচ্যুত হবেনা আর ভাগ্য-বিড়ম্বিতও হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার দুনিয়ার জীবন যেমন সঙ্কীর্ণ হবে তেমনি কিয়ামতেও আমরা তাকে অন্ধ করে তুলবো।'

নিজেরা 'খোদা' হবার সাহস পায়না বটে, কিন্তু কোনো মূর্তি, কাল্পনিক দেবতা কিংবা কোনো কবরের পূজারী হয়ে বসে এবং ঐসব 'খোদা'দের দোহাই পেড়ে লোকদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব বিস্তার করে থাকে। কিছু লোক ধর্মীয় পদাধিকারী সেজে লোকদের মুক্তি ও কল্যাণের ঠিকাদার হয়ে বসে এবং এভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও পৌরহিত্যবাদের জন্ম দেয়। আবার কতক লোক নিজেদের আর্থিক সমৃদ্ধির অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে আর্থিক শোষণের নানারূপ ফন্দি উদ্ভাবন করে। মোটকথা, এই بغى বা সীমালংঘনই মানুষকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে চিন্তা-বিশ্বাস ও সামাজিক অবস্থার দিক থেকে বৈষম্য ও বিভিন্নতার মধ্যে নিক্ষেপ করে।

(১) এখানে মানদণ্ড বলা বলা হয়েছে নবীদের মাধ্যমে খোদার শরীয়াতরূপে প্রেরিত সুসম (Well Balanced) সমাজ ব্যবস্থাকে, যাতে করে মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়েম করা যেতে পারে।

এই হচ্ছে কোরআনের ইতিহাস-দর্শন কিংবা ইতিহাসের নৈতিক ব্যাখ্যা (Moral Interpretation of History)। এই দর্শন সামাজিক ও তামুদ্দুনিক বৈষম্যের মতো ধর্মীয় বিভিন্নতার রহস্যও অতি সন্তোষজনকভাবে উদঘাটন করে দেয়। এ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, দুনিয়ার সমস্ত জাতির কাছে খোদার নবী আসার উদ্দেশ্য হলোঃ বিদ্রোহাত্মক আচ-রণের (بغاوت) ফলে যে স্বাভাবিক জীবনাদর্শ থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলো, সেই আদর্শের পথেই তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে সত্য ও সুবিচারমূলক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যে বিদ্রোহাত্মক প্রবণতা তাদের ভ্রষ্টতার মূলে ক্রিয়াশীল ছিলো সে প্রবণতা তাদেরকে বারবার বাঁকা পথের দিকে চালিত করে আসছে। কাজেই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে কিছুকিছু নির্ভুল ধ্যানধারণা ও নৈতিক মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়, তা' নবীদেরই শিক্ষার অবশিষ্ট প্রভাব মাত্র—যা' নিজস্ব শক্তির বলে জাতিসমূহের মন-মানস ও তাদের জীবনধারায় মিশে রয়েছে।

এরপর কোরআন এই দাবি উত্থাপন করছে যে, যে 'ইসলামে'র দিকে সে লোকদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, তা-ই হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন'। সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই দ্বীনের পয়গামই জাতিসমূহের কাছে নবীগণ পেশ করে আসছেন। সুতরাং হযরত মুহাম্মদ (সা) কোনো অভিনব পয়গাম নিয়ে আসেননি—قل ما كنت بدعا من الرسل[১] (احقاف - ١٠) বরং প্রত্যেক নবী প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির কাছে যে পয়গাম প্রচার করেছেন, তাঁর পয়গাম ছিল ঠিক তাই—

انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده[২]

(النساء - ٢٣)

এই পয়গাম থেকে আরব, মিসর, পাক-ভারত, চীন, জাপান, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা মোটকথা দুনিয়ার কোনো ভূখণ্ডই বঞ্চিত হয়নি। সর্বত্রই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবীগণ আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে এসেছেন। খুব সম্ভব

(১) হে নবী। তাদেরকে বলে দাও যে, আমি কোনো নতুন নবী নই।

(২) আমরা তোমার কাছে সেই পয়গাম নাজিল করেছি, যা' নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি নাজিল করেছিলাম।

বুদ্ধ, কৃষ্ণ, রাম, কনফুসিয়াস, জরদশ্‌ত, মানী, সক্রেতিস, পিথাগোরাস প্রমুখ ধর্মগুরু এইসব নবীদেরই অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) এবং এই সব ধর্মগুরুদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, এঁদের প্রকৃত শিক্ষা লোক-দের মতানৈক্যের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু হযরতের দেয়া শিক্ষা অবিকলরূপে সুরক্ষিত রয়েছে।

কাজেই প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'ইসলাম' অন্যান্য ধর্মের মধ্যেকার একটি ধর্মমাত্র নয়; বরং মানব-জাতির প্রকৃত ধর্মই হচ্ছে ইসলাম আর বাকী ধর্মগুলো তারই বিকৃত রূপ মাত্র। ধর্মগুলোর মধ্যে যা'কিছু 'সত্য' লক্ষ্য করা যায়, তা' প্রকৃত ইসলামেরই অবশিষ্ট প্রভাব মাত্র—যার পয়গাম সবার কাছেই এসেছিলো এবং যা, মতানৈক্যের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই অবশিষ্ট সত্যের পরিমাণ যে ধর্মে যতোটা বেশী সে ধর্মে ততোটাই বেশি 'ইসলাম' বর্তমান রয়েছে। আর প্রকৃত 'ইসলামে'র বিরোধী যে সব অনৈক্য ও বৈষম্য রয়েছে, তা' নিশ্চিতরূপে মিথ্যা এবং বাতিল, সুতরাং সেগুলোকে 'সত্য' বলে আখ্যা দেয়া পরিষ্কার জুলুমের শামিল।

বস্তুত এহেন মিথ্যা উদারতার প্রদর্শনী করার চাইতে সমস্ত মানব জাতিকে আমাদের বলা উচিত যে, বন্ধুগণ। তোমরা জাত-বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি পরিহার করো এবং সত্য ও মিথ্যার ভেজালকে আঁকড়ে থাকার পরিবর্তে খালেস ও নির্ভেজাল সত্যকে গ্রহণ করো। প্রকৃত সত্য কোন গোত্র, জাতি বা দেশের উত্তরাধিকার নয়, বরং তা সমগ্র মানবতারই সাধারণ উত্তরাধিকার। এই উত্তরাধিকারকে বিশ্বপ্রভু সমস্ত দেশ, জাতি ও গোত্রের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা তাকে লুকিয়ে ফেলেছিলো এবং তার সাথে সৃষ্টিপূজা, জুলুম, অবিচার ও অযৌক্তিক বৈষম্যের বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলো, এটা আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্যেই একটা দুর্ভাগ্য-জনক ব্যাপার ছিলো। তোমাদের বাপদাদারা যেহেতু একটা ভুল করে বসেছিলেন, সে জন্যে তোমাদের পক্ষে খামাখা এই দুর্ভাগ্যকে আঁকড়ে থাকার পিছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা) এই উত্তরাধিকার পেয়ে হুবহু আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং এর ভেতর কোনো সৃষ্টিপূজা, কোনো জুলুমমূলক ও অবিচারমূলক রীতিনীতি অথবা কোনো অযৌক্তিক বৈষম্যের বিষ মিশ্রিত হয়নি। এটা আমাদের, তোমাদের এবং সমগ্র মানব জাতিরই পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর জন্যে তোমরা শোক্‌রিয়া

আদায় করো এবং খোদার এই অনুগ্রহ একজন আরববাসীর মাধ্যমে লাভ করছো শুধু এই অজুহাতেই এর থেকে উপকৃত হতে দ্বিধা কোরো না। হাওয়া, পানি, আলো যেমন খোদার দেয়া বিশ্বজনীন সম্পদ, সত্যও ঠিক তেমনি তাঁর এক বিশ্বজনীন সম্পদ। হাওয়া পূর্বদিক থেকে বইছে বলেই তোমরা তার জন্যে নাক বন্ধ করে রেখোনা। পানির উৎসস্থল অমুক দেশে বলেই তা' গলধঃকরণ করতে তোমরা দ্বিধাবোধ করোনা। আলোটা অমুকের প্রদীপ থেকে আসছে বলেই তার দ্বারা উপকৃত হতে তোমরা কুণ্ঠিত হয়োনা। এসব ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ না থাকে তবে মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে নির্ভেজাল সত্যের যে পরম সম্পদ তোমরা লাভ করছো, তার বাহক তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেনি বলেই তাকে গ্রহণ না করার মূলে কী কারণ থাকতে পারে।

ইসলামী জাতীয়তার প্রকৃত মর্ম

বর্তমান যুগে মুসলমানদের সমাজ সত্তা সম্পর্কে 'কওম' শব্দটি অত্যন্ত বিপুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের সামাজিক ও সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণত এই শব্দটিই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এ-এক অনস্বীকার্য সত্য—আর কোনো কোনো মহল থেকেও এর অবৈধ সুযোগ গ্রহণেরও চেষ্টা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের কোথাও মুসলমানদের জন্যে 'কওম' শব্দটিকে (কিংবা Nation এর সমার্থক অপর কোনো শব্দকে) পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। তাই কী কী মৌলিক ত্রুটির কারণে ইস্‌লাম এই শব্দগুলোকে পরিহার করেছে এবং এদের পরিবর্তে কোন্ কোন্ শব্দ কোরআন ও হাদীসে ব্যবহার করা হয়েছে—এখানে আমি সংক্ষেপে তাই বলবো। এটা শুধু একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাই নয়, বরং এর দ্বারা আমাদের ধ্যান-ধারণার বহুতর ভ্রান্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে—যার ফলে আমাদের জীবনদৃষ্টি মূলগতভাবে ভ্রান্ত হয়েছে।

'কওম' (জাতি) এবং এর সমার্থক ইংরেজী শব্দ Nation এই দু'টিই মূলত জাহেলী যুগের পরিভাষা। জাহেলী যুগের লোকেরা জাতীয়তাকে (Nationality) কখনো খালেস সাংস্কৃতিক ভিত্তির (Cultural Basis) ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি—প্রাচীন জাহেলী যুগেও নয় আর আধুনিক জাহেলী যুগেও নয়। তাদের মন মগজের শিরা-উপশিরায় বংশীয় ও ঐতিহ্যিক সম্পর্কের প্রেম পুরোপুরি বদ্ধমূল হয়ে আছে। তারা বংশীয় গোত্রীয় ও ঐতিহ্যিক সম্পর্ক থেকে জাতীয়তার ধারণাকে কখনো মুক্ত করতে পারেনি। প্রাচীন আরবে যেমন 'কওম' শব্দটি সাধারণত একটি বংশ বা গোত্র সম্পর্কে বলা হতো, আজো তেমনি 'নেশন' শব্দের ভেতর একই অভিন্ন বংশের (Common Descent) ধারণা অনিবার্যরূপে শামিল রয়েছে। এ-জিনিসটি যেহেতু মূলগত

ভাবে ইস্‌লামী সমাজ-চেতনার (Conception of Society) বিরোধী, এ কারণেই কোরআনে 'কওম' শব্দ এবং এর সমার্থক অন্যান্য আরবী শব্দ (যেমন شعب ইত্যাদি) মুসলমানদের জাতীয় সত্তার জন্যে পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। বস্তুত যে জাতির ভিত্তিমূলে রক্ত, মাটি, বর্ণ, ভাষা এবং এ-জাতীয় কোনো জিনিসের আদৌ প্রভাব ছিলো না, তার জন্যে এ-ধরনের পরিভাষা কী করে ব্যবহার করা যেতো? যে-জাতির সংগঠন ও রূপ-বিন্যাস শুধু নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে করা হয়েছিলো এবং যার সূচনাই হয়েছিলো বংশ-গোত্র ও বৈষয়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার জন্যে এ-ধরনের পরিভাষা ব্যবহার কিভাবে সম্ভব ছিলো?

কোরআন মুসলমানদের জাতীয় সত্তার জন্যে হিজব (حزب) শব্দটি ব্যবহার করেছে। এর মানে হচ্ছে দল বা পার্টি। কওম গঠিত হয় বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে আর দল হয় নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে। এই দৃষ্টিতে মুসলমান প্রকৃতপক্ষে কওম বা Nation নয়, বরং একটি দল। তারা একটি নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী—কেবল এই ভিত্তিতেই তাদের গোটা দুনিয়া থেকে পৃথক এবং পরস্পরে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেসব লোকের সাথে তাদের নীতি ও আদর্শের ঐক্য রয়েছে, তারা যে-কোনো দেশ এবং যে কোন বংশ ও গোত্রের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন, স্বভাবতই মুসলিম দলে শামিল হয়ে যাবে। আর যাদের সঙ্গে এসব বিষয়ে সাদৃশ্য নেই, তারা তাদের সঙ্গে নিকটতম বৈষয়িক সম্পর্কেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, তারা কিছুতেই মুসলিম দলভুক্ত হতে পারে না। বস্তুত কোরআন দুনিয়ার গোটা মানব সমাজকে দু'টি মাত্র দলে ভাগ করেছেঃ একটি আল্লাহর দল (حزب الله) অপরটি শয়তানের দল (حزب الشيطان)। শয়তানের দলের মধ্যে নীতি ও আদর্শের দিক থেকে যতোই বৈষম্য থাকুক না কেন কোরআন তাদেরকে একটি দলরূপেই গণ্য করেছে। কারণ তাদের চিন্তাধারা ও কর্মনীতি ইসলাম নয় আর খুঁটিনাটি বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও শয়তানের আনুগত্যের ব্যাপারে তারা সবাই একমত। কোরআন বল্‌ছেঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (المجادله - ٣)

'শয়তান তাদের ওপর প্রভাবশীল হয়েছে এবং সে তাদের খোদা সম্পর্কে গাফেল করে দিয়েছে। তারা হচ্ছে শয়তানের দলভুক্ত। জেনে রাখো, শয়তানের দল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থকামই থেকে যায়।'

পক্ষান্তরে আল্লাহ্র দলের লোকেরা বংশ-গোত্র, দেশ, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিক থেকে পরস্পরে যতোই বিভিন্ন রূপ হোক না কেন, বরং তাদের পূর্বপুরুষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী শত্রুতাই বিরাজ করুক না কেন— তারা খোদার দেয়া চিন্তাধারা ও জীবন আদর্শের ব্যাপারে একমত হবার সঙ্গে সঙ্গেই খোদায়ী সম্পর্কসূত্রে (حبل الله) পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে। তারা এই নতুন দলে যোগদান করার সাথে সাথেই শয়তানের দলের লোকদের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে।

বস্তুত দল বা পার্টির এই বৈষম্য পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক পর্যন্ত ভেঙ্গে দেয়। এমন কি, এর ফলে পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ لا يتوارث اهل ملتين—'দু'টি ভিন্ন মিল্লাতের লোকেরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না।'

দলের এই বৈষম্য স্বামী থেকে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমন কি বৈষম্য প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মিলন পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। শুধু এই জন্যে যে, উভয়ের জীবন-পথ পৃথক হয়ে গিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছেঃ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن—'স্ত্রী হালাল নয় স্বামীর জন্যে, স্বামীও নয় স্ত্রীর জন্যে'।

দলের এই পার্থক্য এক খান্দান—এক আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে গোটা সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয়। এমন কি, আপন গোত্রের যেসব লোক শয়তানের দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাদের সাথে বিয়ে-শাদী করা পর্যন্ত আল্লাহ্র দলের লোকদের পক্ষে হারাম হয়ে যায়। কোরআন বলছেঃ 'মুশরেক নারী ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের বিয়ে কোরো না। মুশরেক রমণী তোমাদের যতোই পসন্দনীয় হোক না কেন, মুমিন বাঁদী তার চাইতে অনেক উত্তম। আর মুশরেক পুরুষ ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নিজ মেয়েদের বিয়ে দিও না। আজাদ মুশরেক তোমাদের যতোই মনোপুত হোক না কেন, গোলাম তার চাইতে অনেক উত্তম।'

দলের এই পার্থক্য বংশীয় ও স্বাদেশিক জাতীয়তার সম্পর্ক শুধু ছিন্নই করে না, বরং উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করে দেয়। আর আল্লাহর দলের নীতি মেনে না নেয়া পর্যন্ত এই বিরোধ অবিরাম চলতে থাকে। কোরআন বলছে ঃ

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه ط اذ قالوا
لقومهم انا برءؤا منكم ومما تعبدون من دون الله - كفرنا بكم
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله
وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك - (الممتحنة)

'তোমাদের জন্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে ইব্রাহীম এবং তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে। তারা আপন (গোত্রীয়) জাতির লোকদেরকে স্পষ্টত বলে দিয়েছিলো যে, তোমাদের সাথে এবং তোমরা খোদাকে ছেড়ে আর যেসব উপাস্যের বন্দেগী করো, তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়েছি আর তোমরা এক খোদার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে চিরদিনের তরে শত্রুতার সৃষ্টি হলো। কিন্তু তোমাদের জন্যে ইব্রাহীমের এ কথার মধ্যে কোনো আদর্শ নেই, যাতে সে তার কাফের পিতাকে বলেছিলো, আমি তোমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবো।'

وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه
فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه - (التوبه ١١٤)

'ইব্রাহীম কর্তৃক নিজের পিতার জন্যে দোয়া করার বিষয়টি শুধু তার সাথে কৃত ওয়াদার উপর ভিত্তিশীল ছিলো। কিন্তু তার সামনে যখন

প্রকাশ পেলো যে, তার পিতা খোদার দুশমন, তখন সে তার থেকে হাত গুটিয়ে নিলো।'

দলের এই বৈষম্য এক খান্দানের লোক এবং নিকটতম আত্মীয়দের মধ্যেও ভালোবাসার সম্পর্ক হারাম করে দেয়। এমনকি, বাপ, ভাই ও ছেলেও যদি শয়তানের দলের মধ্যে থাকে, তবে খোদার লোকেরা তাদের সাথে ভালোবাসা রাখলে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله
ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم
...اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون -

(المجادله - ٣)

'তোমরা এমন কখনো পাবেনা যে, কোনো দল আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতিও ঈমান পোষণ করে আবার আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দুশমনদের সাথে—তারা তার পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা আত্মীয়জনই হোক না কেন বন্ধুত্বও রাখে।..... এরা হচ্ছে আল্লাহ্র দলের লোক আর জেনে রাখো, আল্লাহ্র দলই হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কল্যাণপ্রাপ্ত।'

এই দল অর্থেই কোরআন মুসলমানদের জন্যে আর একটি শব্দ ব্যবহার করেছে, তা' হলো 'উম্মত'। হাদীসেও এই শব্দটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। উম্মত বলা হয় এমন একটি জনসমষ্টিকে যারা একটি অভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে। যেসব লোকের মধ্যে কোনো মৌলিক ঐক্য বর্তমান থাকবে, তাদেরকে সেই মূলের দৃষ্টিতেই 'উম্মত' বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একই জমানার লোকদেরকেও উম্মত বলা হয়। এক বংশ বা একই দেশের লোকদেরকেও 'উম্মত' বলা হয়। কিন্তু মুসলমানদেরকে যে অভিন্ন ঐক্যের ভিত্তিতে 'উম্মত' বলা হয়েছে, তা বংশীয়, স্বাদেশিক বা আর্থিক স্বার্থ নয়, বরং তা' হচ্ছে তাদের জীবন-লক্ষ্য এবং তাদের দলীয় নীতি ও আদর্শ। তাই কোরআন বলছে ঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن
المنكر وتومنون بالله- (ال عمران - ١٢)

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত; তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির জন্যে। তোমরা সুকৃতির আদেশ দাও, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং খোদার প্রতি ঈমান পোষণ করো।'

وكذالك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
الرسول عليكم شهيدا - (بقره - ١٨)

'এইভাবে তোমাদেরকে একটি মধ্যবর্তী উম্মত[১] বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির ওপর তত্ত্বাবধায়ক[২] হও আর রসূল তোমাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক হন।'

এই আয়াতগুলো সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করুন। 'মধ্যবর্তী উম্মত'-এর মানে হচ্ছে ঃ 'মুসলমান' একটি আন্তর্জাতিক দল (International party)। দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেসব ব্যক্তি এক বিশেষ নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন, এক বিশেষ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এবং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত, তাদেরকে বেছে একত্র করা হয়েছে। এরা যেহেতু বিভিন্ন জাতির মধ্য থেকে এসেছে এবং একটি বিশেষ দলে পরিণত হবার পর কোনো জাতির সঙ্গেই এদের সম্পর্ক নেই, এ কারণেই এরা মধ্যবর্তী উম্মত। কিন্তু প্রত্যেক জাতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হবার পর সকল জাতির সঙ্গে তাদের একটি ভিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তা'হলো এই যে, এরা দুনিয়ায় খোদায়ী ফৌজদারের দায়িত্ব পালন করবে। 'তোমরা মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক' কথাটি স্পষ্টত বলে দিচ্ছে যে, মুসলমান খোদার তরফ থেকে দুনিয়ায় ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছে। আর 'মানবজাতির জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে'

---

(১) আয়াতে উল্লেখিত وسط শব্দের মানে মধ্যম।

(২) شهيد শব্দের মানে সাক্ষ্যদাতা এবং তত্ত্বাবধায়ক দুই-ই। উভয় অর্থই পরস্পর ওতোপ্রোত জড়িত।

কথাটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, মুসলমানদের মিশন হচ্ছে একটি বিশ্বজনীন মিশন। এই মিশনের সারমর্ম হলো এই যে, হিজবুল্লাহ বা আল্লাহর দলের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স:)-কে চিন্তা ও কর্মের যে বিধান আল্লাহ্ দিয়েছিলেন, তাকে সমস্ত নৈতিক, মানসিক ঐ বস্তুগত শক্তির সাহায্যে দুনিয়ায় প্রবর্তন করতে হবে এবং তার বিরোধী প্রতিটি বিধানকে পরাভূত করতে হবে। বস্তুত এই জিনিসের ভিত্তিতেই মুসলমানদের একটি উম্মত বানানো হয়েছে।

মুসলমানদের সামগ্রিক অস্তিত্বকে প্রকাশ করার জন্যে নবী করীম (সা) তৃতীয় যে পরিভাষাটি বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন, তা'হলো জামায়াত جماعت। এ-শব্দটিও হিজব (حزب) এর মতো দল বা পার্টির সমার্থক। الجماعة। এবং يد الله على عليكم بالجماعة ইত্যাকার হাদীসগুলো সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, নবী করীম (সা) কওম قوم শুয়াব (شعب) কিংবা এদের সমার্থক অন্যান্য শব্দের ব্যবহার ইচ্ছাকৃত-ভাবেই পরিহার করেছেন এবং এদের পরিবর্তে সর্বত্র 'জামায়াত' পরিভাষাটিই ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো বলেননি যে, 'হামেশা কওমের সাথে থাকো' কিংবা 'কওমের ওপর খোদার হাত রয়েছে'; বরং এ-ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি 'জামায়াত' শব্দটিই ব্যবহার করতেন। এর একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, মুসলমানদের সংঘবদ্ধ রূপ প্রকাশ করার জন্যে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে জামায়াত, হিজব, পার্টি ইত্যাকার শব্দই বেশী উপযোগী। কওম শব্দের সাধারণ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তি যে কোনো নীতি ও আদর্শের অনুসারী হোক না কেন—একটি কওমের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যদি সেই কওমের মধ্যে তার জন্ম হয় এবং নিজের পরিচয়, জীবনধারা ও সামাজিক সম্পর্কের দিক থেকে সেই কওমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু পার্টি, জামায়াত, দল ইত্যাকার শব্দের ব্যবহার অনুসারে নীতি ও আদর্শই হচ্ছে পার্টির অন্তর্ভুক্ত কিংবা তার থেকে বহিষ্কৃত হবার মূল ভিত্তি। এক ব্যক্তি কোনো পার্টির নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার পর আদৌ তার মধ্যে শামিল থাকতে পারে না। সে ওই পার্টির নাম ব্যবহার করতে পারে না, তার প্রতিনিধি হতে পারে না, তার স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে না, পার্টির সভ্যদের সাথে তার কোনোরূপ সহায়তাও চলতে পারে না। কেউ যদি বলে যে, পার্টির নীতি ও আদর্শের সঙ্গে আমি একমত নই বটে, কিন্তু আমার পিতামাতা এই পার্টির সভ্য ছিলেন এবং আমার নামও এর

সভ্যদের নামের অনুরূপ, সুতরাং আমারও সভ্যদের মতোই অধিকার পাওয়া দরকার—তবে তার এই যুক্তিধারা এতোখানি হাস্যকর মনে হবে, যে, সম্ভবত তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কেই শ্রোতাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে। কিন্তু পার্টির ধারণাকে কওমের ধারণা দ্বারা বদলে দিন, তারপর এইসব কিছু করারই সুযোগ বেরিয়ে আসবে।

ইসলাম তার আন্তর্জাতিক পার্টির সভ্যদের মধ্যে একরূপতা ও এক-মুখিনতা সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে একটি সোসাইটিতে পরিণত করার জন্যে তাদের পরস্পরের মধ্যেই বিয়ে-শাদী করার আদেশ করে। সেই সঙ্গে তাদের সন্তানাদি যাতে আপনা-আপনি পার্টির নীতি ও আদর্শের অনুবর্তী হয় এবং প্রচারকার্যের সাথে সাথে বংশবৃদ্ধির দ্বারাও পার্টির শক্তি বাড়ে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে তেমনি ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়। বস্তুত এখান থেকেই পার্টির জাতিতে রূপান্তরিত হবার সূচনা হয়। পরে সাধারণ সমাজ, গোত্রীয় সম্পর্ক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্য এই জাতিত্বকে অধিকতর সুদৃঢ় করে দেয়।

এ পর্যন্ত যা' কিছু হয়েছে, ঠিকই হয়েছে। কিন্তু মুসলমান যে মূলত একটি পার্টি এবং পার্টি হবার ওপরই তাদের জাতীয়তার (قومیت) ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে—কালক্রমে এ সত্যটি তারা বিস্মৃত হয়েছে। এই বিস্মৃতি বাড়তে বাড়তে এখন এতোদূর গড়িয়েছে যে, পার্টির ধারণা একে-বারে জাতিত্বের ধারণার মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মুসলমানরা এখন শুধু একটি 'কওম' বা জাতি হিসেবেই বাকী রয়েছে। জার্মানরা যেমন একটি জাতি কিংবা জাপানীরা যেরূপ একটি জাতি অথবা ইংরেজ যেমন একটা জাতি, তেমনি মুসলমানরাও একটা জাতি। তারা ভুলে গিয়েছে যে, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম তাদেরকে একটি উম্মত বানিয়ে-ছিলো, তা-ই হচ্ছে আসল জিনিস। যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে ইসলাম তার অনুবর্তীদেরকে একটি পার্টিরূপে সংগঠিত করেছিলো, তা-ই হচ্ছে প্রকৃত জিনিস। এই সত্যটি বিস্মৃত হয়ে তারা অমুসলিম জাতিগুলোর কাছ থেকে 'জাতীয়তা' (قومیت) সম্পর্কে জাহেলী ধারণা গ্রহণ করেছে। বস্তুত এ একটি মৌলিক ভ্রান্তি; এর ক্ষতিকর প্রভাব বহুদূর জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। এই ভ্রান্তিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত ইসলামের পুনরুজ্জী-বনের জন্যে কোনো পদক্ষেপই গ্রহণ করা যেতে পারে না।

একটি দলের সভ্যদের মধ্যে যে পারস্পরিক ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, তা ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক কারণে নয়, বরং তারা সবাই একই নীতিতে বিশ্বাসী এবং একই আদর্শের অনুবর্তী—এই হিসেবেই গড়ে ওঠে। পার্টির কোনো সভ্য যদি দলীয় নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো কাজ করে তবে সাহায্য না করাই শুধু পার্টি-সভ্যদের কর্তব্য নয় বরং তার বিপরীত তাকে এহেন বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মনীতি থেকে বিরত রাখা, সংযত না হলে তার বিরুদ্ধে দলীয় শৃংখলাবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তাতেও সংযত না হলে তাকে দল থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করাও পার্টি সভ্যদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। দুনিয়ায় এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, কোনো ব্যক্তি দলের আদর্শ বর্জন করলে তাকে হত্যা পর্যন্ত করা হয়।[১] কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাটা দেখুন—তারা নিজেদেরকে পার্টির বদলে 'জাতি' (কওম) মনে করার কারণে কী গুরুতর ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের কেউ যখন নিজের স্বার্থে ও সুবিধার খাতিরে অনৈসলামী নীতি অনুসারে কাজ করে, তখন অন্যান্য মুসলমান তার সাহায্য করবে বলে প্রত্যাশা করে। শুধু তাই নয়, সাহায্য না করলে বরং অভিযোগ করে ঃ দেখো মুসলমান মুসলমানের উপকার করে না। কেউ সুপারিশ করতে এলে এই মর্মে সুপারিশ করে যে, দেখো এক মুসলমান ভাইর উপকার হয়, তার সাহায্য করো। আর কেউ সাহায্য করলে নিজের কাজকে সে ইসলামী সহানুভূতি বলে আখ্যা দেয়। এই গোটা ব্যাপারে প্রত্যেকের মুখেই ইসলামী সহানুভূতি, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের দ্বীনী সম্পর্ক ইত্যাকার কথা বারবারই উচ্চারিত হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধ কাজে খোদ ইসলামেরই বরাত দেয়া এবং ইসলামের নামেই সহানুভূতি প্রকাশ করা স্পষ্টত একটি লজ্জাকর ব্যাপার। এরা যে ইসলামের নামোচ্চারণ করে, তা যদি প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে জিন্দা থাকে তো ইসলামী দলের কোনো সভ্য ইসলামী আদর্শের বিরোধী কোনো কাজ করছে—একথা জানা মাত্রই এরা কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করবে এবং তাকে তওবা করিয়ে ছাড়বে। কারো সাহায্য পাওয়া এবং কারো সুপারিশ করা তো দূরের কথা একটি জীবন্ত ইসলামী সমাজে তো কেউ ইসলামী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করার

(১) ইসলামে ধর্মত্যাগীদের হত্যার কারণ এটাই। কম্যুনিস্ট দেশসমূহও কম্যুনিজম বর্জন করার অপরাধে লোকদের এই শাস্তিই দিয়ে থাকে।

নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারে না। কিন্তু মুসলমানদের বর্তমান সমাজে দিনরাত এই ব্যাপারই চলছে। এর একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে জাহেলী জাতীয়তা ঢুকে পড়েছে। যে জিনিসটাকে তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলে চালাচ্ছে, তা' মূলত জাহেলী জাতীয়তার সম্পর্ক মাত্র, যা' তারা অমুসলিমদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে।

এই জাহেলিয়াতেরই কৃতিত্বের ফলে মুসলমানদের মধ্যে 'জাতীয় স্বার্থ' নামক এক অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা একে নিঃসঙ্কোচে 'ইসলামী স্বার্থ' বলেও আখ্যা দিয়ে থাকে। এই তথাকথিত ইসলামী স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থ বস্তুটা কী? তা' হলোঃ যারা 'মুসলমান' বলে পরিচিত, তাদের কল্যাণ লাভ করা, তাদের ধনবান হওয়া, তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাওয়া, তাদের কর্তৃত্ব লাভ করা এবং কোনো না কোনরূপে তাদের বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হওয়া—এইসব কল্যাণ ইসলামী আদর্শ নীতির অনুবর্তন করে হোক কি তার বিরুদ্ধাচরণ করে তার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। পয়দায়েশী মুসলমান বা খান্দানী মুসলমানকে লোকেরা খাঁটি 'মুসলমানই' আখ্যা দেয়—তার চিন্তাধারা ও কর্মনীতিতে ইসলামের চিহ্নমাত্র খুঁজে না পেলেও তাতে তারা কিছু মনে করে না। ভাবখানা যেনো এইঃ মুসলমান আত্মার নাম নয়, বরং দেহের নাম আর ইসলামী গুণাবলীকে উপেক্ষা করেও এক ব্যক্তিকে মুসলমান অভিধা দেয়া যায়। এই ভ্রান্ত ধারণার সাথে লোকেরা যে দেহ-সর্বস্বদের নাম মুসলমান রেখে দিয়েছে, তাদের রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র, তাদের উন্নতিকে ইসলামের উন্নতি এবং তাদের কল্যাণকে ইসলামী স্বার্থ বলে তারা আখ্যা দেয়—তাদের এই রাষ্ট্র, এই উন্নতি এবং এই স্বার্থ ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও তাতে কেউ কিছু মনে করে না। জার্মানিত্ব যেমন কোনো নীতির নাম নয়, নিছক একটি জাতীয়তার নাম মাত্র এবং এক জার্মান জাতীয়তাবাদী যেমন যে-কোনো প্রকারে শুধু জার্মানদেরই সমুন্নতি কামনা করে, তেমনি আজকের মুসলমানরাও 'মুসলমানিত্বকে' শুধু একটি জাতীয়তা বানিয়ে নিয়েছে। আজকের মুসলিম জাতীয়তাবাদী শুধু আপন জাতীয় সমুন্নতিই কামনা করে—এই সমুন্নতি নীতিগত ও কার্যত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থার অনুসরণের ফল হলেও তাতে তাদের আপত্তি নেই। এটা কি জাহেলিয়াত নয়? লোকেরা কি একথা ভুলে যায়নি যে, মুসলমান একটি আন্তর্জাতিক পার্টির নাম, যা মানবতার কল্যাণ সাধা-

রণের জন্যে একটি বিশেষ ও বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে উত্থিত হয়েছিলো? এই আদর্শ ও কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্ন করার পর নিছক ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে যারা ভিন্ন আদর্শ ও কর্মনীতি অনুসারে কাজ করে, তাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে কিভাবে 'ইসলামী' বলা যেতে পারে? যে ব্যক্তি পুঁজিবাদী নীতি অনুসরণ করে, তাকে কম্যুনিষ্ট নামে সম্বোধন করতে কি কেউ কখনো শুনেছে? পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে কেউ কি কখনো কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র বলবে? ফ্যাসিষ্ট ধরনের প্রতিষ্ঠান বলে আখ্যা দেবে? এভাবে পরিভাষাগুলোকে যদি কেউ খামখেয়ালীভাবে ব্যবহার করে, তবে তাকে অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধ আখ্যা দিতে লোকেরা এতোটুকু দেরী করবে না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইসলাম, মুসলমান ইত্যাকার পরিভাষাগুলোকে সম্পূর্ণ খামখেয়ালী-ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এ ব্যাপারে কেউ অজ্ঞতা বা মূর্খতার গন্ধ পর্যন্ত অনুভব করে না।

মুসলমান শব্দটি স্বতঃই প্রকাশ করছে যে, এটি 'বস্তুবাচক নাম' নয়, বরং গুণবাচক নাম; এর প্রকৃত মর্ম হচ্ছে 'ইসলামের অনুবর্তী'—এছাড়া এর ভিন্ন কোনো মর্মই হতে পারে না। মানুষের যে-বিশেষ নৈতিক, মানসিক ও বাস্তব গুণাবলীর নাম 'ইসলাম', এটি সেই গুণরাজিকেই প্রকাশ করে। কাজেই হিন্দু ব্যক্তি, জাপানী ব্যক্তি ও চীনা ব্যক্তির জন্যে যেমন হিন্দু, জাপান ও চীনা শব্দ ব্যবহার করা হয়, তেমনি মুসলিম ব্যক্তির জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে না। মুসলমানের ন্যায় নামধারণকারী ব্যক্তি যখনই ইসলামী নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, তখনি তার মুসলমানী মর্যাদা আপনা-আপনি লুপ্ত হয়ে যায়। এরপর সে যা কিছু করে, নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্বে করে, এ ব্যাপারে তার ইসলামের নাম ব্যবহার করার কোনোই অধিকার নেই। এমনিভাবে 'মুসলমানের স্বার্থ', 'মুসলমানের উন্নতি', 'মুসলমানের রাষ্ট্র' 'মুসলমানের মন্ত্রিত্ব', 'মুসলমানের প্রতিষ্ঠান' ইত্যাকার শব্দগুলোকে কেবল তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি এই জিনিসগুলো ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসারী হয় এবং ইসলামের আনীত মিশনকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। এর অন্যথা হলে এদের কোনো একটি জিনিসের সাথেও মুসলমান শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। লোকেরা তাকে অন্য যে কোনো নামে ডাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান নামে কিছুতেই সম্বোধন করতে পারে না। কারণ ইসলামী বৈশিষ্টকে বাদ দিলে মুসলমানের আর

কোনো অস্তিত্বই থাকে না। কম্যুনিজমকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতির নাম কম্যুনিস্ট হয়েছে এবং এই অর্থে কোনো স্বার্থকে কম্যুনিস্ট স্বার্থ, কোনো রাষ্ট্রকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র, কোনো প্রতিষ্ঠানকে কম্যুনিস্ট প্রতিষ্ঠান আর কোনো উন্নতিকে কম্যুনিস্টদের উন্নতি বলা যেতে পারে—এটা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারবেন না। তা'হলে মুসলমানের ব্যাপারে কেন এটা মনে করা হয়েছে যে, ইসলামকে বাদ দিয়েই মুসলমান কোনো ব্যক্তি বা জাতির নাম এবং তার প্রতিটি জিনিসকেই ইসলামী আখ্যা দেয়া যেতে পারে?

এই ভ্রান্ত ধারণা মূলগতভাবে নিজস্ব তাহজিব, তমুদ্দুন ও ইতিহাস সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভ্রান্তমুখী করে দিয়েছে। যে সব বাদশাহী ও রাষ্ট্রব্যবস্থা অনৈসলামী নীতির ভিত্তিতে কায়েম হয়েছিলো, সেগুলোতে মুসলিম নামধারীরা সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলো কেবল এজন্যেই লোকেরা সেগুলোকে ইসলামী রাষ্ট্র আখ্যা দেয়। কর্দোভা, বাগদাদ, দিল্লী ও কায়রোর বিলাসপ্রিয় রাজদরবারে যে সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিলো লোকেরা তাকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে অভিহিত করে। অথচ ইসলামের সাথে এর কোনোই সম্পর্ক নেই। লোকদেরকে যখন ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, অমনি তারা চট্ করে তাজমহলের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। মনে হয়, এইটিই যেনো সভ্যতার সবচাইতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অথচ একজন মৃতকে সমাহিত করার জন্যে বিস্তীর্ণ এলাকা স্থায়ীভাবে ঘিরে নেয়া এবং তার ওপর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করা আদপেই ইসলামী সভ্যতা নয়। লোকেরা যখন ইসলামী ইতিহাস আলোচনা করতে বসে তখন আব্বাসীয়, সেলজুকী ও মোগল যুগের ক্রিয়াকাণ্ডকে অতি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করে। অথচ প্রকৃত ইসলামী ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরাট অংশ স্বর্ণাক্ষরে নয়, বরং কালো কালি দ্বারা অপরাধের তালিকায় লিপিবদ্ধ করার যোগ্য। লোকেরা মুসলিম বাদশাহদের ইতিহাসের নাম 'ইসলামী ইতিহাস' রেখে দিয়েছে, বরং তারা তাকে 'ইসলামের ইতি-হাস'ও বলে থাকে। মনে হয়, এই সব রাজা-বাদশাহদের নামই যেনো ইসলাম। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মিশন এবং তার নীতি ও আদর্শকে সামনে রেখে নিজেদের অতীত ইতিহাস বিচার করা এবং পুরোপুরি ইনসাফের সাথে ইসলামী ক্রিয়াকাণ্ডকে অনৈসলামী ক্রিয়াকাণ্ড থেকে পৃথক করে

দেখানোই লোকদের একান্ত উচিত ছিলো। কিন্তু তার পরিবর্তে মুসলিম শাসকদের পক্ষ-সমর্থন করাকেই তারা ইসলামী ইতিহাসের খেদমত মনে করে বসলো। লোকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই কুটিলতা সৃষ্টির একমাত্র কারণ হলো এই যে, তারা মুসলমানের প্রতিটি জিনিসকেই 'ইসলামী' মনে করে নিয়েছে। তাদের ধারণা এই যে, মুসলিম নামে পরিচয়দানকারী ব্যক্তি যদি অমুসলিমের ন্যায়ও কাজ করে, তবু তার কাজকে মুসলমানের কাজ বলা চলে।

এহেন কুটিল দৃষ্টিভঙ্গি মুসলমানরা তাদের জাতীয় রাজনীতির বেলায়ও গ্রহণ করেছে। ইসলামের নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করে আজ শুধু একটি জাতিকে 'মুসলিম জাতি' নামে স্মরণ করা হয়। এই জাতির পক্ষে কিংবা এর নামে অথবা এর জন্যে যে কোনো ব্যক্তি এবং যে কোনো দল খেয়ালখুশীমতো কর্মনীতি গ্রহণ করতে পারে। লোকদের মতে, 'মুসলিম জাতি'র সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তি মুসলমানদের প্রতিনিধি বরং তাদের নেতা পর্যন্ত হতে পারে—সে বেচারার ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকলেও কোনো আপত্তি নেই। কোনো পার্টি অনুসরণে কোনো রূপ ফায়দা দেখতে পেলে অমনি লোকেরা তার সাথে চলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়—তার লক্ষ্য ইসলামের লক্ষ্য থেকে ভিন্ন হলেও তাতে ক্ষতির কোনো কারণ খুঁজে পায় না। মুসলমানদের জন্যে চারটে রুটি-রুজির ব্যবস্থা হলেই তারা খুশীতে গদগদ হয়ে ওঠে—ইসলামের দৃষ্টিতে সে রুটি-রুজি হারাম হলেও আপত্তি নেই। কোথাও মুসলমানকে ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট দেখা গেলে অমনি লোকেরা গর্বে ফুলে ওঠে—সে ক্ষমতা একজন অমুসলমানের মতো অনৈসলামী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও তারা তাতে কিছু মনে করে না। লোকেরা প্রায়শই অনৈসলামী জিনিসের নাম ইসলামী স্বার্থ রেখে বসে, ইসলামী নীতির বিরোধী প্রতিষ্ঠা-নাদির সাহায্য ও সংরক্ষণের জন্যে শক্তিক্ষয় করে এবং অনৈসলামী লক্ষ্যের পিছনে কষ্টার্জিত অর্থ ও জাতীয় শক্তি ব্যয় করে থাকে। এই সকল পরিণাম-ফল সেই এক মৌল ভ্রান্তি থেকে উৎসারিত: মুসলমানরা নিজেদেরকে শুধু একটি 'জাতি' মনে করে নিয়েছে এবং এই সত্যটি ভুলে গিয়েছে যে, তারা মূলত একটি আন্তর্জাতিক পার্টি—দুনিয়ায় নিজস্ব নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া যার আর কোনো স্বার্থ এবং আর কোনো লক্ষ্য নেই।

কাজেই মুসলমানরা যতোক্ষণ নিজেদের মধ্যে জাতির পরিবর্তে পার্টি'র ধারণা সৃষ্টি না করবে, এবং তাকে জীবন্ত ধারণায় পরিণত না করবে, ততোক্ষণ জীবনের কোনো ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভুল হবে না। (প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৩৯)

পরিশিষ্ট ঃ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর কতিপয় পাঠক এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, 'ইসলামী সমাজকে 'জাতি'র পরিবর্তে 'পার্টি' আখ্যা দিলে তার পক্ষে কোনো স্বাদেশিক জাতীয়তার অংশ হবার সুযোগ হয়ে দাঁড়ায়। একটি জাতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং পৃথক আদর্শ রাখা সত্ত্বেও সবাই একই বৃহত্তর 'জাতি'র অন্তর্ভুক্ত হয়, তেমনি মুসলমানরা একটি পার্টি হলে তারাও তো স্বাদেশিক জাতির অংশ হতে পারে।'

যেহেতু দল বা পার্টি শব্দকে সাধারণভাবে লোকেরা রাজনৈতিক দল (Political Party) অর্থে ব্যবহার করে, এ কারণেই আলোচ্য ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটি শব্দের প্রকৃত মর্ম নয়; বরং এ হচ্ছে একটি বিশেষ অর্থে বহুল ব্যবহারের ফল মাত্র। শব্দটির আসল মর্ম হলো ঃ যারা এক সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস, আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে একত্রিত হয়, তারা একটি দল। এই অর্থেই কোরআন হিজব্ (حزب) ও উম্মত (امت) শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছে। এ-অর্থেই হাদীসে জামায়াত (جماعت) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আর ইংরেজী পার্টি (Party) শব্দেরও মর্ম হচ্ছে এই।

এখন এক প্রকার দলের সামনে একটি দেশ বা জাতির বিশিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের এক বিশেষ মতবাদ ও কর্মসূচী বর্তমান থাকে। এ ধরনের দল নিছক একটি রাজনৈতিক দলই হয়ে থাকে। এই কারণে যে জাতির মধ্যে সে জন্মলাভ করে, তার অংশ হয়ে কাজ করতে পারে।

দ্বিতীয় প্রকার দল একটি সর্বাত্মক মতবাদ ও বিশ্বব্যাপক ধারণা (World Idea) নিয়ে উত্থিত হয়। তার সামনে গোটা মানব জাতির আদর্শ বর্তমান থাকে। সে এক নতুন ধারায় গোটা মানব জীবনের সংগঠন ও পুনর্গঠন করতে চায়। তার মতাদর্শ মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও নীতি, চরিত্র থেকে নিয়ে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রতিটি দিক ও বিভাগকে নিজস্ব ছাঁচে ঢালাই করতে চায়। সে এক স্থায়ী ও স্বতন্ত্র

সংস্কৃতি এবং এক বিশিষ্ট সভ্যতার (Civilization) জন্মদান করতে ইচ্ছুক। এটি যদিও মূলত একটি দলই, কিন্তু কোনো জাতির অংশ হয়ে কাজ করার মতো কোনো দল এটি নয়। এটি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ উর্ধ্বে অবস্থান করে। যে সব গোত্রীয় ও ঐতিহাসিক বিদ্বেষের ভিত্তিতে দুনিয়ায় বিভিন্ন রূপ জাতীয়তার উদ্ভব হয়েছে সেগুলোকে চূরমার করে দেয়াই হচ্ছে এ-দলের উদ্দেশ্য। সুতরাং এহেন দল কিভাবে ঐ সব জাতীয়তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে? এ-দলটি বংশীয়, গোত্রীয় ও ঐতিহাসিক জাতীয়তার পরিবর্তে এক বুদ্ধিবৃত্তিক জাতীয়তা (Rational Nationality) গঠন করে, সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পরিবর্তে এক প্রসারণশীল জাতীয়তা (Exapanding Nationality) গঠন করে। এই দল নিজেই এক জাতিতে পরিণত হয়, যা' বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও নীতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার গোটা মানব সমাজকে নিজের সীমার মধ্যে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি জাতিতে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও মূলত এ একটি দলই থেকে যায়; কারণ এতে শামিল হবার মাপকাঠি পয়দায়েশ নয়, বরং যে মতাদর্শের ভিত্তিতে এ দলটি গঠিত হয়েছে, তার অনুবর্তনই হচ্ছে এর মাপকাঠি।

প্রকৃতপক্ষে এই দ্বিতীয় প্রকার দলের নামই হচ্ছে মুসলমান। একটি জাতির মধ্যে যেমন নানারূপ পার্টি গঠিত হয়ে থাকে, এটি তেমন কোনো পার্টি নয়। বরং এ এক স্থায়ী কৃষ্টি ও সভ্যতা (Civilization) গড়ে তোলার জন্যে উত্থিত হয়েছে। এ দল ছোটোখাটো জাতীয়তার সীমাগুলোকে চূর্ণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তির ওপর এক বিরাট বিশ্ব-জাতীয়তা (World Nationality) গঠন করতে ইচ্ছুক। এটি দুনিয়ার কোনো বংশগত বা ঐতিহাসিক জাতীয়তার সাথেই সভ্যতা বা ভাবধারার দিক থেকে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে প্রস্তুত নয়, বরং নিজস্ব জীবনাদর্শ ও সমাজ দর্শনের (Social Philosophy) ভিত্তিতে স্বতন্ত্রভাবে নিজের সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাসাদ নির্মাণ করে—এদিক থেকে একে নিশ্চিতরূপে 'জাতি' বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-অর্থের প্রেক্ষিতে 'জাতি' হওয়া সত্ত্বেও মূলত এটি 'দল'ই থেকে যায়। কারণ এর আদর্শের বিশ্বাসী ও অনুবর্তী না হলে নিছক আকস্মিক পয়দায়েশের (Mere accident of Birth) কারণেই কেউ এ-জাতির সভ্য হতে পারে না। অনুরূপভাবে কেউ এর আদর্শের প্রতি ঈমান আনার জন্যে প্রস্তুত হলে তার পক্ষে এর জাতীয়তার মধ্যে শামিল হবার ব্যাপারে অন্য জাতির মধ্যে জন্ম

হওয়াটাই কোনো বাধা হতে পারে না। কাজেই আমার বক্তব্যের সারমর্ম হলো : মুসলিম জাতির জাতীয়তা তার দলীয় অস্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল। তার জাতীয় মর্যাদা তার মর্যাদার শাখা মাত্র। যদি দলীয় মর্যাদাকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এটি নিছক একটি জাতি হয়েই থাকে, তবে তা হবে এর জন্যে চরম অধঃপতনের (Degeneration) নামান্তর।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানব সমাজের ইতিহাসে ইসলামী দলের অস্তিত্ব এক অপূর্ব ও অভিনব ব্যাপার। এর আগে বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃষ্টবাদ জাতীয়তা-গুলোর সীমারেখাকে চূর্ণ করে গোটা মানব সমাজকে আহবান জানিয়েছিলো এবং একটি মতাদর্শের ভিত্তিতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গঠনের চেষ্টাও করে ছিলো; কিন্তু এই উভয় ধর্মের কাছে কতিপয় নৈতিক বিধান ছাড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সার্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো সমাজ দর্শন (Social Philosophy) বর্তমান ছিলো না। ফলে উভয় ধর্মই কোনো বিশ্ব-জাতীয়তা গঠন করতে সমর্থ হয়নি, বরং এক ধরনের দূর্বল ভ্রাতৃসংঘ (Brotherhood) গঠন করেই ক্ষান্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা তার আবেদনকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চাইলো; কিন্তু জন্মের প্রথম দিন থেকেই তার ওপর স্বাদেশিক জাতীয়তার (Nationalism) ভূত সওয়ার হয়ে বসে। ফলে এ-ও বিশ্বজাতীয়তা গঠনে ব্যর্থকাম হয়। এরপর মার্কসীয় কম্যুনিজম এগিয়ে আসে এবং জাতীয়তাগুলোর সীমারেখাকে চূর্ণ করে বিশ্বজনীন আদর্শের ভিত্তিতে এক বিশ্বব্যাপক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে প্রয়াস পায়। কিন্তু তার পরিকল্পিত সভ্যতা এখনো পুরোপুরি বাস্তবরূপ লাভ করেনি বলে মার্কসবাদ এখনো এক বিশ্বব্যাপক জাতীয়তায় রূপান্তরিত হতে পারেনি[১]। বর্তমান সময়ে ময়দানে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মতাদর্শ, যা' বংশীয়, গোত্রীয় ও ঐতিহাসিক জাতীয়তাগুলোকে চুরমার করে নিছক সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর এক বিশ্বব্যাপক জাতীয়তা গড়ে তোলে।

(১) বরং এখন তো খোদ মার্কসবাদের মধ্যেই ন্যাশনালিজমের জীবাণু ঢুকে পড়েছে। স্টালিন ও তার দলের কর্মপদ্ধতিতে রুশ জাতীয়তাবাদের ভাবধারা দিনদিন প্রকট হয়ে উঠছে। রুশীয় কম্যুনিষ্ট পুস্তকাদিতে—এমনকি ১৯৩৬ সালের আধুনিক রাশিয়ান শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় Fatherland (পিতৃ-ভূমি) কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। (গণচীনের দৃষ্টান্তও এর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নয়। বরং সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, রাশিয়া ও গণচীন উভয়েই এখন উগ্র স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। —সম্পাদক) কিন্তু ইসলামের দিকে দেখুন সর্বত্র 'দারুল ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—ফাদারল্যাণ্ড বা মাদারল্যাণ্ড জাতীয় শব্দ নয়।

কাজেই যারা ইসলামের মৌল ভাবধারা সম্যকরূপে অবগত নয়, তারা একই সামাজিক সত্তা, একই সময় জাতি এবং দল কিভাবে হতে পারে, তা মোটেই বুঝতে পারে না। তাদের পরিচিত জাতিগুলোর মধ্যে জন্ম-সূত্রে কোনো জাতির সভ্য হওয়া যায় না; বরং সভ্য তৈরী হতে হয়—এমন একটি জাতিরও অস্তিত্ব নেই। তারা বরং দেখছে যে, যে ব্যক্তি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করে, সে ইতালীয় জাতির সভ্য আর যার জন্ম ইতালীতে হয়নি সে কিছুতেই ইতালীয় হতে পারে না। কোনো জাতির মধ্যে লোকেরা শুধু বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে শামিল হয় এবং বিশ্বাস ও আদর্শ পরিবর্তিত হলেই সেখান থেকে বেরিয়ে যায়—এমন কোনো জাতির কথাই তারা অবগত নয়। তাদের মতে, এ ধরনের বৈশিষ্ট্য কোনো জাতির নয়, বরং একটি পার্টিরই হতে পারে। কিন্তু তারা যখন দেখে যে, এই অভিনব দলটি নিজের জন্যে স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে, এক স্থায়ী জাতীয়তার দাবি করে এবং স্বাদেশিক জাতীয়তার সঙ্গে কোথাও নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সম্মত নয়, তখন তাদের পক্ষে বিষয়টি একেবারেই দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বোধশক্তির এই দীনতা অমুসলিমদেরই নয়, মুসলমানদেরও পেয়ে বসেছে। দীর্ঘকাল ধরে অনৈসলামী শিক্ষাদীক্ষা লাভ এবং অনৈসলামী পরিবেশে জীবন যাপনের ফলে তাদের মধ্যেও 'ঐতিহাসিক জাতীয়তার' এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে যে একটি দল হিসেবে দুনিয়ার বুকে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সৃষ্টির জন্যে গঠন করা হয়েছিলো, দুনিয়াময় নিজস্ব আদর্শকে প্রসারিত করা তাদের একমাত্র জীবনলক্ষ্য ছিলো এবং দুনিয়ার ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থাগুলোকে চুরমার করে নিজস্ব সমাজ দর্শনের ভিত্তিতে এক বিশ্বব্যাপক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাদের একমাত্র কাজ ছিলো—এ সত্যকে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। আর এই সববিছু ভুলে গিয়ে তারা শুধু দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মতোই নিজেদেরকে একটি জাতি মাত্র মনে করে নিয়েছে। আজকে তাদের সভা-সমিতিতে, সম্মেলন-সংগঠন, পত্র-পত্রিকায় কোথাও তাদের জাতীয় জীবনের এই লক্ষ্যের কথা উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় না—অথচ এ জন্যেই তাদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগুলো থেকে বাছাই করে একটি স্বতন্ত্র জাতি—একটি উম্মত বানানো হয়েছিলো। এই মহান লক্ষ্যের পরিবর্তে এখন 'মুসলমানদের স্বার্থ'ই তাদের সমগ্র মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। আর মুসলমান

বলতে বুঝায় এমন সব লোকদের, যারা মুসলমান পিতা-মাতার বংশে জন্মলাভ করেছে। আর স্বার্থ বলতে এই বংশীয় মুসলমানদের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ কিংবা বড়োজোর তাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংরক্ষণকেই বুঝানো হয়ে থাকে। এই স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এর উন্নতির জন্যে যে-পন্থাই ফলপ্রসূ মনে হয়, সেদিকেই তারা ধাবিত হয়—ঠিক মুসোলিনী যেমন ইতালীয়দের স্বার্থের উপযোগী যে-কোনো পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত হতো। কোনো নীতি ও আদর্শের সে অনুসারী ছিলো না, এরাও নয়। সে বলতো, ইতালীয়দের যা' উপকারী, তা-ই সত্য। এরা বলছে, 'মুসলমানদের' জন্যে যা কিছু উপকারী তা-ই সত্য। এই জিনিসটিকেই আমি মুসলমানদের অধঃপতন বলতে চাই। এই অধঃপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যে আমি মুসলমানদের একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজনবোধ করিঃ তোমরা বংশীয় ও ঐতিহাসিক জাতিগুলোর মতো একটি জাতিমাত্র নও, বরং প্রকৃতপক্ষে তোমরা একটি দল। তোমরা নিজেদের মধ্যে দলীয়চেতনা (Party-Sense) জাগ্রত করো, এর মধ্যেই তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত।

এই দলীয় চেতনার অভাব কিংবা আত্মবিস্মৃতির মন্দ পরিণতি এতো বিপুল যে, তার হিসাব করাই কঠিন। এই অচেতনা ও আত্মবিস্মৃতির ফলেই মুসলমানরা প্রত্যেক পথিকের পিছনে ছুটতে এবং প্রতিটি মতাদর্শের অনুসরণ করতে তৈরী হয়ে যায়—তা' ইসলামী নীতি ও লক্ষ্যের বিপরীত হলেও কোন আপত্তি করা হয় না। মুসলমান তাই জাতীয়তাবাদী (Nationalist) হয়, কম্যুনিস্ট হয়, ফ্যাসিস্ট নীতি গ্রহণেও সে কুন্ঠিত নয়। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সামাজিক, অতিপ্রাকৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রায় প্রত্যেকটির অনুসারীই মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাবে। মুসলমানরা কিছুমাত্র অংশগ্রহণ করেনি, দুনিয়ায় এমন কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও তামুদ্দুনিক আন্দোলন নেই। আর মজার ব্যাপার এই যে, এতৎসত্ত্বেও এরা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান মনে করে, মুসলমান বলে পরিচয় দেয় এবং মুসলমান অভিধা পায়। কিন্তু 'মুসলমান' যে কোনো জন্মগত উপাধি নয়, বরং ইসলামের অনুসারী লোকদের একটি গুণবাচক নাম—এই বিভিন্ন পথের পথিকদের সে কথা কখনোই স্মরণ হয় না। অথচ যে-ব্যক্তি ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো ভিন্ন পথ অনুসরণ করে,

তাকে'মুসলমান' বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুত 'কম্যুনিস্ট মহাজন' 'জৈন কসাই' ইত্যাকার পরিভাষাগুলো যেমন পরস্পর বিরোধী মুসলিম জাতীয়তাবাদী, মুসলিম কম্যুনিস্ট এবং এই জাতীয় পরিভাষাগুলোও তেমনি পরস্পর বিরোধী।

সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ

নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণতার জন্যে দু'টি স্তর হয়ে থাকে। প্রথম স্তর হলো, সেটি যে-গুণে গুণান্বিত, তার চরমোৎকর্ষ লাভ করতে হবে। আর দ্বিতীয় স্তর হলো, সে জিনিসটির মধ্যে অন্যান্য জিনিসকে প্রভাবিত করার এবং অন্যবিধ বস্তুকে নিজ রঙে রাঙিয়ে তোলার মতো প্রবল গুণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকতে হবে। বরফের প্রথম পূর্ণত্ব এই যে, তা নিরতিশয় ঠাণ্ডা আর দ্বিতীয় পূর্ণত্ব এই যে, তা' অন্যান্য জিনিসকেও ঠাণ্ডা করে দেয়। আগুনের প্রথম পূর্ণত্ব এই যে, তা' যারপরনাই উষ্ণ আর দ্বিতীয় পূর্ণত্ব এই যে, নিজের উষ্ণতার বলে আশপাশের জিনিসকেও সে উষ্ণ করে ছাড়ে। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির অবস্থাটাও হচ্ছে ঠিক এইরূপ। সৎ-লোকের প্রথম পূর্ণত্ব এই যে, সে নিজে সুকৃতির প্রতীক আর দ্বিতীয় পূর্ণত্ব হলো, নিজের প্রভাব বলে অন্য লোকদেরও সে সৎ বানিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে মন্দ লোকের প্রথম পূর্ণত্ব হলো এই যে, সে নিজে দুষ্কৃতির গুণে চূড়ান্ত রকমে গুণান্বিত আর দ্বিতীয় পূর্ণত্ব এই যে, এই দুষ্কৃতিকে সে অন্যান্য লোকদের পর্যন্ত সংক্রামিত করে দেয়।

এই সাধারণ নিয়ম অনুসারে কাফের এবং মুমিনের জন্যেও পূর্ণতার দু'টি স্তর রয়েছে। কাফের যখন তার কুফরী বিশ্বাসে মজবুত ও সুদৃঢ় হয়, তখন সে কুফরী পূর্ণতার প্রথম স্তরে উন্নীত হয়। আর যখন সে কুফরীর প্রচার শুরু করে, লোকদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে বাতিলের দিকে টানবার প্রয়াস পায় এবং মুখের বল, অর্থবল, অস্ত্রবল কিংবা অন্য কোনো

(১) প্রবন্ধটি ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা তর্জুমানুল কোরআন পত্রিকা থেকে গৃহীত হয়েছে। —সম্পাদক

শক্তির দ্বারা কুফরীর প্রতিষ্ঠা করে, তখন কুফরী পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তরেও উপনীত হয়। এই দু'টি স্তরে উন্নীত হবার পর তার জন্যে পূর্ণতার আর কোনো স্তর বাকী থাকে না। এমনিভাবে মুমিন যদি তার ঈমান-বিশ্বাসে সুদৃঢ় এবং সত্যানুসরণে পরিপূর্ণ হয়, তবে ঈমানী পূর্ণতার প্রথম স্তরে সে আরোহণ করবে। আর যদি এ গুণটি তার মধ্যে প্রবলরূপে ধারণ করে, অন্যান্য লোকদের মধ্যেও সে ঈমান ও সত্যানুসরণের প্রচার শুরু করে দেয় এবং নিজের জবান, কলম, চরিত্র, আচরণের প্রভাব ও দৈহিক প্রয়াস প্রচেষ্টার দ্বারা অন্যান্য লোকদের মধ্যেও ইসলাম ও সত্যানুসরণের গুণরাজি সৃষ্টি করে, তবে ঈমানী পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তরও সে জয় করে নেবে। এর-পরই সে পূর্ণ মুমিন অভিধা পাওয়ার উপযোগী হবে।

এই বিষয়টিকেই সূরা আল-ইমরানের দশম ও একাদশ রুকূতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছেঃ

قل يا هل الكتب لم تكفرون بايت الله - (ال عمران - ٧)

(হে মুহাম্মদ। তাদেরকে) বলে দাওঃ হে আহ্লে কিতাব। তোমরা কেন আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করো?'

তারপর বলা হয়েছেঃ

قل يا هل الكتب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا - (ال عمران)

'বলে দাওঃ হে আহ্লে কিতাব। তোমরা কেন ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখো এবং তাকে কুটিল করতে চাও?'

এই দু'টি আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কুফরীর প্রথম পূর্ণতা হচ্ছে আল্লাহ্র বাণীকে নিজে অস্বীকার করা। আর দ্বিতীয় পূর্ণতা হচ্ছে তার প্রচার করা, লোকদেরকে খোদার দেয়া সরল পথ থেকে বিরত রাখা এবং তাদের সামনে চিন্তা ও কর্মের কুটিল পথ পেশ করা।

এরপর মুমিনদের সম্বোধন করেও দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথম কথা হলো এইঃ

يا يها الذين امنوا اتقوا الله حق تقته ولا تموتن الا وانتم
مسلمون - واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا -
(ال عمران - ١١)

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যেমন তাকে ভয় করা কর্তব্য। তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না। আর সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রশি আকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।'

দ্বিতীয় কথা হলো এই ঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف
وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون - (ال عمران - ١١)

'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে ; আর এ-ধরনের লোকেরাই হচ্ছে কল্যাণপ্রাপ্ত।'

এখানে ঈমানেরও দু'টি স্তর নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম স্তর এই যে, মুমিন আল্লাহ্‌কে ভয় করবে, জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি খোদায়ী বিধানের অনুগত থাকবে এবং আল্লাহ্‌র রশিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। আর দ্বিতীয় স্তর এই যে, সে অন্যান্য মানব সন্তানকেও কল্যাণের দিকে ডাকবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।

তা'ছাড়া দ্বিতীয় প্রকার পূর্ণতার মধ্যেও বহুতরো স্তর রয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, মোমবাতি, বিজলী-বাল্‌ব, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সবই আলোকোজ্জ্বল হয়। কিন্তু আলোকপ্রাপ্তির ব্যাপারে এগুলোর মধ্যে স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। মোমবাতি কেবল একটি ক্ষুদ্র কামরাই আলোকিত করতে পারে। বিজলী-বাল্‌বের আলো একটি বিরাট বাড়ী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করতে পারে। চাঁদের আলো পৃথিবী এবং তার আশেপাশের পরিমণ্ডল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু সূর্য একটি গোটা জগতকেই তার আলো দ্বারা উজ্জ্বল করে রাখছে ; এমন কি গোটা সৌর-মণ্ডল তারই আলোকে আলোকিত। এমনিভাবে মুমিন

তার নিজের মতো একজন মানুষের অন্তরেও যদি ঈমানের প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলে, তবে তাও দ্বিতীয় প্রকার পূর্ণতার মধ্যে গণ্য হবে। কিন্তু এটা হবে ওই পূর্ণতার প্রথম স্তর মাত্র। এরপরে রয়েছে একটি দল, একটি জাতি ও একটি দেশকে কল্যাণ-পথে আহবানের স্তর। আর সর্বশেষ স্তর হলো এই যে, তার কল্যাণ-পথে আহবান হবে সমগ্র মানব সমাজের জন্যে সাধারণ সে গোটা দুনিয়াকেই সুকৃতির দিকে ডাকবে, তামাম বিশ্বজাহানে সে খোদায়ী ফৌজদারে পরিণত হবে এবং অন্যায় ও দুষ্কৃতিকে দেখা মাত্রই তার মূলোৎ-পাটনের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এই ব্যাপারে সে নিজেকে কোনো বিশেষ বংশ, বিশেষ জাতি, বিশেষ দেশ এবং বিশেষ গোত্রীয় ও ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ মনে করবেনা। এটা হচ্ছে ঈমানী পূর্ণতার সবচাইতে বড়ো এবং উন্নত স্তর। আর আল্লাহ যেহেতু প্রতিটি ব্যাপারে মুসলমানদের সামনে এক বুলন্দ লক্ষ্যস্থল পেশ করেছেন এবং কোথাও তাদের নিরুৎসাহ হবার শিক্ষাদান করেননি, এজন্যেই সামনে এগিয়ে দ্বাদশ রুকুতে স্পষ্টত বলে দেয়া হয়েছে যে, গোটা দুনিয়াকে খোদায়ী বিধানের অধীন বানাবার চেষ্টা হচ্ছে মুসলমানের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের চরমতম লক্ষ্যঃ

كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

'তোমরা সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির জন্যে; তোমরা সুকৃতির আদেশ দাও, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করো।'

ولتكن منكم امة الخ শীর্ষক আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদটা منكم শব্দ সম্পর্কে। একদল বলেন যে, এখানে من বিশিষ্টার্থ বুঝাবার জন্যে নয়, সার্বজনীনতা বুঝাবার জন্যে এসেছে। দ্বিতীয় দল বলেনঃ না, বিশিষ্টার্থ বুঝাবার জন্যেই এসেছে।

প্রথম দলের যুক্তিধারা এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক মুমিনের জন্যে সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন।

যেমন كنتم خير امة اخرجت للناس الخ সূচক আয়াতে তিনি বিবৃত করেছেন। বস্তুত সুকৃতির আদেশ দেয়া ও দুষ্কৃতি দমন করা প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য—এ কর্তব্য হাত দ্বারা, মুখ দ্বারা কিংবা আর কিছু না পারলেও অন্তর দ্বারা পালন করতে হবে। কাজেই আয়াতটির মানে হচ্ছে এই ঃ 'তোমরা এমন উম্মতে পরিণত হও, যা' কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং দুষ্কৃতিকে প্রতিরোধ করবে। কারণ এখানে من সার্বজনীনতা বুঝাবার জন্যে এসেছে। এর দৃষ্টান্ত এই আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

فاجتنبوا الرجس من الاوثان

(মূর্তির নোংরামী থেকে বেঁচে থাকো—মূর্তির মধ্যকার নোংরা জিনিস থেকে বেঁচে থাকো নয়।)

দ্বিতীয় দল বলেন যে, এখানে من বিশিষ্টার্থের জন্যে এসেছে। এর দুটি কারণ রয়েছে ঃ প্রথমত মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রুগ্ন লোকদের নিয়ে গঠিত, এরা কল্যাণ-পথে আহবান এবং সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধের দায়িত্ব পালন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত সুকৃতির আদেশ ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধের জন্যে কিছু শর্তাবলী রয়েছে; যা' প্রত্যেক লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। এর জন্যে কল্যাণ ও সুকৃতি সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা দরকার। এর জন্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। এর জন্যে প্রথমে সংশ্লিষ্ট লোকদের পূর্ণমানের মুত্তাকী ও পরহেজগার হওয়া এবং তারপরই লোকদেরকে তাকওয়া ও পরহেজগারীর দাওয়াত দেয়া আবশ্যক।

কিন্তু আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাত সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলে এ মতানৈক্য সহজেই দূর হতে পারে।

ইতিপূর্বে আমরা কালামুল্লাহ থেকে দুটি পূর্ণতার কথা উল্লেখ করেছি। এর প্রথম প্রকার পূর্ণতা অর্থাৎ খোদাকে ভয় করা, খোদায়ী বিধানের সামনে মাথা নত করা এবং খোদার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরা মুমিন ব্যক্তির জীবনে ঈমানী বৈশিষ্ট্যের রূপায়ণের জন্যেই প্রয়োজন। কাজেই প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে এই পূর্ণতার কোনো না কোনো স্তর অবশ্যই থাকতে হবে—যদি তার মধ্যে আদৌ কোনো স্তর না থাকে তো সে মুমিন বলেই গণ্য

হবে না। যেমনঃ প্রদীপে আলো না থাকলে তা প্রদীপই হয় না, বরফে শীতলতা না থাকলে তা' বরফই হবে না, আগুনে উত্তাপ না থাকলেতো আগুনই হতে পারে না—ঈমান ও মুমিনের এই সম্পর্কটি ঠিক তেমনি। এই কারণে আল্লাহতায়ালা সমস্ত মুমিনকে সম্বোধন করে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলেছেনঃ اتقوا الله حق تقته

ولا تموتن الا وانتم مسلمون - واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا-

এই আয়াতে বিশিষ্টতার নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই, বরং এতে সার্বজনীনভাবে তাকীদ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এ-গুণটি প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে অনিবার্যভাবে থাকতে হবে।

আর দ্বিতীয় প্রকার পূর্ণতা হচ্ছে একটা বাড়তি জিনিস। এটা শুধু মুমিনের মুমিন হবার জন্যে নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ ও উন্নতমানের মুমিন হবার জন্যে প্রয়োজন। এখন এই পূর্ণতার দিক থেকে একটা জাতির দুটি অবস্থাই হতে পারেঃ একটি হচ্ছে এই যে, জাতির অন্তত একটি অংশ পূর্ণ ঈমানের এই উচ্চতম মানের সৃষ্টি হবে আর বাকী লোকেরা প্রথম প্রকার গুণরাজিতে ভূষিত হবে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তোমরা যদি প্রথম অবস্থায় থাকো, অর্থাৎ তোমাদের গোটা জাতি যদি দুনিয়ায় সৎপথের মশাল বহনকারী এবং অন্য সব জাতির জন্যে সুকৃতির আদেশ দান ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটনকারী শক্তিতে পরিণত হয়, তবে তোমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিগণিত হবে। كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنهون عن المنكر وتومنون بالله কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি এই উচ্চ শ্রেণীর হিম্মতশূন্য থাকে এবং গোটা জাতি এইরূপ গুণে গুণান্বিত না হয়, তাহলে তোমাদের মধ্যে অন্তত এমন একটি দল থাকা উচিত, যা' লোকদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير

এ কারণেই প্রথম আয়াতে সার্বজনীনতা রয়েছে, কিন্তু তাকীদ নেই। আর দ্বিতীয় আয়াতে তাকীদ রয়েছে, কিন্তু সার্বজনীনতা নেই।

ঈমানী পূর্ণতার এই যে দুটি স্তরের কথা বারবার ঘুরে আসছে, এটা চুলচেরা বিচারে দুই বটে, কিন্তু মূলত দু'টি একই জিনিস। যে-ব্যক্তির মনে সুদৃঢ় ঈমান বর্তমান থাকবে, যে আল্লাহকে সঠিকভাবে ভয় করবে, সে কাউকে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হতে দেখেও সৎপথের দিকে আহবান জানাবে না, দুষ্কৃতির চিহ্ন দেখেও তাকে নির্মূল করার চেষ্টা করবে না, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। মুমিনের প্রকৃতি হচ্ছে মেশ্কের মতো, ঈমানের সৌরভ শুধু তার দেহ পর্যন্তই সীমিত থাকে না, বরং যতোদূর সম্ভব তা' বাইরেও ব্যাপ্তি লাভ করে। কিংবা তাকে প্রদীপের সাথেও তুলনা করা চলে ঃ ঈমানের আলোয় সে কেবল নিজেই আলোকিত হয় না, আশপাশের পরিমণ্ডলে নিজের দীপ্তিও বিকিরণ করে। মেশ্কে যতোক্ষণ সৌরভ থাকবে, তা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সুবাসিত করতে থাকবেই। প্রদীপ যতোক্ষণ আলোকিত থাকবে, তা আলোক বিকিরণ করতে থাকবেই। কিন্তু মেশকের সুগন্ধি যখন অতি নিকট থেকেও অনুভূত হবে না, তখন সকলে এ কথাই ভাববে যে, মেশক আর প্রকৃত মেশক নেই—তা অন্য কিছু হয়ে গিয়েছে। প্রদীপের আলো যখন নিকটতম পরিবেশকেও আলোকিত করবে না, তখন সকলে এটাই সিদ্ধান্ত করবে যে, প্রদীপ তার দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। মুমিনের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। সে যদি কল্যাণের দিকে না ডাকে, সুকৃতির আদেশ না দেয়, দুষ্কৃতিকে বরদাশত করে এবং তার প্রতিরোধের জন্যে সচেষ্ট না হয়, তাহলে একথাই প্রমাণিত হবে যে, তার মধ্যে খোদাভীতির আগুন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে এবং ঈমানের আলো স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।

এ কারণেই নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে যে-কেউ দুষ্কৃতি দেখবে, সে অবশ্যই হাতের দ্বারা তার মূলোৎপাটন করবে, তাতে সমর্থ না হলে মুখের দ্বারা করবে আর তাতেও অসমর্থ হলে অন্তরে তাকে মন্দ জানবে এবং তাকে নির্মূল করার আকাংখা পোষণ করবে। কারণ এ হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।' 'যে হৃদয়ে দুষ্কৃতির প্রতি ঘৃণা পর্যন্ত নেই, তাতে সর্ষে পরিমাণও ঈমান নেই।' এ কারণেই কোরআন মজীদে মুমিনদের গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা সুকৃতির আদেশ দান করে ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখে।

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض - يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر - (التوبة ٧١)

'মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সাহায্যকারী। (তারা) সুকৃতির আদেশ দেয় ও দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখে।'

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله - (التوبه - ١١٢)

'তারা তওবাকারী, ইবাদাতকারী, খোদার প্রশংসাকারী, খোদার পথে পরিভ্রমণকারী, রুকূ-সিজদাকারী, সুকৃতির আদেশদানকারী, দুষ্কৃতির প্রতিরোধকারী এবং খোদার নির্দিষ্ট সীমা রক্ষাকারী।'

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (الحج - ١٢)

'এদেরকে আমরা দুনিয়ায় রাষ্ট্রশক্তি দান করলে নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে, সুকৃতির আদেশ দেবে এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখবে।'

তাহলে সুকৃতির আদেশ দান ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ যখন মুমিনের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ, তখন তাকে 'ফরযে কেফায়া'র মর্যাদা দেয়ার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? আর মুসলমানদের গোটা জাতির মধ্যে মাত্র একটি দলকেই সুকৃতির আদেশদানকারী ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধকারী মনে করার মূলে কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? এর জবাব এই যে, সর্বজ্ঞ ও সবজান্তা খোদা ভালো করেই জানতেন যে, নবুয়্যতের যুগ অতিক্রান্ত

হবার পর মুসলমানদের ঈমান ক্রমশ দুর্বলতর হতে থাকবে। কালের অগ্র-গতির সঙ্গে সঙ্গে এ-জাতি ক্রমশ অধঃপতনের দিকে নেমে যেতে থাকবে। এমন কি, একদিন কোটি-কোটি মুসলমান দুনিয়ায় বর্তমানে থাকবে, কিন্তু তাদের ঈমানের দীপে অতি নিকট-পরিবেশকে আলোকিত করার মতো দীপ্তিও বাকী থাকবে না; বরং কুফরীর গাঢ় অন্ধকারে তাদের নিজেদেরই আলো নিভে যাবার আশঙ্কা দেখা দেবে। আর এমনি পরিস্থিতির জন্যেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে অন্তত এমন একটি দল অবশ্যই থাকা উচিত, যা' কল্যাণের দিকে আহবান জানাবে এবং দুষ্কৃতির প্রতিরোধ করবে। কারণ তোমাদের মধ্যে যদি এমন একটি দলও বর্তমান না থাকে, তাহলে খোদায়ী আজাব এবং চরম ধ্বংস ও বিনাশ থেকে কোনো জিনিসই তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

এই বিষয়টিকে কোরআন মজীদ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى
ابن مريم ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون - كانوا لا يتناهون
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (المائده - ۱۱)

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো, তাদের প্রতি দাউদ এবং ঈসা ইবনে মরিয়মের ভাষায় লা'নত বর্ষণ করা হয়েছিলো। এই কারণে যে, তারা বিদ্রোহ করেছিলো এবং সীমা অতিক্রম করে চলতো। তারা একে অপরকে মন্দ কাজের অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখতো না। তাদের এ কাজটা ছিলো অত্যন্ত খারাপ জিনিস।' অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فلولا كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد
في الارض الا قليل ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا

ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين - وما كان ربك ليهلك القرى
بظلم واهلها مصلحون (هود-١٠)

তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলোর মধ্যে এমন কিছু লোক কেন থাকলোনা যারা দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করতো? তাদের মধ্যে এরূপ লোক থাকলেও তারা সংখ্যায় ছিলো খুবই নগণ্য। তাই তাদেরকে আমরা নিষ্কৃতি দান করেছিলাম। বাকী জালেম লোকেরা ছিলো অপরাধী। তাদেরকে যেসব আনন্দদায়ক জিনিস দেয়া হয়েছিলো তার পিছনেই তারা পড়েছিলো। কাজেই হে নবী। তোমার প্রভু জনপদগুলোকে এমনিই জুলুমের দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন—যদি তার বাশিন্দারা সৎকর্মশীল হয়, তবুও—তিনি এমন নন্।

এই বিষয়টিকে নবী করীম (সা.) ও বিবৃত করেছেন:

ان الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين
ظهر انيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكروه فاذا فعلوا
ذلك عذب الله الخاصة والعامة (رؤاه احمد)

'আল্লাহ বিশিষ্ট লোকদের দুষ্কৃতির জন্যে সাধারণ লোককে শাস্তি দেননা। অবশ্য সাধারণ লোকেরা যখন নিজেদের সামনে দুষ্কৃতি অনুষ্ঠিত হতে দেখে এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করেনা, তখনকার কথা আলাদা। তারা যখন এরূপ করতে শুরু করে, আল্লাহ তখন অসাধারণ ও সাধারণ নির্বিশেষে সবার প্রতি আজাব নাজিল করেন।'

والذى نفسى بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
ولتاخذن على يد المسىء ولتاطرنه على الحق اطراء
او ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض او ليلعنكم كما لعنهم -
(رواه الترمذى وابو داؤد وابن ماجه باختلاف قليل)

'যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ। সুকৃতির আদেশ দেয়া দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখা, দুষ্কৃতিকারীর হাত পাকড়াও করা এবং তাকে সত্যের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া তোমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। নচেত আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের খারাবী একে অপরের ওপর চাপিয়ে দেবেন।

কিংবা বনী ইসরাঈলের ওপর যেমন করা হয়েছিলো তেমনি তোমাদের প্রতি লা'নত করবেন।'

কাজেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ولتكن منكم امة الخ সূচক আয়াতের বিশিষ্টতা এই অর্থে নয় যে, মুসলমানদের মধ্যে কল্যাণ-পথে আহবান, সুকৃতির আদেশ দান ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধের জন্যে কেবল একটি দল থাকাই বাঞ্ছনীয় এবং বাকী মুসলমানদের জন্যে এ-কাজ করা অবশ্য-কর্তব্যই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে এর মানে হচ্ছে এই যে, মুসলমানদের অন্তত একটি দল অবশ্যই থাকা দরকার, যা' কল্যাণের দীপকে আলোকিত রাখবে এবং দুষ্কৃতির আঁধারকে দূর করতে থাকবে। এমন একটি দলও যদি তাদের মধ্যে বর্তমান না থাকে, তবে শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া তো দূরের কথা, এ জাতির পক্ষে খোদার আজাব ও তাঁর লা'নত থেকে রক্ষা পাওয়াও অসম্ভব ব্যাপার।

(প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩)

খোদায়ী আজাব নাজিলের বিধি

অতীতে যেসব জাতির ওপর খোদায়ী আজাব নাজিল হয়েছে, কোরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় তাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। সেসব বর্ণনায় দেখা যায়, সকল জাতির ওপর একই ধরনের আজাব অবতরণ করেনি, বরং প্রত্যেক জাতির ওপরই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আজাব অবতীর্ণ হয়েছে। আদ জাতির ওপর এক রকমের আজাব অবতরণ করেছে। সামুদ জাতির ওপর করেছে অন্য রকমের। মাদায়েনবাসীর ওপর করেছে ভিন্ন এক রূপে। আবার ফেরাউন পরিবারের ওপর করেছে এক নতুন ধরনের। কিন্তু আজাবের রূপ ও ধরনে যতোই বিভিন্নতা থাকুক, যে বিধি অনুযায়ী এই আজাব অবতীর্ণ হয়, তা বরাবর একই রয়েছে এবং তা' কখনো পরিবর্তিত হয় না।

سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا

আজাব নাজিলের এই নির্দিষ্ট বিধির সমস্ত ধারাই পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ কোরআন মজীদে উল্লিখিত হয়েছে। এর প্রথম ধারা হলো এই যে, যখন কোনো জাতির ঐশ্বর্য বিপুল পরিমাণে বেড়ে যায়, তখন সে দুষ্কৃতি ও গোমরাহীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার গোটা কর্মশক্তিই সুকৃতির পথ ছেড়ে বিকৃতি ও বিপর্যয়ের পথে ধাবিত হয়।

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق

عليها القول فدمرناها تدميرا (بنى اسرائيل - ٢)

'আমরা যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার অভিপ্রায় করি, তখন তার বিত্তশালী লোকদেরকে নির্দেশ[১] দেই এবং তারা সেই জনপদে পাপাচার ও নাফরমানী করতে শুরু করে। অতঃপর সে জনপদটি আজাবের উপযুক্ত হয়ে যায় আর আমরা তাকে ধ্বংস ও বিলুপ্ত করে ফেলি।'

দ্বিতীয় সাধারণ নীতি হলো এই যে, খোদা কোনো জাতির ওপর জুলুম করেন না। দুষ্কৃতিকারী জাতি নিজেই নিজের ওপর জুলুম করতে থাকে। খোদা কোনো জাতিকে নিয়ামত দান করে তা কখনো ছিনিয়ে নেন না। জালেম কওম নিজেই তার নিয়ামতের মূলোৎপাটনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং তার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করে।

ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم (انفال - ٨)

'এটা এই জন্যে যে আল্লাহ কোনো জাতিকে নিয়ামত দান করে তা কখনো পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না সে জাতি নিজেই নিজেকে পরিবর্তিত করে।'

فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (توبه - ٩)

'আল্লাহ এরূপ নন যে, তাদের ওপর জুলুম করবেন বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিলো।'

পরন্তু এটাও সেই বিধানের একটি ধারা যে, খোদা জুলুমের কারণে কাউকে পাকড়াও করতে তাড়াহুড়ো করেন না বরং তিনি জালেমকে অবকাশ দান করেন এবং বারবার সতর্ক করতে থাকেন—যাতে করে সে সদুপদেশ লাভ করে এবং সংযত হয়।

---

(১) এখানে নির্দেশ মানে হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্দেশ। প্রাকৃতিক বিধানের প্রতিটি ধারাকেই কোরআন খোদায়ী অনুমতি বলে উল্লেখ করেছে। এ সম্পর্কে আমার জবর ও কদর جبر و قدر নামক পুস্তিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن
يؤخرهم الى اجل مسمى (النحل - ٨)

'আল্লাহ যদি লোকদেরকে তাদের জুলুমের কারণেই পাকড়াও করতেন তো দুনিয়ায় কোনো প্রাণীরই অস্তিত্ব থাকতো না। কিন্তু তিনি লোকদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন।'

ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذنهم بالباساء والضراء لعلهم
يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون (انعام - ٥)

'আমরা তোমাদের পূর্বেকার জাতিগুলোর মধ্যেও এইভাবে নবী পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছি, যেনো তারা আমাদের প্রতি বিনয়াবনত হয়। কাজেই তাদের ওপর যখন আমাদের তরফ থেকে আজাব এসেছে, তখন কেন তারা আমাদের সামনে বিনম্র হয়নি? আসলে তাদের অন্তরই কঠিন হয়ে গিয়েছিলো। আর শয়তান তাদের আচরণকে তাদের চোখে সুদৃশ্য করে তুলেছিলো।

এক অবকাশ কালে প্রায়শ এমনও হয়ে থাকে যে, জালেম ও অত্যাচারী জাতিগুলোকে ঐশ্বর্যের মোহে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে তারা আত্মপ্রতারণার কবলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং বাস্তবিকই এই ধারণা করে বসে যে, আমরা নিশ্চয়ই পুণ্যবান লোক, নচেত আমাদের ওপর এতো অনুগ্রহ সম্পদ কেন অবতীর্ণ হবে!

يحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في
الخيرات بل لا يشعرون (مؤمنون - ٣)

'এরা কি মনে করছে যে, আমরা যে ধনমাল ও সন্তানাদির দ্বারা এদের সাহায্য করে যাচ্ছি (তার অর্থ এই যে), আমরা এদের কল্যাণ

সাধনে তাড়াহুড়ো করছি? (কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এটা নয়। প্রকৃত ব্যাপার যা) তা এরা বোঝেনা।'১

শেষ পর্যন্ত যখন সে-জাতি কোনো সতর্কবাণীতেই সংযত হয় না, বরং জুলুম ও সীমা-লংঘনই করে যেতে থাকে, তখন খোদা তার প্রতি আজাব নাজিলের ফয়সালা করেন। আর তার ওপর যখন আজাবের হুকুম হয়ে যায়, তখন কোনো শক্তিই তাকে সে আজাব থেকে বাঁচাতে পারে না।

وتلك القرى اهلكنهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا -

(الكهف - ٨)

'এই জনপদগুলো (যার নিদর্শনাদি তোমরা দেখতে পাচ্ছো) আমরা ঠিক তখনি ধ্বংস করেছি, যখন এরা নিজেরা জুলুম করেছে আর আমরা তাদের ধ্বংস হবার জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম।'

وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهى ظالمه ان اخذه

اليم شديد (هود - ٩)

'তোমার প্রভু জালেম ও সীমা-লংঘনকারী জনপদগুলোকে যখন পাকড়াও করেন, তখন এমনি নির্মমভাবেই পাকড়াও করে থাকেন। আর তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে থাকে।

واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه

من وال (رعد - ٢)

'খোদা যখন কোনো জাতির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায় করেন, তখন কোনো শক্তিই সে ক্ষতিকে প্রতিরোধ করতে পারে না। পরন্তু খোদার মুকাবিলায় কেউ তাদের সাহায্য করতেও আসে না।'

---

(১) এক শ্রেণীর নির্বোধ লোক খোদার নিয়ম বুঝতে না পারার কারণে এদের ঐশ্বর্য দেখে ভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তারা ভাবে, এরা নিশ্চয়ই ঈমানদার, সৎকর্মশীল এবং খোদার প্রিয়পাত্র, নচেত এরা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কী করে পেলো? কিন্তু যারা পাথিব সমৃদ্ধিকেই খোদার প্রিয়পাত্র হবার লক্ষণ মনে করে, কোরআন তাদের ভ্রান্তির কিভাবে প্রতিবাদ করছে, দেখুন।

খোদায়ী আজাবের এই অপরিবর্তনীয় বিধান যেরূপ পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ওপর ক্রিয়াশীল ছিলো, তেমনি আজো এর ক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অন্তর্দৃষ্টি থাকলে আজো আপনারা স্বচক্ষে এর কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। পাশ্চাত্যের যেসব বড়ো বড়ো জাতির ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি, শৌর্য ও বীর্য, প্রভাব ও প্রতাপ, বুদ্ধিবৃত্তি ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখে লোকদের দৃষ্টি-বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং যাদের ওপর অনুগ্রহ-সম্পদের অবিরাম বর্ষণ দেখে এই ভ্রান্তিবোধের সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত এরা খোদার খুবই প্রিয়পাত্র এবং মঙ্গল ও কল্যাণের সাক্ষাত প্রতিমূর্তি, তাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি একটু গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন। তা' হলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে, তারাও খোদায়ী আজাবের এই বিধানের আওতায় এসে পড়েছে এবং তারা নিজস্ব পসন্দ ও ক্ষমতা বলে নিজেদেরকে এমন জুলুমের (নিজেদের প্রতি জুলুম) কবলে নিক্ষেপ করেছে, যা তাদেরকে অতি দ্রুততার সঙ্গে ধ্বংস ও বিনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

যে শিল্পকলার প্রাচুর্য, যে বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি, যে রাজনৈতিক সাফল্য, যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, যে গগনচুম্বী সামাজিক প্রগতি ঐ জাতি-গুলোকে দুনিয়ার বুকে কর্তৃত্বশালী করেছে, জগতময় তাদের খ্যাতি-যশ প্রতিষ্ঠা করেছে, আজ তা-ই এক মারাত্মক জালে পরিণত হয়ে তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। সে-জালে রয়েছে অসংখ্য ফাঁদ এবং তার প্রত্যেক ফাঁদে রয়েছে অগুণতি বিপদ। তারা বুদ্ধির কৌশল দ্বারা যে ফাঁদই কাটবার চেষ্টা করে, তার প্রতিটি রজ্জুর বদলে এক নতুন ফাঁদের সৃষ্টি হয়। মুক্তির প্রত্যেক প্রচেষ্টাই অধিকতর বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে পাশ্চাত্য জাতিগুলো যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক ও তামুদ্দুনিক সঙ্কটে লিপ্ত, তার সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার অবকাশ এখানে নেই। তবে আলোচ্য বিষয়কে সুস্পষ্ট করার জন্যে এখানে শুধু চিত্রের একটি মাত্র দিক পেশ করা যাচ্ছে। এ থেকেই জানা যাবে যে, এই জাতিগুলো কিভাবে নিজেদের ওপর জুলুম করে চলছে এবং কিভাবে নিজেদের ধ্বংসের উপকরণ নিজ হাতেই সংগ্রহ করছে।

ইয়োরোপবাসী তাদের অর্থনৈতিক, তামদ্দুনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা-বলীর কারণ নির্ধারণ ও সেসবের প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করার ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের ভ্রান্তির পরিচয় দিচ্ছে। তাদের একটা ভ্রান্তি হচ্ছে এই

যে, তারা অধিক জনসংখ্যাকে তাদের সমস্যাবলীর প্রধান বরং আসল কারণ ভেবে বসেছে এবং জন্মহার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করাকে এর সঠিক প্রতিকার বলে ধরে নিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণাটিও অত্যন্ত দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছে। এটি লোকদের মনে এমনিভাবে বদ্ধমূল হচ্ছে যে, তারা আপন সন্তানকেই তাদের সবচাইতে বড়ো দুশমন বলে মনে করছে। অন্যকথায়, তারা আপন সন্তানেরই সবচাইতে বড়ো দুশমনে পরিণত হয়েছে। তাই জন্মনিরোধের নতুন নতুন প্রক্রিয়া—যা পূর্বে কেউ কল্পনাও করেনি—সাধারণ্যে প্রচলিত হতে শুরু করেছে। এ-আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে ব্যাপকতর প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্য বিশেষ বই-পুস্তক, ইশ্‌তেহার ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে। নানারূপ সংঘ ও সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক নারী ও পুরুষকে এ-সম্পর্কে জরুরী তথ্য সরবরাহ এবং কার্যকর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোটকথা, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমাজ 'সংস্কারকগণ' তাদের নব্য বংশধরের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। এ যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে শেষ হবে, সংস্কারের আগ্রহাতিশয্যে তাঁদের এটুকু ভেবে দেখবারও অবসর হয়নি।

সন্তানোৎপাদনের প্রতি পাশ্চাত্য জাতিগুলোর এই বিতৃষ্ণা এতো চরমে গিয়ে পৌঁছে যে, জন্মনিরোধের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে ফাঁকি দিয়ে যেসব গর্ভ সঞ্চারিত হতো, সেগুলোও প্রায়শ বিচ্যুত করা হতো। রাশিয়ায় তো এটা আইনসঙ্গত-ভাবেই বৈধ করে দেয়া হয় এবং প্রত্যেক নারীর উর্ধ্বতন তিন মাসের গর্ভস্খলন[১] করার অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য যেসব ইয়োরোপীয় দেশে গর্ভপাত আইনগতভাবে নিষিদ্ধ, সেখানেও গোপন গর্ভপাতের আধিক্য মহামারীর পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। ফ্রান্সে সাধারণভাবেই স্বীকার করা হয় যে, সেখানে প্রতি বছর যতো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, প্রায় ততো গর্ভই স্খলন করা হয়; বরং অনেক ডাক্তারের অভিমত হচ্ছে, গর্ভপাতের সংখ্যা জনসংখ্যার চাইতেও বেশী। তিরিশ-চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে আদৌ

(১) কয়েক বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতার পর ইদানীং বিপ্লবী অস্থিরতা কিছুটা কমে গিয়েছে। তাই ঈসায়ী ১৯৩৭ সালে গর্ভপাতের বৈধতা সংক্রান্ত সাধারণ বিধি রহিত করে দেয়া হয়। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক লক্ষ লোক হারাবার পর রুশ সরকার আজ তার জাতিকে জন্মহার বাড়াবার জন্য নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন।

গর্ভপাত করেনি এমন নারী সেখানে খুঁজে পাওয়াই কঠিন। আইনের দৃষ্টিতে যদিও এটা অপরাধ, কিন্তু চিকিৎসালয়গুলোতে প্রকাশ্যেই এ সকল কাজ সম্পাদিত হয় এবং রেজিষ্টারে কাল্পনিক রোগের নাম লিখিয়ে দেয়া হয়। ইংল্যাণ্ডে এমন বহু ধাত্রী রয়েছে, যারা শুধু গর্ভপাতের দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। জনৈক ডাক্তারের অনুমান হচ্ছে এই যে, প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে চারজন অবশ্যই কখনো না কখনো গর্ভপাত করে থাকবে। জার্মানীতে বছরে প্রায় দশ লক্ষ গর্ভস্খালন করা হয়।[১] সেখানে জীবিত শিশু জন্মের সংখ্যাও এইরূপ। কোন কোন জার্মান শহরে তো অনুমান করা হয়েছে যে গত বিশ বছরে যতো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার চাইতে দ্বিগুণ গর্ভস্খালন করা হয়েছে।

যে নারীর মধ্যে প্রকৃতি এক তীব্র মাতৃত্ব বোধ দান করেছিলো, আজ পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সে সীমাহীন নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে গিয়েছে। তখন পেটের সন্তানকে হত্যা করার জন্য সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তুলতেও কুণ্ঠিত নয়। বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নরমান হেয়ার (Dr. Norman Haire) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন যে, একজন গর্ভবতী নারী তাঁর কাছে আসে এবং গর্ভপাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে। যখন আইনগত বাধার কারণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করা হয়, তখন সে নানারূপ বিষাক্ত ঔষধ খেয়ে গর্ভ স্খলনের চেষ্টা করে। সিঁড়ির ওপর থেকে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে ঘুরপাক দিয়ে ফেলে দেয়। উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে। ভারি বোঝা কাঁখে তুলে নেয়। এতেও যখন তার গর্ভস্খলিত হলো না, তখন শেষ উপায় হিসেবে এক আনাড়ী কবিরাজের ঔষধ খেয়ে সে জীবনলীলা একেবারে সাঙ্গ করে ফেলে। মাদাম আলব্রেশ্ট (Madame Albrecht) বলেন যে, মেয়েরা গর্ভপাত করার জন্যে এমন সব কাণ্ড করে থাকে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ কঠিন অস্ত্র দ্বারা পেটের ওপর আঘাত হানা, নানারূপ অস্ত্রের সাহায্যে গর্ভশয়কে জখম করা, অমানুষিক পন্থায় নর্তন করা, স্বেচ্ছায় নিজেকে উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেয়া, কঠিনতম বিষাক্ত দ্রব্য এমনকি বারূদ পর্যন্ত খেয়ে ফেলা ইত্যাদি।

---

(১) পরে নাজী আন্দোলন এই মহামারীকে কঠোরভাবে দমন করার চেষ্টা করে এবং এর ধ্বংসাত্মক পরিণাম উপলব্ধি করে জন্মহার বৃদ্ধির জন্যে এক প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে।

তিনি এক ফরাসী মহিলার কাহিনী বিবৃত করে বলেন যে, গর্ভের প্রতি বিরক্ত হয়ে সে একটি লম্বা সুচের দ্বারা গর্ভাশয়ের মধ্যে খোঁচাতে খোঁচাতে এমনি জখম করে ফেলে যে রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের উন্মাদ-সুলভ কাণ্ডের ফলে প্রতিবছর বহু নারী মৃত্যুবরণ করে। অনুমান করা হয়েছে যে, ইংল্যাণ্ডের নারী ক্লিনিকগুলোতে প্রতিবছর যতো নারী মারা যায়, তার অর্ধেকই হচ্ছে গর্ভপাতের ফল। অন্যান্য দেশগুলোর অবস্থাও এইরূপ।

এম, পল, বুয়র 'নৈতিক দেউলিয়াতের পথে' (Towards Moral Bankruptcy) নামক পুস্তকে প্যারিসের একটি নর্তকী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে নিজের নবজাত শিশুর মাথায় অত্যন্ত নির্দয়ভাবে পেরেক ঠুকে ঠুকে তাকে হত্যা করেছে। তাকে আদালতে হাজির করা হলে নিজের জবান-বন্দীতে সে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে যে, এই শিশুর জন্ম আমার জীবনের আনন্দ বিলাসকে বিস্বাদ করে দিয়েছিলো, এই কারণে তাকে আমি হত্যা করেছি।

এই ভয়াবহ শিশু হত্যার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় এই যে, ইয়োরোপের জন্মহার অত্যন্ত দ্রুত হ্রাস পেয়ে যায়। ঈসায়ী ১৮৭৬ এবং ১৯৩০ সালের পরিসংখ্যান তুলনা করলেই এর প্রমাণ মিলবে। এই সময় ইংল্যাণ্ড এবং ওয়েলসে জন্মহার শতকরা ৩৬'২ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৬'৩ (এবং ১৯৩১ সালে ১৫'৮) ভাগে এসে পৌঁছেছে। জার্মানীতে ৪০'৯ ভাগ থেকে ১৭'৫ ভাগে, ইতালীতে ৩৯'২ ভাগ থেকে ২৬'৭ ভাগে, সুইডেন ৩০'৮ ভাগ থেকে ১৫'৪ ভাগ এবং নিউজিল্যাণ্ডে ৪১'০ ভাগ থেকে ১৮'০ ভাগে নেমে যায়।[১]

আপাতত এই দেশগুলোতে মৃত্যুহারও যেহেতু প্রায় এই অনুপাতেই কমে গিয়েছে; তাই জনসংখ্যা মোটামুটি এক জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে আছে। কিন্তু অনুমান করা হয়েছে যে, জন্মহার যদি এভাবেই কমতে থাকে, তাহলে দশ বছর পরে এই স্থিতিশীলতাও বজায় থাকবে না। বরং জনসংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করবে।

এ ব্যাপারে সবচাইতে বিপদজ্জনক অবস্থা হচ্ছে ফ্রান্সের। সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র দেশের জনসংখ্যাই দিন দিন

(১) এই প্রবন্ধ ১৯৩৩ সালে লেখা হয়েছিলো। এরপর ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই হার যথাক্রমে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে ১৬'৮ ভাগে, জার্মানীতে ১৭'০ ভাগে ইতালীতে ১৭'৯ ভাগে, সুইডেনে ১৪'২ ভাগে হ্রাস পেয়েছে (U. N. Demographic Year Book for 1959 থেকে উদ্ধৃত)—অনুবাদক

হ্রাস পেয়ে চলছে। ঈসায়ী ১৮৮০ সালে সেখানকার জন্মহার প্রতি হাজারে ২৫.২ ভাগ ছিলো আর ১৯৩১ সালে এসে তা ১৭.১ ভাগে নেমে যায়। কিন্তু সে অনুপাতে মৃত্যুহার কমেনি। ১৮৮০ সালে মৃত্যুহার ২২.৬ ভাগ ছিলো আর ১৯৩১ সালে তা মাত্র ১৬.৩ ভাগে নেমে যায়। ফ্রান্সের প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র জার্মানী ও ইতালীতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যথাক্রমে ১৩৫ ও ১৩০ জন লোক বাস করে। কিন্তু ফ্রান্সে প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যার গড় হচ্ছে মাত্র ৭৩ জন। ১৯৩১ সালে ফ্রান্সে মোট ৭৩০২৪৯টি শিশু জন্মগ্রহণ করে। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানীতে ভূমিষ্ঠ শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ১০৩১৫০৮।

মিস সুস্‌লী হ্যামিল্টন তাঁর 'আধুনিক ফ্রান্স' (Modern France) পুস্তকে লিখেছেন যে, এই পরিস্থিতি ফ্রান্সের রাজনৈতিক মহলে এক গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। এর অশুভ প্রভাব শুধু ফ্রান্স নয়, বরং গোটা দুনিয়ার রাজনীতির ওপর পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। ফ্রান্সের বিলাসপ্রিয় জনগণ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। ইতালী, পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশের বাসিন্দারাও বাস্তুত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে আসছে এবং এখানকার ভূমি দখল করে বসছে। এভাবে প্রতি সপ্তাহে ৬ হাজার বাস্তুত্যাগী ফ্রান্সে প্রবেশ করছে বলে অনুমান করা হয়েছে। ঈসায়ী ১৯২৫ সালে ফ্রান্সে যতো শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার মধ্যে শতকরা প্রায় ৯ ভাগই ছিলো বহিরাগতদের। এর থেকে ফরাসী রাজনীতিজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসবে, যখন ফরাসীরা নিজ গৃহেই বহিরাগতদের (সংখ্যাধিক্যের কারণে) অধীন হয়ে পড়বে। তবু এ আশঙ্কা সুদূরপরাহত; বরং নিকটতম আশঙ্কা হচ্ছে এই যে, ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী ও ইতালীর জনসংখ্যা তার চাইতে অনেক বেশি। যদি অস্ত্র হ্রাস করার প্রস্তাব মঞ্জুর করে ফ্রান্স তার সমরাস্ত্র কমিয়ে দেয়, তবে আগামী যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যার প্রাচুর্যের ওপরই সাফল্য নির্ভর করবে আর এক্ষেত্রে একাকী জার্মানী এবং ইতালীই ফ্রান্সের ওপর বিজয় লাভ করবে।১ এহেন আশঙ্কার কারণেই আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে ফ্রান্সের কর্মনীতি অন্যান্য জাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইয়োরোপ তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য যে 'বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা' অবলম্বন করছে, এই হচ্ছে তার ফলশ্রুতি।

---

(১) এই অবস্থার শোচনীয় পরিণতি অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্রান্স দেখতে পেয়েছে।

বর্তমানে ফ্রান্স ছাড়া অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের জনসংখ্যা কেবল এই কারণে স্থিতিশীল হয়ে আছে যে, মৃত্যুহারের চাইতে জন্মহার এখনো বেশি। এই কারণে জন্মহার হ্রাস পাবার প্রভাব এখনো জনসংখ্যার ওপর পড়েনি। কিন্তু ইয়োরোপবাসীর কাছে এটা বিশ্বাস করবার কি যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, জন্মহার ও মৃত্যুহারের এই অনুপাত চিরকাল বজায় থাকবে? তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে, কোনোদিন পশ্চিম আফ্রিকার মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু নিয়ে তাদেরই বিমানে চড়ে ইয়োরোপ গিয়ে পৌঁছবে না? তারা কি এ সম্পর্কে কোনো নিশ্চয়তা লাভ করেছে যে, ইয়োরোপে কখনো আকস্মিকভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্লেগ, কলেরা এবং এই ধরনের অপর কোনো মহামারী বিস্তার লাভ করবে না? তারা কি এ ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হয়ে গিয়েছে যে, একদিন অকস্মাৎ ফিরিঙ্গি রাজনীতির কোনো এক বারুদাগারে তেমনি এক স্ফুলিঙ্গ এসে পড়বে না, ১৯১৪ সালে যেমন সারাজেভোতে[২] গিয়ে পড়েছিলো? এবং তারপর ফিরিঙ্গি জাতিগুলো নিজহাতে এমন সব কাণ্ড করে বসবে না, যা কোনো মহামারীও করতে পারে না?[৩] যদি এর কোনো একটি পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয় এবং অকস্মাৎ ইয়োরোপের জনসংখ্যা থেকে কয়েক কোটি মানুষ নিহত, ধ্বংস বা অকেজো হয়ে যায়, তবে সেদিনই ইয়োরোপের অধিবাসীরা জানতে পারবে যে, তারা নিজেদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছে।

افا من اهل القرى ان يا تيهم با سنا بياتا و هم نائمون ؟

او امن اهل القرى ان يا تيهم با سنا ضحى و هم يلعبون ؟

افا منوا مكر الله ؟ فلا يا من مكر الله الا القوم الخاسرون -

(اعراف - ١٢)

'জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে যে, তাদের ওপর আমাদের আজাব কখনো রাতের বেলায়—যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে—এসে পড়বে না?

---

(২) বসনিয়ার রাজধানী। এখানে জনৈক আততায়ী কর্তৃক অস্ট্রিয় যুবরাজের হত্যা কাণ্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়।—অনুবাদক

(৩) অবশেষে ১৯৩৯ সালে স্ফুলিঙ্গ এসেই পড়লো।

জনপদের লোকেরা কি এ ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছে যে, আমাদের আজাব কখনো তাদের ওপর দিনের বেলায়—যখন তারা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে—আসবে না? তারা কি আল্লাহ্‌র চাল সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে গিয়েছে? আল্লাহ্‌র চাল সম্পর্কে তো তারাই নিঃশঙ্ক হয়, যাদের ধ্বংস অবধারিত'।

এমনি একটি জাতি আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে বাস করতো, কোরআনে যাকে 'সাবা' (سبا) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জাতির বিপুল জনসংখ্যার বাস ভারত মহাসাগরের উপকূল থেকে লোহিত সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন ভারতবর্ষ এবং ইয়োরোপের মধ্যে যতো বাণিজ্য চলতো, তা সবই ছিলো এই জাতির করায়ত্ত। তার বাণিজ্য কাফেলা দক্ষিণ উপকূল থেকে পণ্যদ্রব্য নিয়ে যাত্রা করলে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত তা শুধু জনপদ ও বাগিচার ছায়ায়ই চলতে পারতো।

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وايام امنين (سبا - ٢)

কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতকে মুসিবত মনে করলো এবং তাদের এই বিশাল ও অবিচ্ছিন্ন জনপদগুলো হ্রাস করতে এবং তাদের মধ্যকার দূরত্ব বৃদ্ধি করতে চাইলো। فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم

এখানে باعد بين اسفارنا শব্দাবলী থেকে জানা যায় যে, বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কারণে যখন জনসংখ্যা বেড়ে চলছিলো এবং জনপদের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিলো তখন সেখানেও আজকের ইয়োরোপের ন্যায় একই প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছিল। আর ظلموا انفسهم থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সম্ভবত তারাও কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় জনসংখ্যা কমানোর চেষ্টা করেছিলো। অতঃপর তাদের পরিণাম

কী হয়েছিল? فجعلنهم احاديث و مزقنهم كل ممزق - ان فی ذلك لايت لكل صبار شكور (سبا - ٢) খোদা তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে এমনিভাবে ধ্বংস করে দিলেন যে, তাদের অস্তিত্ব শুধু ইতিহাসের পাতায়ই রয়ে গেলো। (প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৩৬)

জনৈক খৃষ্টান পাদ্রীর কতিপয় প্রশ্ন

'আশা করি, একজন অনুসন্ধিৎসু ও সত্যসন্ধ ব্যক্তির নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর প্রতি আলোকপাত করে শুধু প্রশ্নকারীকেই নয়, বরং গোটা পাঠক সমাজকেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ দান করবেন।

(১) কোরআনে হযরত ঈসা সম্পর্কে চারটি প্রতিশ্রুতির উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ প্রতিশ্রুতি হলোঃ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة (ال عمران-٣) ঈসার প্রতি বিশ্বাসী ও তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদের অস্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত বর্তমান থাকা এ কথাকেই অপরিহার্য করে তোলে যে, ঈসার প্রতি বিশ্বাসীগণ তাঁর আনুগত্যের ওপর অটল থাকবে। আর আনুগত্যের জন্য ঈসার শিক্ষাদীক্ষা ও হেদায়াতের সুরক্ষিত থাকা এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। এ-থেকে এটাই অনিবার্য রূপে প্রতীয়মান হয় যে, ঈসাই তাঁর চিরন্তন শিক্ষা ও হেদায়াতের পরিপ্রেক্ষিতে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক। এটা যদি সত্য হয় তো মাঝখানে ইস্‌লাম ও ইসলামের নবীর অনুপ্রবেশ করার কী কারণ থাকতে পারে? দ্বিতীয়ত ইসলামের বিরুদ্ধতা উপরিউক্ত সত্যের বিপরীত বলে মনে হয়।

(২) মুসলমানের দৃষ্টিতে ঈসা আসমানে জীবিত রয়েছেন এবং তাঁর আবার আসবার সম্ভাবনাও রয়েছে। পয়গম্বরে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি ছিলেন আর পরেও তিনি আছেন—এমতাবস্থায় মাঝখানে ইসলাম ও পয়গম্বরে ইস্‌লামের আবির্ভাবের কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

বিশেষ করে যখন ঈসার প্রতি বিশ্বাসীদের প্রাধান্য কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তখন এর কী অর্থ দাঁড়াতে পারে?

ان كنت فى شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرعون الكتب من
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين - (يونس ٥٠،١)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোদ পয়গম্বরে ইসলামও কোরআনের অহী সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে যেতেন এবং এমতাবস্থায় তিনি আহ্‌লে-কিতাবদের থেকে সেই সন্দেহ নিরসন করিয়ে নেয়ার জন্যে আদিষ্ট হতেন। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোরআন পয়গম্বরে ইস্‌লামকেও সন্দেহে নিক্ষেপ করে এবং আহলে-কিতাবদের কিতাব ও শিক্ষাই সেই সন্দেহকে দূর করতে পারে। এমতাবস্থায়ও ইস্‌লাম ও পয়গম্বরে ইসলামের আবির্ভাবে এবং ঈসার পরে আবির্ভাবে কি ফায়দা নিহিত? এ-তো কোরআনের প্রসঙ্গ। কিন্তু তওরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

قل فاتوا بالتورة فاتلوها ان كنتم صادقين (ال عمران -٥٠،١)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তওরাতও প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য— যদি তা সুরক্ষিত হয় এবং বিকৃত ও পরিবর্তিত না হয়। এটাও পূর্বোক্ত কথাকে সমর্থন করে। আশা করি, এই প্রশ্ন তিনটির—যাদের মূল বিষয় একই —প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে যথাসাধ্য আলোকপাত করবেন। নচেৎ আপনার নীরবতা, ভ্রান্তি ও অসন্তোষজনক জবাবে কতিপয় শিক্ষিত ও সম্মানিত মুসলমানের খৃষ্টান হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সাত ব্যক্তি তো ইতিমধ্যেই খৃষ্টান হয়েছে। এ-সম্পর্কে আপনি এখনো হয়তো বেখবরই রয়েছেন। হায়দরাবাদে গোপনে-গোপনে কি হচ্ছে, আপনি কি জানেন? কুদরত খান শাহ্‌ নামক জনৈক খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক প্রচারিত 'হায়দ-রাবাদের মুসলমানের নামে' পত্র শীর্ষক প্রচারপত্র এমন আতঙ্কের সঞ্চার করেছে যে, খান্দানের পর খান্দান খৃষ্টান হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

—আপনার বিশ্বস্ত এক অনুসন্ধিৎসু।

পত্র লেখককে কোনো খৃষ্টান পাদ্রী বলে মনে হয়; যিনি মুসলমান সেজে প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যদি একজন সাচ্চা খৃষ্টানের

মতো সামনে এসে প্রশ্ন করতেন, তাহলে বেশী ভালো হতো। সেমতাবস্থায়ও একজন পথভ্রষ্ট মুসলমানকে যেরূপ প্রীতি ও দরদের সঙ্গে জবাব দেয়া যায়, তার প্রশ্নাবলীরও তেমনি জবাব দেয়া হতো। অবশ্য প্রশ্ন তোলার পদ্ধতি নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি স্বাধীন। আমাদের কাজ শুধু তার প্রশ্নগুলো খণ্ডণ করা এবং তাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা।

(১) আমি সর্বপ্রথম আপনাকে এক বিরাট বুনিয়াদী ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন বোধ করছি। এই ভ্রান্তি শুধু আপনার একারই নয়, বরং খৃষ্টান সমালোচকরা সাধারণভাবেই এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর সে ভ্রান্তি হলো এই যে, আপনারা যখন ইসলাম ও পয়গম্বরে ইসলাম শব্দগুলো উচ্চারণ করেন, তখন তার দ্বারা এই অর্থই বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, এ একটি নতুন ধর্ম ; এর সূচনা হয়েছিলো ঈসায়ী সাত শতকে এবং মুহাম্মদ (সা) ছিলেন এর প্রবর্তক। এ কারণেই আপনারা বুঝতে পারেন না যে, তওরাত ও ইঞ্জিল যদি সত্যাশ্রয়ী হয় এবং মূসা ও ঈসাও সত্যাশ্রয়ী হন তাহলে তাঁদের পর আবার 'ইসলাম' কেন এসেছে আর 'পয়গম্বরে ইসলামে'র আবির্ভাবেরই বা কি প্রয়োজন ছিলো? কিন্তু বিচার-বুদ্ধির কথা এই যে, আপনি কাউকে পাক্ড়াও করতে চাইলে তার নিজস্ব দাবির ভিত্তিতেই পাকড়াও করতে পারেন—তার ওপর আপনাদের জবরদস্তি চাপিয়ে দেয়া অভিযোগের ভিত্তিতে নয়। মুহাম্মদ (সা) একথা কবে বলেছিলেন যে, আমি এক নতুন ধর্মের ভিত্তি পত্তন করেছি এবং আমার এই নবাবিষ্কৃত ধর্মের নাম ইসলাম? তিনি তো এটা কখনোই দাবি করেননি। তিনি বরং দাবি করেছেন যে, আমার আগে ঈসা, মূসা, ইব্রাহীম ও নূহ (আঃ) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন আমি ঠিক সেই ধর্ম নিয়েই এসেছি। এই ধর্মের নাম চিরকাল ইসলামই (খোদার আনুগত্য) রয়েছে—ইহুদীবাদ কিংবা খৃষ্টবাদ নয়। তারপর ওই অতীত পয়গম্বরদের পরে নিজের আবির্ভাবের যে কারণ তিনি বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেও কোথাও এ দাবি করা হয়নি যে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর শিক্ষাদীক্ষা দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কিংবা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো বলেই আমি প্রেরিত হয়েছি। বরং তিনি শুধু এইটুকুই বলেছেন যে, তওরাত ও ইঞ্জিলে তো বিকৃতি ঢুকেছেই কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় কিতাবে যা কিছু অবিমিশ্র খোদায়ী শিক্ষাদীক্ষা পাওয়া যায়, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে মূসার অনুবর্তীগণ ইহুদীবাদ

নামে এক নয়া ধর্মমত এবং ঈসার অনুবর্তীগণ খৃষ্টবাদ নামে এক ভিন্ন ধর্মমত গড়ে নিয়েছে। আর এই উভয় ধর্মমতে এমন সব বিষয়বস্তুকে ধর্মীয় ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে যা মূসা ও ঈসার আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে আবার সঠিক ও নির্ভেজালরূপে দুনিয়ার সামনে পেশ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই প্রয়োজন পূরণ করার জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। এই হচ্ছে মুহাম্মদ (সা)-এর আসল দাবি। এখন আপনি পাকড়াও করতে চাইলে এই দাবির ভিত্তিতে করতে পারেন। এক ব্যক্তির ওপর আপনি খামাখা মনগড়া একটি দাবি চাপিয়ে দেবেন (যা' সে তীব্র ভাষায় অস্বীকার করে) এবং তারপর তার নিজের দাবির ভিত্তিতে নয়, আপনারই চাপিয়ে দেয়া দাবির ভিত্তিতে আপত্তি তুলতে থাকবেন---আলোচনা ও অনুসন্ধানের এটা কোন্ ধরনের নীতি? এহেন ভ্রান্তি আজ থেকে নয়, বেশ কিছুকাল থেকে খৃষ্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীরা করে আসছেন। আর এই ভ্রান্তির ওপরই তাদের বেশির ভাগ আপত্তি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যদি বাস্তবিকই একজন সত্যানুসন্ধিৎসু হন তো আপনাকে আমি অনুরোধ করবো: আমার বিবৃত কথাই কি মুহাম্মদ (সা)-এর আসল দাবি, না আপনার চাপিয়ে দেয়া কথা—প্রথমত শান্ত মনে আপনি এ বিষয়টি অনুসন্ধান করুন। যদি আমার বিবৃত কথাই তাঁর প্রকৃত দাবি হয়, তাহলে তা' নির্ভুল না ভুল---বিচার করে দেখুন। এটা কি সত্য নয় যে, দুনিয়ার সমস্ত নবীর ধর্মই 'ইসলাম' (খোদানুগত্য) ছিলো? যেসব শাশ্বত ও চিরন্তন সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং যার ভিত্তিতে নিজের চরিত্র ও আচরণ সংগঠনের ওপর মানুষের সার্বিক মুক্তি নির্ভরশীল, তার দিকেই কি মুহাম্মদ (সা) আহবান জানাননি এবং তা-ই কি চিরকাল বর্তমান ছিলো না? খোদার দৃষ্টিতে কি মানুষের মুক্তি ইব্রাহীম ও ইস্হাকের জমানায় বিশেষ কতিপয় নীতির ওপর, মূসা ও ঈসার জমানায় অপর কতিপয় নীতির ওপর এবং পরবর্তীকালে ভিন্ন রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল হতে পারে? আপনি যদি স্বীকার করেন যে, এ নীতি ভিন্ন ভিন্ন নয়, বরং শাশ্বত ও চিরন্তন, তা'হলে নবাবিষ্কৃত ধর্ম কি ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদকে বলা যায়, না ইসলামকে? ইহুদীবাদ ও খৃষ্টাবাদে তো আপনি এমন অনেক মূলনীতিই (অর্থাৎ মুক্তির শর্ত) দেখতে পাবেন, যেগুলোর আবেদন এক বিশেষ গোত্র কিংবা বিশেষ জমানা পর্যন্তই সীমিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-

এর শিক্ষাদীক্ষায় আপনি এমন কোনো জিনিস আদৌ পাবেননা, যা' মানব জাতির মুক্তি সংক্রান্ত শাশ্বত, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন আদর্শের চাইতে কিছু মাত্র বেশী কিংবা তা থেকে ভিন্নতর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তো আপনার প্রশ্নের ধরনই সম্পূর্ণ বদলে যাবে। এরপর তো মুহাম্মদ (সঃ) কেন মাঝখানে এসে পড়লেন—এ-প্রশ্নই থাকবেনা; বরং তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে এই যে, আদম, নূহ, ইব্রাহীম ও ইসহাকের জমানা থেকে প্রকৃত ধর্মের (ইসলাম) যে ধারা চলে আসছিলো, তার মধ্যে এই ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ কোত্থেকে এসে ঢুকে পড়লো?

(২) প্রথম প্রশ্নে আপনি যে-আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে ঈসার প্রতি অবিশ্বাসকারী বলতে ইহুদীদের বুঝায় এবং তাঁর অনুসরণকারীর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমান উভয়েই শামিল রয়েছে। আর অনুসরণ বলতে যদি পরিপূর্ণ অনুসরণ অর্থাৎ হুবহু পায়ে পায়ে চলাকেই ধরা হয়, তা'হলে তা' খৃষ্টানদের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না, বরং তা শুধু মুসলমানদের প্রতিই প্রযোজ্য। কারণ খৃষ্টানরা হযরত ঈসার শিক্ষার মূলনীতি ও আদর্শকে বর্জন করে ইহুদীদের মতো এক ভিন্ন পন্থায় তাঁর প্রতি অবিশ্বাস (كفر) করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা এবং তাঁর পূর্বেকার নবীগণ যে-শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, মুসলমানরা সেই শিক্ষার ওপরই অবিচল রয়েছে। আর দুনিয়ায় খোদার যতো নবীই এসেছেন—তা' যে কোন দেশ বা যুগেই আসুক না কেন—তাঁদের সবার একই শিক্ষা ছিলো। সে শিক্ষা ছিলো এই যে, এক ও অদ্বিতীয় খোদার বন্দেগী ও দাসত্ব করো। পক্ষান্তরে তাঁদের কেউই এ দাবি করেননি যে, আমাকে খোদা মানো।

ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتب والحكم والنبوة ثم يقول
للناس كونوا عبدا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين -
(ال عمران - ٨)

'এটা কোনো মানুষের কাজ নয় যে, খোদা তাকে কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যাত দান করলে সে লোকদেরকে বলবে যে, তোমরা খোদাকে ছেড়ে আমার বান্দাহ্ হয়ে যাও, বরং সে একথাই বলবে যে, তোমরা খোদার বান্দাহ্ হও।'

এই পুণ্যাত্মাদের দলে হযরত ঈসাও শামিল ছিলেন।' তিনিও কখনো তার মর্যাদাকে চুল পরিমাণ অতিক্রম করার প্রয়াস পাননি।

'ঈসা আল্লাহ্‌র একজন বান্দাহ্—এতে কখনো তিনি লজ্জাবোধ করেননি।

لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله (النساء - ٢٣)

কাজেই খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস, ঈসা (আঃ)-এর প্রতি খোদায়ী আরোপ এবং তাঁকে খোদার পুত্র আখ্যাদান হযরত ইসার প্রচারিত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। যারা এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করে, তারা তাঁর সঙ্গে এক ইহুদীদের মতোই কুফরী করে।

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح
يبنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم..لقد كفر الذين قالوا
ان الله ثالث ثلاثة (المائده - ٥٠١)

'নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়মই হচ্ছেন খোদা। অথচ খোদ্ ঈসা বলেছিলেনঃ হে বনী ঈসরাইল! তোমরা বন্দেগী করো, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু।------- নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন তিন-জনের একজন।'

এই দৃষ্টিতে মুসলমান এবং যেসব খৃষ্টান ঈসাকে খোদার পুত্র নয়, বরং তাঁর নবী বলে বিশ্বাস করে তাঁর প্রতি কোনোরূপ খোদায়ী আরোপ করেনা এবং এই সদ্বিশ্বাস পোষণ করেঃ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القها الى مريم وروح منه (النساء - ٦٣) انما الله اله واحد سبحانه

(১) ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহ্‌র রসূল, তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র বাণী এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এক রূহ বিশেষ।

(النساء - ٢٣) ان يكون له ولد[২] এবং 'তোমার অনুসরণকারী' (اتبعوك) কথাটি শুধু তাদের প্রতিই প্রযোজ্য। অবশ্য অনুসরণ বলতে যদি পরিপূর্ণ অনুসরণ না ধরা হয়, তবে এদিক থেকে মুসলমানদের ন্যায় খৃস্টানদেরকেও ঈসার অনুবর্তী বলা চলে এবং সেক্ষেত্রে ঈসার প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী ইহুদীদের ওপর তাঁর অনুবর্তীদের প্রাধান্য লাভ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এই উভয় সম্প্রদায়ের বেলায়ই সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

(৩) শুরুতে যেমন বলেছি, হযরত ইসার—শুধু তাঁরই নয়, বরং সমস্ত নবীর—হেদায়াত ও শিক্ষা মূলগতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত রয়েছে। মুহাম্মদ (সা) সে শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করতে আসেন নি, বরং তাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং মানবীয় দুর্মতি ও দুষ্প্রবৃত্তির ভেজাল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। কাজেই খৃস্টানরা কেন হযরত ঈসা এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা মানে—এ প্রশ্নে তাদের সঙ্গে তার লড়াই ছিলো না। বরং তারা কেন তাঁকে (ঈসাকে) মানেনা, লড়াইটা ছিলো এই প্রশ্নে। তাই বারবার তিনি খোদার তরফ থেকে বলেছেনঃ

يا اهل الكتب لا تغلوا في دينكم[৩] (النساء-٧٣) يا اهل الكتب لستم على شيء حتى تقيموا التورة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم[৪] (المائده - ٥٠)

ولو انهم اقاموا التورة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم[৫] (المائده - ٩) وليحكم اهل

---

(২) আল্লাহ্ একাই হচ্ছে ইলাহ্, তাঁর কোনো পুত্র সন্তান থাকবে—এরূপ বিষয় থেকে তিনি পবিত্র।

(৩) হে আহলে কিতাব। দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কোরোনা।

(৪) হে আহলে কিতাব। তোমরা কিছুতেই সত্যের ওপর নও, যতোক্ষণ না তওরাত, ইঞ্জিল এবং তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবগুলোকে কায়েম রাখবে।

(৫) তারা যদি তওরাত, ইঞ্জিল এবং তাদের প্রতি তাদের প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ কিতাবগুলো কায়েম রাখতো, তাহলে উপর ও নীচের দিক (সবদিক) থেকে তারা জীবিকা লাভ করতো।

لا نجعل بما انزل الله فيه ১(المائدة - ٨) । কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ঈসার অনুবর্তীগণ ইঞ্জিল কিতাবকে একেবারেই খুইয়ে বসেছে এবং ইঞ্জিলের নামে শুধু ঈসার কতিপয় জীবনকথা নিয়ে ফিরছে, যাতে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার একটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও ভেজালদুষ্ট অংশই লক্ষ্য করা যায়—তখন তিনি খৃষ্টানদের সামনে সরাসরি কোরআন পেশ করেন। তিনি বলেন যে, তোমরা যা' কিছু খুয়েই ফেলেছো, তা' পূর্বের চাইতেও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রূপে আবার তোমাদের সামনে এসেছে। এই শিক্ষাই হযরত ঈসা তোমাদের দিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর আগে মূসা, ইব্রাহীম ও নূহ্ (আঃ)-ও দিয়েছিলেন। তোমরা এবং তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা বারবার এই শিক্ষাকে গোপন করেছো। কিন্তু এখন এই শিক্ষাকে তোমাদের সামনে এমন সুদৃঢ়রূপে পেশ করা হচ্ছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত কেউ একে লুকাতে পারবে না। কাজেই হযরত ঈসার প্রকৃত শিক্ষা মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের বইগে নয়, কোরআন মজীদে সুরক্ষিত রয়েছে এবং তা-ই ইন্‌শাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাক্‌বে।

(৪) আলোচ্য আয়াত থেকে এটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, ঈসাই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর চিরন্তন শিক্ষা ও হেদায়াত অনুসারে চিরন্তন পথ প্রদর্শক—আপনার এ উক্তিও ভ্রান্ত। কারণ আয়াতের এ-মর্ম আপনার মনগড়া—তার শব্দাবলী এটা প্রমাণ করে না। সেখানে তো শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে, যারা তোমার অবিশ্বাস করে, তাদের ওপর তোমার অনুসারীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখবো। এই শব্দাবলী থেকে এ অর্থ কি করে বের করা যেতে পারে যে, এখন তুমিই চিরন্তন পথপ্রদর্শক এবং তোমার পর এই হেদায়াতই পেশ করার জন্যে আর কোনো নবী পাঠানো হবে না? আফসোস যে, খোদায়ী কিতাবে শাব্দিক ও আর্থিক বিকৃতি সাধনের পুরোনো অভ্যাস আমাদের খৃষ্টান ভাইদের মধ্য থেকে আজো দূর হলোনা।

(৫) ঈসার পর মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের তাৎপর্য আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে খোদ ঈসার কাছেই আপনি জিজ্ঞেস করুন।

(১) আল্লাহ্ ইঞ্জিলে যে বিধিবিধান নাজিল করেছিলেন, ইঞ্জিলধারীদের সেই অনুসারে ফয়ছালা করা উচিত।

তাঁর এই উক্তি সমস্ত বিকৃতি সত্ত্বেও যোহনের কিতাবে এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

'তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি; আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল; কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আস-বেনা; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে, তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচা-রের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করবেন।' (যোহন ১৬ঃ ৭-৮)

অন্যত্র;

যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসেন--- যখন সেই সহায় আসিবেন তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।' (যোহন ১৫ঃ২৬)

অন্যত্র ঃ

'কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমা-দিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।' (যোহন ঃ ১৪ ঃ ২৬)

অন্যত্র ঃ

'আমি তোমাদের সহিত আর অধিক কথা বলিব না; কারণ জগতের অধিপতি আসিতেছে, আর আমাতে তাহার কিছুই নাই।' (যোহন ১৪ ঃ ৩০)

অন্যত্র ঃ

'তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারনা। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।' (যোহন ১৬ ঃ ১২-১৩)

হযরত ঈসার এই সকল উক্তি থেকে আপনি মুহাম্মদ (সা)-এর আবি-র্ভাবের তাৎপর্য খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারেন। 'ঈসার অনু-

বর্তীদের আধিপত্যের প্রতিশ্রুতি'—আপনার মতে যা' 'অটুট ও অবিচ্ছিন্ন' অর্থে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে পেশ করা হয়েছে—হযরতের আবির্ভাবের ফলে বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং আরো দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ তিনি এসে ঈসা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করেন (انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله এবং وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) ইহুদীরা ঈসা ও তাঁর মা মরিয়মের ওপর যে বিরাট অপবাদ চাপিয়ে দিয়েছিলো, তার জন্যে তাদের ভৎর্সনা করেন। (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما) পরন্তু হযরত ঈসা তাঁর অনুবর্তীদেরকে যেসব কথা বলেছিলেন, তা' সবই তিনিই স্মরণ করিয়ে দেন وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه। বস্তুত হযরত ঈসা যে-কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর পরে এসে তা' সম্পূর্ণ করবেন এমন ব্যক্তির জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়াই হচ্ছে তাঁর যাওয়ার উদ্দেশ্য।

(৬) ان كنت في شك الخ এই আয়াতে দৃশ্যত নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরআনের প্রত্যেক পাঠকই এর লক্ষ্য। আয়াতটির মর্ম হচ্ছেঃ হে কোরআনের পাঠক বা শ্রোতা! খোদার তরফ থেকে কোরআনের অবতরণ সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তা হলে যাদের কাছে কোরআনের পূর্বে আগত কিতাব বর্তমান রয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও; তাদের সাক্ষ্য থেকেই তোমরা জান্‌তে পারবে যে, এ কিতাব খোদার তরফ থেকেই আগত। বস্তুত পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবে নবী আরবীর আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এ হচ্ছে

সে সবের প্রতিই ইঙ্গিত। কোরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই বিষয়টিকে বিবৃত করা হয়েছেঃ

الذين اتينا هم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (البقره - ١٨)

'যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা ঠিক নিজ সন্তানের মতোই তাকে চিনতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি দল জেনে-বুঝেও সত্যকে গোপন করে থাকে।'

والذين اتينا هم الكتب يعلمون انه منزل من ربك بالحق - (انعام - ١١٤)

'আর যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা জানে যে, এই কোরআন মূলত তোমার প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ।'

কোরআন তার সত্যতা প্রসঙ্গে বহুতরো সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ সাবেক নবীদের কিতাবাদির থেকেও পেশ করেছে। এ দ্বারা নবী করীম (সা) কে নয়, বরং যারা সাবেক নবীদের কিতাবাদির প্রতি-বিশ্বাসী, কিন্তু কোরআনের সত্যতায় সন্দিহান, বিশেষভাবে তাদের সন্তোষ বিধান করাই উদ্দেশ্য। এই কারণে যে, সাবেক কিতাবসমূহের সাক্ষ্য শুধু তাদের জন্যেই নির্ভরযোগ্য হতে পারে। এই সাক্ষ্য অনুসন্ধানের ভেতর এমন কিছু নেই যা থেকে কোরআন সন্দেহে নিক্ষেপকারী জিনিস বলে অর্থ বের করা যেতে পারে। কোনো কথার পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট মর্ম পরিহার করে তা থেকে জটিল ও পেঁচালো অর্থ বের করার চেষ্টা করা কোনো সত্যসন্ধ ব্যক্তির কাজ নয়। যারা বিরোধ ও বিতর্কের বিভ্রান্তিতে পড়ে নিজেদের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক এ-ধরনের কাজ তেমন লোকেদের জন্যেই ছেড়ে দেয়া উচিত।

(৭) قل فاتوا بالتورة فاتلوها ان كنتم صدقين—এর পূর্বে আর একটি বাক্যাংশ ছিলো, যেটি জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে আপনি ছেড়ে দিয়েছেন। পূর্ণ আয়াতটি হলো এইঃ

كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التورة قل فاتوا بالتورة فاتلوها ان كنتم صدقين (ال عمران - ١)

'সমস্ত খাদ্য বনী ইসরাঈলদের জন্যে হালাল ছিলো, কেবল সেগুলো ছাড়া যেগুলো তওরাত নাজিলের পূর্বেই ইসরাঈলগণ নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলো। হে নবী। বলে দাও তওরাত নিয়ে এসো এবং তা' পড়ো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

এই আয়াতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা তও-রাতের বিধানকে গোপন করে। এই অভিযোগ এক জায়গায় নয়। বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে মায়েদায় বলা হয়েছেঃ

وكيف يحكمونك وعندهم التورة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين (المائده - ٢)

'ওরা তোমায় নিজেদের ব্যাপারে কিভাবে বিচারক নিযুক্ত করবে। কারণ ওদের নিজেদের কাছেই তওরাত বর্তমান রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান রয়েছে। কিন্তু এরপরও ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওরা মূলত তওরাতের প্রতি ঈমানই পোষণ করে না।'

কোরআনে ইহুদীদের দু'টি অপরাধের কথা বিবৃত হয়েছে। একটি অপরাধ হলো, তারা খোদার কিতাবকে বিকৃত করে। আর দ্বিতীয়টি হলো বিকৃতি সত্ত্বেও সে কিতাবে যা' কিছু খাঁটি খোদায়ী শিক্ষা বর্তমান রয়েছে, তাকেও তারা আপন প্রবৃত্তি ও লালসার তাগিদে গোপন করে এবং তার প্রতিকূল কাজ করে। এখানে তওরাত থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়ে থাকলে ইহুদীদের অপরাধ সম্পর্কেই করা হয়েছে। এ থেকে আপনি কী সুবিধাটা গ্রহণ করতে চান? (প্রথম প্রকাশঃ আগষ্ট, ১৯৩৫)

সমাপ্ত